ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

৭

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৭

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৭

আলতামাশ
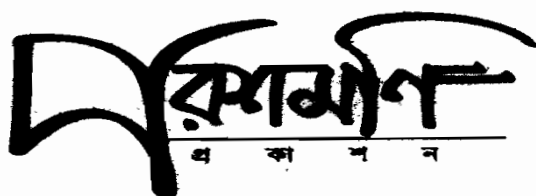
অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

মোবাইল : ০১৫৬-৩৬৭২২১, ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৭
আলতামাশ

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পরশমণি প্রকাশনা-৯
ISBN-984-8925-08-0

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৫৬-৩৬৭২২১, ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ২০০৬

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৫৬৪১৪১

গ্রাফিক্স
নাজমুল হায়দার
দি লাইট
মোবাইল ঃ ০১৯১-০৩১১৮৪

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

পরিবেশক

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার (পাঠকবন্ধু মার্কেট)
ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

নিউ রহমানিয়া লাইব্রেরী
৭৩, সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১-৪৬৪০৭১

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে–বিশেষত মিশর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ক্রুসেডাররা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দু:সাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলো, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দু:সাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হলো সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা। মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সূচীপত্রঃ
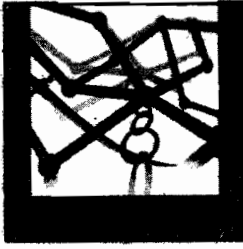
একই গন্তব্যের মুসাফির

হালবের উত্তরে আজকের সিরিয়া ও লেবাননের সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটি শহর। নাম হেম্‌স। যুদ্ধ এখনও গ্রাস করেনি বলে শহরটি শান্ত। খৃস্টান সৈন্যরা মাঝে-মধ্যে তার আশপাশ দিয়ে অতিক্রম করছে। শহরটির কোল ঘেঁষে বয়ে চলছে ছোট্ট একটি নদী। সে কারণেই শহরটি সৈন্যদের বিচরণ থেকে নিরাপদ রয়েছে। অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেশি। ফলে এটি মুসলমানদের নগরী বলেই পরিচিত। অল্প ক'টি খৃস্টান পরিবারও আছে। আছে ক'টি ইহুদী পরিবারও। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য ইহুদী-খৃস্টানদের দখলে। বাণিজ্যের সুবাদে তাদের দূর-দূরান্ত অঞ্চলে যাওয়া-আসা আছে। তারা বহিঃজগতের যে খবরাখবর নিয়ে আসে, হেম্‌সের মানুষ তা-ই সত্য বলে বিশ্বাস করে। তারা ক্রুসেডার ও ইসলামী বাহিনীর যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে আসে। তাতে মুসলমানদের পরাজয়ের উল্লেখই বেশি থাকে। খৃস্টান বাহিনী সম্পর্কে তারা ভীতিকর কথাবার্তাই শুনিয়ে থাকে।

তাদের উদ্দেশ্য, মুসলমানদের উপর খৃস্টান বাহিনীর আতঙ্ক বিরাজিত থাকুক এবং অন্তত এই নগরীর কোন মুসলমান ইসলামী বাহিনীতে অংশগ্রহণ না করুক। কিন্তু তার ক্রিয়া হচ্ছে উল্টো। মুসলমানগণ ভীত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আইন করে বা নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের এই সামরিক প্রস্তুতি রুখবার শক্তি কারো নেই। এখানে খৃস্টানদের শাসন চলে না।

হেম্‌সের মুসলমানগণ অশ্বচালনা, বর্শা ছোঁড়া, তরবারীচালনা ও তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন করছে। এই প্রশিক্ষণ মেয়েরাও গ্রহণ করছে। তাদের নেতা নগরীর বড় মসজিদের খতীব, যাঁর সকল ইল্‌ম ও আমল জিহাদের জন্য নিবেদিত। তিনি প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস শত্রুমুক্ত করার এবং খৃস্টানদেরকে আরব দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে মুসলমানদের প্রস্তুত করছেন।

'...আর এই যুদ্ধটা কেন লড়া হচ্ছে?'– খতীব তাঁর ভাষণে ব্যাখ্যা প্রদান করছেন– 'খৃস্টানরা আরব দুনিয়ার উপর দখলদারিত্ব কায়েম করে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে আর আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার জন্য জান-মালের কুরবানী দিয়ে চলেছি। তারা আরব দুনিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করলো কেন? তার একমাত্র কারণ, মহান আল্লাহর মহান পয়গাম আরবদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই বার্তা আরবদের উপর কর্তব্য আরোপ করে দিয়েছে যে, হেরা গুহায় বসে প্রিয়নবীর প্রাপ্ত এই বার্তা আমরা সমগ্র মানবতার নিকট পৌঁছিয়ে দেবো। তারিক ইবনে যিয়াদ রোম উপসাগরের মিসরীয় তীরে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহকে বলেছিলেন– 'তুমি যদি আমাকে সাহস ও দৃঢ়তা দান করো, তাহলে আমি তোমার নাম সমুদ্রের ওপারে নিয়ে যাবো।' সে সময় তাঁর বক্ষ থেকে ঈমানী চেতনার যে শিখা উত্থিত হয়েছিলো, তা-ই তাঁর ঘোড়াকে সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিলো। নৌকায় করে তার বাহিনী ইউরোপের কূলে পৌঁছে যায়। যিয়াদপুত্র তারিক আদেশ দিলেন– 'নৌকাগুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও। আমরা ফিরে যাওয়ার জন্য আসিনি।'

'আর আজ খৃস্টানরা আল্লাহর ভূখণ্ডে এই প্রত্যয় নিয়ে এসেছে যে, তারা ফিরে যাবে না। এই ভূখণ্ডকে তারা করায়ত্ব করার সিদ্ধান্ত নিলো কেন? তারা চাচ্ছে, আল্লাহ পাক যে ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তাকে এখানেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে। মনে রেখো মুসলমান! ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যে পাথরকে মোমে পরিণত করে দেয়। আমাদের ধর্মের মূলনীতিগুলো সহজে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে যায়। কারণ, এটি মানব স্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল জীবনব্যবস্থা। হাক্কুল ইবাদ (মানবাধিকার) এমন একটি মৌল বিধান, যা মানবজাতিকে একমাত্র ইসলামই উপহার দিয়েছে। ইসলাম একটি ধর্মই নয়– এটি একটি মতবাদ। ইসলাম বিশ্ব মানবতার পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।'

'ক্রুশের ধ্বজাধারীরা জানে, ইসলাম যদি বিস্তার লাভের সুযোগ পেয়ে যায়, তাহলে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি ইসলামের ছায়াতলে চলে আসবে এবং ক্রুশের নাম-চিহ্ন মুছে যাবে। এ কারণেই ক্রুসেডাররা তাদের পূর্ণ সমর শক্তি নিয়ে এখানে এসেছে। তারা ইসলামের উৎসমুখ বন্ধ করে দিতে এসেছে। ইহুদীদের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়েছে, বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে

তাদের হাতে তুলে দেবে, যাতে ইহুদীরা আমাদের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসাকে হাইকেলে সুলায়মানীতে পরিণত করতে পারে। এটি ইহুদীদের একটি প্রাচীন স্বপ্ন, যাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা অস্থির হয়ে আছে। এই লক্ষ্য অর্জনে তারা তাদের রূপসী মেয়েদেরকে এবং তাদের ধন-সম্পদ খৃস্টানদের হাতে তুলে দিয়েছে। এই নারী আর অর্থই আমাদের সারিতে গাদ্দার জন্ম দিয়েছে।'

'আমি তোমাদেরকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম শোনাচ্ছি। তোমরা তাঁকে হৃদয়ে অঙ্কন করে নাও। ইসলামের সৈনিক সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর ফৌজ ও জাতিকে বলে রেখেছেন, চলমান লড়াই দু'টি বাহিনীর যুদ্ধ নয়, এটি প্রথম কেবলা ও হাইকেল সুলাইমানীর যুদ্ধ। আজ যদি আমরা বাতিলকে চিরতরে খতম করতে না পারি, তাহলে বাতিল একদিন আমাদের ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমাদের আত্মা দেখবে, ইতিহাস দেখবে, ফিলিস্তীন ইহুদীদের দখলে আর মসজিদে আকসা হাইকেলে সুলাইমানীতে পরিণত হচ্ছে।'

'হেম্সের মুসলমানগণ! তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের সৈনিক নও বটে; তবে অবশ্যই আল্লাহর সৈনিক। তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করে দেয়া হয়েছে। কুরআন নির্দেশ দিয়েছে, নিজের মাতৃভূমি ও ধর্মের সুরক্ষার জন্য ঘোড়া ও অস্ত্র প্রস্তুত রাখো এবং জিহাদের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত থাকো। তবে মনে রেখো, তোমাদের শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে শুধু রণাঙ্গনেই যুদ্ধ করে না। তাদের যুদ্ধক্ষেত্র আরো আছে। তারা অপপ্রচারের মাধ্যমে তোমাদের উপর তাদের বাহিনীর ভীতি ও ইসলামী ফৌজের বিরুদ্ধে কুধারণা সৃষ্টি করছে। তারা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে সুন্দরী মেয়ে আর সোনার চাকচিক্য দ্বারা নিজেদের অনুগত বানিয়ে নিচ্ছে। এই দু'টি বস্তু মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এই দুয়ের সঙ্গে যখন মদ যোগ হয়, তখন মুসলমান তার ঈমানকে ঈমানের শত্রুর পায়ের উপব অর্পণ করে। এমনটি অতীতে হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। খৃস্টানরা আমাদেরকে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে আমাদের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমাদের কতক আমীর খৃস্টানদের কাছে ঈমান নীলাম করে সালতানাতে ইসলামিয়া ও মুসলিম উম্মাহর এই ক্ষতিটা করেছে। কিন্তু তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করেছে জাতি, দেশ ও সেনাবাহিনী। যারা অন্যের মাঝে গৃহযুদ্ধ বাঁধায়, তারা দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে আবেগে ফেলে একদলকে অপর দলের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়

এবং একদল দ্বারা অপর দলকে খুন করায়। আর নিজেরা প্রাসাদে বসে ফূর্তি করে। তোমরা স্মরণ রেখো, এই পাথরগুলো সব যদি সোনা হয়ে যায় আর সেগুলো তোমাদের দান করা হয়, তবুও তা জিহাদের প্রতিদান হবে না। জিহাদের পুরস্কার লাভ করে আত্মা। আত্মা হীরা-জহরতে খুশি হয় না। জিহাদের পুরস্কার আল্লাহর হাতে। তোমরা যদি আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দাও, তবু জীবিত থাকবে। তোমরা দৈহিক সুখ-ভোগকে লক্ষ্য স্থির করো না। এই দৈহিক সুখ-ভোগকে যে-ই লক্ষ্য বানিয়েছে, সে-ই আপন ঈমানদার ভাইয়ের গলা কেটেছে, জাতির গলায় ছুরি চালিয়েছে। কুরআন তোমাদেরকে আত্মিক শান্তিতে ধন্য করতে চায়।'

এভাবে খতীব হেম্‌সের মুসলমানদের ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করে রাখেন। তারই তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা মোতাবেক সামরিক প্রশিক্ষণ চলছে। তিনি স্বয়ং তরবারী ও খঞ্জর চালনায় অভিজ্ঞ। হেম্‌সে এই প্রশিক্ষণ পুরোদমে চলছে। সকলের হৃদয়ে একটিই সুর অনুরণিত হচ্ছে— জিহাদ জিহাদ জিহাদ চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই।

হেম্‌স নগরীতে তিনটি মসজিদ আছে। এই মসজিদগুলো জিহাদের আলোচনায় মুখরিত থাকে। কিন্তু এখানকার খৃস্টান ও ইহুদী অধিবাসীরা সহানুভূতিশীল সেজে দুঃসংবাদ শুনিয়ে শুনিয়ে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করছে। সাধারণ মুসলমানগণ মসজিদের খতীব ও ইমামদের নিকট এসব সংবাদের সত্যতা জিজ্ঞেস করছে এবং উদ্বেগ প্রকাশ করছে। ক্রুশ ও চাঁদ-তারার যুদ্ধের সঠিক ও বাস্তব চিত্র জেনে হেম্‌সের মুসলমানদের কৌতূহল নিবারণের জন্য খতীব তাবরিজ নামক এক যুবককে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দিয়েছে।

যুদ্ধের সঠিক চিত্র সংগ্রহ করে হেম্‌স ফিরে আসছে তাবরিজ। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাকে দামেশ্‌ক পর্যন্ত যেতে হয়নি। পথেই তার কাজ হয়ে গেছে। খৃস্টান বাহিনী হামাত থেকে বহু দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলো। তাবরিজ তাদের দেখে ফেলে। দূর থেকে পতাকা দেখে চিনে ফেলে, ওরা খৃস্টান সৈন্য। তাবরিজ অগ্রসর হতে থাকে। পথে দু'জন উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তারা মুসলমান। তাবরিজ তাদের থেকেও জানতে পারে, ওরা খৃস্টান বাহিনী। উষ্ট্রারোহীরা আরো জানায়, এই বাহিনী মুসলমানদের হাতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছে। তাবরিজ

তাদের বললো, আমি হেম্‌স থেকে জানতে এসেছি, খৃস্টান বাহিনী কোন্‌ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে এবং আরবের ক'টি অঞ্চল জয় করেছে।

'ঐ যে পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছো'– উষ্ট্রারোহীরা একটি পার্বত্যময় এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করে বললো– 'এই পথটিই তোমাকে পর্বতমালার অভ্যন্তরে নিয়ে যাবে। ওখানে গেলেই আমাদের ফৌজ দেখতে পাবে। দামেশ্‌ক এখনো অনেক দূর। বাহিনীর যে কোন একজন সৈনিককে জিজ্ঞেস করলেই তুমি সবকিছু জানতে পারবে। আমরা শুধু এটুকু জানি, রামাল্লায় যে যুদ্ধ হয়েছিলো, তাতে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাজিত হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেছে। তারপর খৃস্টানদের সঙ্গে হামাতের দুর্গের সন্নিকটে লড়াই হয়েছে, যাতে খৃস্টানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করেছে। তুমি সম্মুখে চলে যাও। তবে কোন খৃস্টান সৈন্যের কাছে ঘেঁষবে না। তারা যখনই টের পাবে তুমি মুসলমান, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে হত্যা করে ফেলবে।'

দিবসের শেষ বেলা। তাবরিজ হামাতের পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়েছে। ভেতরে সুপরিসর একটি উপত্যকা। সম্মুখ দিক থেকে জনাকয়েক অশ্বারোহী এগিয়ে আসে। তাবরিজ মাঝপথ দিয়েই হাঁটছে। এক আরোহী ছুটে এসে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'পথ ছাড়ো মিয়া! প্রধান সেনাপতি আসছেন।'

তাবরিজ সামান্য সরে দাঁড়ায়। আরোহী তাকে আরো দূরে সরে যেতে বলছে। প্রধান সেনাপতি ও তাঁর সহকর্মীরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন।

প্রধান সেনাপতি সুলতান আইউবীর ভ্রাতা আল-আদিল। এসে পৌঁছেই তিনি দেখতে পান তাঁর এক রক্ষীসেনা একজন পথিকের সঙ্গে ক্ষুব্ধ ভাষায় কথা বলছে। বোধ হয় পথিক পথ ছাড়ছিলো না। আল-আদিল নিকটে এসে দাঁড়িয়ে যান। তাবরিজকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? রক্ষীর সঙ্গে বচসা করছো কেন?

তাবরিজ জবাব দেয়, আমি হেম্‌স থেকে জানতে এসেছি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী কী অবস্থায় আছে এবং খৃস্টান বাহিনী কী পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে। সে আল-আদিলকে জানায়, হেম্‌সের মুসলমানরা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে এবং সুলতান আইউবীর ফৌজের অপেক্ষা করছে। আমাদের বোনরাও যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রস্তুত শিশু-কিশোর-বৃদ্ধরাও।

আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল-আদিলের সঙ্গে আছেন। তিনি তাবরিজকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করছেন। তাবরিজ

শত্রুপক্ষের চর হতে পারে। তবে তার সরলতা প্রমাণ করছে লোকটা গুপ্তচর নয়। তবু সন্দেহ করা আবশ্যক। গোয়েন্দারা এর চেয়েও বেশী সরলতা প্রকাশ করতে পারে।

'তোমাদের খতীবের নাম কী?' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন।

তাবরিজ খতীবের নাম বলে। তৎকালের অপ্রকাশিত লিপিতে খতীবের নামটা স্পষ্ট উল্লেখ নেই। প্রকাশিত কোন ইতিহাস গ্রন্থেও হেম্‌সের এই খতীবের নাম পাওয়া যায় না। তাই অগত্যা আমরা তাকে 'খতীব' বলেই ডাকবো।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল-আদিলকে বললেন, আমি নিশ্চিত হয়েছি লোকটি আমাদেরই। তার কথা-বার্তায় বুঝা যাচ্ছে, সে আন্তরিকতার সঙ্গেই নিজ দায়িত্ব পালন করছে।

আল-আদিলের নির্দেশে তাবরিজকে মেহমান হিসেবে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ রাতে তাবরিজকে নিজ তাঁবুতে তলব করেন এবং খতীবের নামে একখানা পত্র লিখে দেন—

'পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গীন। তবে এতোটা নয়, যতোটা আপনারা শুনেছেন। জনগণকে বলুন, তারা যেনো তা-ই বিশ্বাস করে, যা তারা নিজ চোখে দেখে এবং যা ইমামগণ মসজিদে মসজিদে বলে থাকেন। এদিক-ওদিকের কথা-বার্তায় যেনো তারা কান না দেয়, সত্য বলে বিশ্বাস না করে। আপনারা একটি মহা-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করছেন। এলাকার ইহুদী-খৃস্টানদের প্রতি দৃষ্টি রাখুন আর সতর্ক থাকুন, যেনো তারা আপনাদের তৎপরতা জানতে না পারে। আপনাদের তৎপরতা ও কর্মসূচী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখতে হবে।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ খতীবের নামে এমন একটি বার্তা প্রেরণ করেন, যা হেম্‌সের মুসলমানদের জন্য উদ্দীপক। কিন্তু তাতে তিনি উল্লেখ করেননি, সেসব কিরূপ তৎপরতা, যেগুলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখতে হবে। ব্যাপার হলো, হেম্‌সের মুসলমানদেরকে সুলতান আইউবীর নির্দেশ মোতাবেক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো, যখনই প্রয়োজন হবে, তারা খৃস্টান বাহিনীর উপর পেছন থেকে গেরিলা অপারেশন চালাবে। তবে উপরে উপরে খৃস্টানদের অনুগত থাকবে। এ লক্ষ্যে হেম্‌সে তিন-চারজন অভিজ্ঞ কমান্ডো প্রেরণ করে রাখা হয়েছে, যারা সেখানে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। খতীব তাদের কমান্ডার।

পরদিন সকালে তাবরিজ হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

যুগটা কাফেলাবদ্ধ হয়ে সফর করার। আবার কেউ একাকীও সফর করে। একাকী সফরকারীরা পথে দু'চারজন লোক দেখলে গন্তব্য এক হলে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এভাবে এক একটি কাফেলার রূপ ধারণ করে এবং ধীরে ধীরে কাফেলার বহর বাড়তে থাকে।

তাবরিজ এসেছিলো একাকী। ফেরার সময় পথে ক্ষুদ্র একটি কাফেলা পেয়ে যায়, যার গন্তব্যও হেম্‌স নগরী। কাফেলায় ইহুদী ব্যবসায়ীও আছে। দু'টি খৃস্টান পরিবার উটের উপর সওয়ার। কিছু লোক পায়ে হেঁটে চলছে।

তাবরিজ এই কাফেলায় যুক্ত হয়ে যায়। কাফেলা এগিয়ে চলছে। দীর্ঘ পথ। পথে দু'রাত অবস্থান করতে হয়। তৃতীয়দিন সফরের শেষ দিন। মধ্যরাতের পর কাফেলার হেম্‌স পৌঁছে যাওয়ার কথা। সম্মুখে একটি নদী। নদীটি তেমন বড় নয়। গভীরতা বড়জোর এক কোমর। মানুষ তার মধ্যদিয়ে অনায়াসেই চলাচল করে থাকে।

সফরের শেষ দিন। সূর্য মাথার উপর উঠে এসেছে। কাফেলা দেখতে পায়, দিগন্ত আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। কাফেলা চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। তারা চেষ্টা করছে, বর্ষণ শুরু হওয়ার আগে আগেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। না পারলেও কোন পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে লুকানোর স্থান খুঁজবে। আর যদি সম্ভব হয়, তাহলে ফুলে উঠার আগেই নদী পার হয়ে যাবে।

ভাবতে না ভাবতে গোটা আকাশ ঘোর কালো মেঘে ছেয়ে যায়। সঙ্গে দমকা বাতাস। এলাকাটা পাহাড়ী। তারা যখন নদীর কূলে গিয়ে পৌঁছে, ততক্ষণে মেঘ দুনিয়াটাকে ঘোর তমশাচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং এমন মুষলধারায় বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে যে, চোখ খুলে হাঁটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাফেলার এক বৃদ্ধ খৃস্টান বললো, নদী ফুসছে। তবে এখনো অতিক্রম করা সম্ভব। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও।

বৃদ্ধের সঙ্গে উটের উপর বসা একটি সুন্দরী যুবতী। খৃস্টান মেয়ে। কাফেলা নদীর কিনারায় পৌঁছে গেছে। নদীর পানি ঘোলা হয়ে গেছে। গতিতে উচ্ছ্বাসের জোশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। গভীরতা এখনো বাড়েনি। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। সময়টা সকাল হলেও মেঘ প্রকৃতিতে সন্ধ্যার পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছে। আকাশে সূর্য দেখা যাচ্ছে না। যেন দিবসের কর্তব্য পালন করে যথা সময়ে অস্তমিত হয়ে গেছে। একজন তার ঘোড়াটা নদীতে নামিয়ে দেয়। কয়েক পা এগুতেই চীৎকার করে বলে ওঠে– 'এসে

পড়ো। পদাতিকরাও আসো। পানি গভীর নয়।'

কেউ দেখলো না উজানের দিকে থেকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে তীব্র ও ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস ধেয়ে আসছে। পাহাড়ী অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস তীব্র হয়ে থাকে। উপর থেকে এমন মুষলধারায় বৃষ্টি নামছে, যেনো আকাশটা চালনি হয়ে গেছে, পানি আটকে রাখতে পারছে না। কাফেলার উট-ঘোড়াগুলো বোধ হয় এই শঙ্কাই অনুভব করছিলো। এমন একটি নদী অতিক্রম করা যে প্রাণীগুলোর পক্ষে কোন ব্যাপার ছিলো না, তারা এখন নদীতে বেয়াড়ার ন্যায় আচরণ করছে। সম্মুখে অগ্রসর হতে যেনো তাদের মন সায় দেয় না। অথচ পানি এখনো গভীর নয়।

হঠাৎ- নিতান্তই হঠাৎ নদীটি পানিতে ভরে যায়। পর্বতসম উঁচু বিশাল বিশাল ঢেউ এসে আঘাত হানতে শুরু করে। পানি গভীরতর হয়ে যায়। নদীর পাড় উপচে পানি উপরে উঠে আসে- আরো উপরে। কাফেলার পদাতিক সদস্যরা সাঁতার কাটতে শুরু করে। উটগুলো চীৎকার জুড়ে দেয়। কাফেলা নদীতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। নদীর অপর পার দূরে নয়। কিন্তু তীব্র স্রোত কাউকে আড়াআড়ি এগুতে দিচ্ছে না। কাফেলার সকল সদস্য আপন আপন জীবন রক্ষার চেষ্টা করছে।

খৃস্টান মেয়েটির চীৎকার শোনা গেলো। তাবরিজ নিকটেই কোথাও আছে। মেয়েটির চীৎকার তার কানে আসে। তাবরিজ দেখতে পায়, মেয়েটি যে উটের পিঠে সওয়ার ছিলো, সেটি স্রোতের মোকাবেলা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তার পা উপড়ে গেছে এবং তীব্র স্রোত তাকে ফেলে দিয়েছে। তার পিঠের উপর বসা মেয়েটি নদীতে ছিটকে পড়ে যায়। পানির স্রোত-উচ্ছ্বাসের অবস্থা হলো, কখনো ঢেউ উপরে উঠে ঠায় দাঁড়িয়ে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার কখনো ঘূর্ণিপাকের রূপ ধারণ করছে। হৈ-হুল্লোড়, আর্তচীৎকার এতো তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, কেউ কারো শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। তাবরিজ যদি নিকটে না থাকতো, তাহলে মেয়েটির চীৎকারও কেউ শুনতো না। তাবরিজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না বটে, তবে স্রোত-ঢেউয়ের মোকাবেলা করে চলেছে। তাবরিজ মেয়েটিকে পানিতে ছিটকে পড়তে দেখে নিজের ঘোড়াটা স্রোতের অনুকূলে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ঘোড়া তেমন দ্রুত সাঁতার কাটতে পারছে না।

তাবরিজ ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে

মেয়েটির পেছনে চলে যায়। একটি ঢেউ মেয়েটিকে উপরে তুলে ফেললে তাবরিজ তাকে দেখে ফেলে। তাবরিজের তরুণ বাহুতে শক্তি আছে। সে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ধরে ফেলে। মেয়েটি এখনো ডুবে যায়নি বটে; কিন্তু সে সাঁতরাতে পারছে না। তাকে সামলে রাখা তাবরিজের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। উত্তাল নদীতে নিমজ্জমান একটি খৃষ্টান মেয়েকে বাঁচানোর জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করছে তাবরিজ। এরই মধ্যে স্রোত তাদেরকে অনেক দূর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তাবরিজ মেয়েটিকে নিজের পিঠের উপর তুলে নিয়ে কূলের দিকে সাঁতরাতে শুরু করে। কিন্তু স্রোতের তোড়ে মেয়েটি তাবরিজের পিঠ থেকে ছিটকে যায়। মেয়েটির এখন চৈতন্য নেই। যদি মুসলিম যুবক তাবরিজের দেহে শক্তি আর হৃদয়ে মানবতাবোধ না থাকতো, তাহলে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে সে নিজের জীবন রক্ষারই চেষ্টা করতো।

কাফেলা যে স্থান থেকে নদীতে অবতরণ করেছিলো, তার থেকে অন্তত দু'মাইল দূরে তাবরিজ মেয়েটিকে নিয়ে কূলে ভিড়ে। কূলে বিস্তৃত প্রান্তর। তাবরিজ মেয়েটিকে উপরে তুলে মাটিতে শুইয়ে দেয়। মেয়েটি জীবিত। তবে অচেতন। অচেতন মানুষের চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে কী করতে হয়, তাবরিজ জানে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ মেয়েটি মুদিত চক্ষেই নড়ে ওঠে এবং আপনা-আপনি উপুড় হয়ে যায়। পেটে চাপ পড়লে মুখ দিয়ে নদীর ঘোলা পানি বের হতে শুরু করে। তাবরিজ মেয়েটির কটিতে হাত রেখে চাপ দেয়। এবার আরো পানি বেরিয়ে আসে। উদ্দীপ্ত তাবরিজ এবার আরো জোরে চাপ দেয়। মেয়েটির পেট পানিশূন্য হয়ে যায়।

আকাশ মেঘমুক্ত হতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জোর কমে গেছে। মেঘের ফাঁক গলে কিছু আলোও পৃথিবীতে এসে পড়ছে। তাবরিজ মেয়েটিকে সোজা করে শোয়ায়। মেয়েটি পলকের জন্য সামান্য চোখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেলে। তাবরিজের শরীরটা অবশ হয়ে গেছে। নিজের ঘোড়াটা নদীতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। এখন আর তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। ঘোড়ার পরিণতি কী ঘটেছে, তাবরিজ জানে না। হয়তো মরে গেছে, নয়তো পানিতে জীবিত ভাসছে।

তাবরিজের ক্লান্তি কমে এসেছে। শরীরটা এখন মোটামুটি চাঙ্গা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা অস্ত গেলো বলে। তার মনে পড়ে যায় রাত আসছে। এখন একটা আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু আশা

আছে, অঞ্চলটা যেহেতু পাহাড়ী, তাই কোথাও না কোথাও একটা গুহা পেয়ে যাবে। দীর্ঘ পথের পথিকরা মাটির টিলা এবং বালুকাময় প্রান্তরে গুহা তৈরি করে রাখে, যা অন্য পথিকদেরও কাজে আসে।

তাবরিজ মেয়েটিকে পিঠে তুলে নিয়ে দু'টি টিলার মধ্যদিয়ে হাঁটতে শুরু করে। আশ্রয় পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকলেও আশা আছে তার। যুবক মনে মনে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে করতে এগিয়ে চলে। বেশকিছু সময় হেঁটে ডান-বাম ঘুরে একটি প্রশস্ত স্থানে গিয়ে পৌছে। তাবরিজ দেখতে পায়, একটি টিলার কোল ঘেঁষে তিন-চারটি উট দাঁড়িয়ে আছে। উটগুলোর পিঠে যিন নেই। কাজেই এগুলো কোন মুসাফিরের বাহন নয়।

তাবরিজ উটগুলোর নিকটে পৌছে যায়। এবার সে মানুষের কথা বলার শব্দ শুনতে পায়। শব্দটা যেদিক থেকে ভেসে আসে, তাবরিজ সেদিকে তাকায়। টিলার অভ্যন্তরে একটি উঁচু ও সুপরিসর গুহা দেখতে পায়। ভেতরে তের-চৌদ্দ বছর বয়সের দু'টি বালক দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় ওরা বৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গুহায় ঢুকে আশ্রয় নিয়েছে।

'তোমরা নদী থেকে বেরিয়ে এসেছো বুঝি?'— এক ছেলে বললো— 'এখানে এসে পড়ো, বেশ ভালো জায়গা।'

জায়গাটা সত্যিই চমৎকার। প্রশস্ত কক্ষের ন্যায়। ভেতরটা একেবারে শুকনো-ঝরঝরে। কোন মুসাফির দল কিংবা ধারে-কাছের কোন রাখাল নিপুণভাবে কেটে কেটে কক্ষটি তৈরি করেছে। ছেলে দুটো ভেতরে আগুনও জ্বালিয়ে রেখেছে। তাবরিজ মেয়েটিকে পিঠ থেকে নামিয়ে গুহার মেঝেতে শুইয়ে দেয়। মেয়েটির এখনো জ্ঞান ফেরেনি। গুহার একদিকে কতগুলো শুষ্ক ঘাস ও গাছের শুক্‌নো ডালের স্তূপ পড়ে আছে।

'তোমরা এখানে কী করছো?' তাবরিজ ছেলে দুটোকে জিজ্ঞেস করে।

'আমাদের বাড়ি নদীর ওপারে'— এক ছেলে উত্তর দেয়— 'মাঝে-মধ্যে আমরা উট নিয়ে এখানে আসি। ঘাস ওখানেও প্রচুর আছে। কিন্তু এখানে খেলতে আসি আর চরাবার জন্য উটগুলোও সাথে নিয়ে আসি। এক জায়গায় নদীটা বেশ চওড়া। ওখানে পানি কম— এক হাঁটুর বেশি থাকে না। আমরা ওখান দিয়ে আসা-যাওয়া করি। আজো আসলাম আর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। আমরা এখানে আগুন জ্বালিয়ে খেলছি।'

'এখন বাড়ি যাবে কীভাবে?'— তাবরিজ জিজ্ঞেস করে— 'নদী তো

পানিতে ভরে গেছে। নদী এখন উত্তাল।'

'এই নদীর জোর বেশিক্ষণ থাকে না'– এক ছেলে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললো– 'আমরা যেখান দিয়ে আসা-যাওয়া করি, সেখানে নদী উত্তাল হয় না। পানি ছড়িয়ে যায় বলে বেশি স্রোত হয় না।'

বৃষ্টি থেমে গেছে। সূর্য অস্ত্র যাচ্ছে। বালক দু'টি উট নিয়ে চলে গেছে। তাবরিজ তাদের কোন সহায়তা কামনা করেনি। এও ভাবেনি, ওদেরকে বলে মেয়েটিকে নিয়ে ওদের গ্রামে চলে যাবে কিনা।

ছেলেদের চলে যাওয়ার পর তাবরিজ নিভু নিভু আগুনে শুকনো ডাল ছুঁড়ে দেয়। আগুন জ্বলে ওঠে। তাবরিজ গায়ের টাখনু পর্যন্ত লম্বা ভিজা কাপড়টা খুলে আগুনের উপর ধরে শুকাতে শুরু করে। মনে মনে শোকর আদায় করছে তাবরিজ। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তার জন্য আগুন জ্বালাতে আল্লাহ এই ছেলেগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

ইত্যবসরে মেয়েটি চোখ মেলে তাকায়। তার চেহারায় ভীতির ছাপ। মেয়েটি এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে। তাবরিজকে দেখামাত্র মুখটা আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাবরিজের ঊর্ধ্বাংশ নগ্ন। নদীর ঘোলা পানি তার মাথার চুল ও চোহরাকে ভয়ঙ্কর বানিয়ে রেখেছে।

'ভয় পেও না'– তাবরিজ মেয়েটিকে বললো– 'আমাকে চেনো না? আমি তোমার সফর সঙ্গী ছিলাম।'

'কিন্তু তুমি মুসলমান'– মেয়েটি উঠে বসে। তার সর্বাঙ্গে ভীতির ছাপ। বললো– 'তোমার উপর ভরসা রাখা আমার উচিত হবে না। আমাকে চলে যেতে দাও।'

'যাও'– তাবরিজ বললো– 'পারলে চলে যাও।'

মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। চলে যাওয়ার জন্য সম্মুখে পা বাড়ায়। গুহার বাইরে এক পা রেখে বাইরে রাতের ঘোর অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। ভেতরে আলো জ্বলছে। মেয়েটি মোড় ঘুরিয়ে তাবরিজের দিকে তাকায়। শুক্নো বৃক্ষ ডালের আগুনে তাবরিজকে একজন রহস্যময় মানুষ বলে মনে হলো। তাবরিজও মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভেতর দিকে এক-দু'পা এগিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ার মতো করে বসে পড়ে এবং অসহায়ের ন্যায় তাবরিজের মুখপানে তাকিয়ে থাকে।

'তোমার চেয়ে সেই ঘোড়াটি আমার বেশি প্রিয় ছিলো, যাকে নদীতে

ছেড়ে দিয়ে তোমাকে ডুবে মরা থেকে রক্ষা করেছি।' তাবরিজ বললো।

'আমার দাম বিশ-পঞ্চাশটি ঘোড়ার চেয়েও বেশি'– মেয়েটি অস্ফুট ও কম্পিত কণ্ঠে বললো– 'আমার বিশ্বাস, তুমি আমার ন্যায় রূপসী মেয়ে কখনো দেখোনি। তুমি আমার শ্লীলতা বিনষ্ট করে আমাকে বিক্রি করে ফেলবে। তোমার হাতে আমি অসহায়। তোমাকে ঠেকাবার কেউ নেই!'

'আছে'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'তোমার থেকে আমাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ আছেন। এ যাবত তিনিই ঠেকিয়ে রেখেছেন। অন্যথায় তোমার ন্যায় একটি সুন্দরী যুবতীকে এভাবে হাতে পেয়ে কোন পুরুষ ঠিক থাকতে পারে না। আমি পারলাম কীভাবে! আমি তোমাকে সেই উত্তাল নদীর গ্রাস থেকে রক্ষা করেছি, যাতে শক্তিশালী প্রাণী উট পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। তারপর এখানে মাথার উপর ছাদ আর জ্বলন্ত আগুন পেয়ে গেলাম। এসব অলৌকিক ব্যাপার নয় কি? আমি আল্লাহর সমীপে দু'আ করেছি। আল্লাহ কেবল সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, যার নিয়ত স্বচ্ছ। দু'টি বালক এই আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ওরা ফেরেশতা ছিলো। আমি আমার ধর্মের আলোকে কথা বলছি। তুমি এ কারণে ভয় পাচ্ছো যে, তোমার ধর্ম মিথ্যা। আর এই জন্য যে, তোমার দৃষ্টি তোমার দেহের উপর নিবদ্ধ, যা অতিশয় আকর্ষণীয়। আর তোমার চোখে আছে শুধুই তোমার মুখাবয়ব, যেটি অত্যন্ত সুন্দর। বিপরীতে আমার দৃষ্টি হচ্ছে আমার আত্মার প্রতি, যা তোমার দেহ অপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয় এবং তোমার চেহারার চেয়ে অধিক সুন্দর। আমি জানি, কিছুক্ষণ পর তুমি আমাকে তোমার দেহটা সপে দিয়ে বলবে, বিনিময়ে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দাও। কান খুলে শুনে নাও সুন্দরী! আমি আমার আত্মাকে নাপাক হতে দেবো না। তুমি বলেছো, আমি তোমার ন্যায় রূপসী মেয়ে আর দেখিনি। এ কথা বলে তুমি আমার যৌনতাকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করো না।'

তাবরিজের বক্তব্যের এতোই ক্রিয়া যে, মেয়েটির মুখ বন্ধ হয়ে যায়। সে অবাক ও বিহ্বল দৃষ্টিতে তাবরিজের প্রতি তাকিয়ে থাকে। তাবরিজের বক্তব্যে মেয়েটি পরিষ্কার নিষ্ঠা ও প্রত্যয় আঁচ করছে।

'আগুনের কাছে চলে আসো'– তাবরিজ আগুনের উপর ধরে জামাটা শুকাতে শুকাতে বললো। মেয়েটি উঠে এমন ধারায় আগুনের কাছে এসে বসে, যেনো তার মধ্যে আদেশ অমান্য করার কোনই সাহস নেই। তাবরিজ জামার এক কোণটা মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো– 'ধরো,

আগুনের উপর ধরে রাখো।' নিজে অপর প্রান্তটা ধরে জামাটা আগুনের উপর নাড়াতে লাগলো। মেয়েটির জামাও ভেজা। তাবরিজ বললো– 'শুকানোর পর এটি পরিধান করে তোমারটা এভাবে শুকিয়ে নিও।'

'না'– মেয়েটি সন্ত্রস্ত হয়ে বললো– 'আমি গায়ের পোশাক খুলবো না।'

'গায়ের চামড়াটাও খুলে আগুনে রাখবে'– তাবরিজ বললো– 'আমার কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো না মেয়ে! আমি তোমাকে প্রমাণ দেবো, মুসলমানরা জংলী, নাকি খৃস্টানরা। আমি জানি, তুমি কতটুকু পবিত্র। এখন তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছো। আমি তোমাকে কোন শক্ত কথা বলতে পারি না। তুমি নারী। অসহায় নারীর প্রতি হাত না বাড়ানো আমার ধর্মের নির্দেশ।'

'আচ্ছা, আমাকে তুমি ঢেউয়ের মধ্য থেকে কীভাবে তুলে এনেছো?'– মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'অন্যরা কি নদী পার হতে পেরেছে?'

তাবরিজ মেয়েটিকে ঘটনার বিস্তারিত শুনিয়ে বললো, অন্যদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

এতোক্ষণে মেয়েটির ভয় সম্পূর্ণ দূর না হলেও কিছুটা কমেছে। শারীরিক অবস্থাও ভালো হতে চলেছে। তাবরিজের প্রশ্নের জবাবে সে বললো– 'আমি আমার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে হেম্‌স যাচ্ছিলাম। যে এলাকায় আমাদের বাড়ি, সেটি মুসলিম শাসিত। মুসলমানদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা হেম্‌স চলে যাচ্ছি। ওখানে আমাদের প্রভাবশালী আত্মীয় আছে।'

মেয়েটি তার পিতার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে।

কাফেলার সব ক'জন সদস্য নদীর গ্রাস থেকে বেরিয়ে গেছে। একেকজন একেক স্থানে গিয়ে কূলে ভিড়েছে। তারা পরস্পর ডাকাডাকি করে একত্রিত হতে শুরু করেছে।

এখন তারা সবাই একত্র। নেই শুধু তাবরিজ আর খৃস্টান মেয়েটি। মেয়েটি যে উটের পিঠে আরোহী ছিলো, সেটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাবরিজের ঘোড়া কূলে এসে ঠেকেছে। ঘোড়াটি দূরে এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। কাফেলার এক সদস্য ঘোড়াটা ধরে নিয়ে আসে। সকলে নিশ্চিত হয়ে যায়, হেম্‌সের সুদর্শন ও তাগড়া যুবক ঘোড়া থেকে পড়ে ডুবে গেছে।

তাবরিজ উড়ে এসে জুড়ে বসা মানুষ। তদুপরি মুসলমান। তার জন্য কারো দুঃখ নেই। দুঃখ মেয়েটির জন্য। মেয়েটির বৃদ্ধ পিতা, দু'জন খৃস্টান

ও এক ইহুদী মেয়েটির জন্য মুষড়ে পড়েছে। তারা সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে নদীর কূলে কূলে অনুসন্ধান করার কথা ভাবছে। অন্যরা অভিমত ব্যক্ত করে, প্রয়োজন নেই। মেয়েটি ডুবেই গেছে। তবু চারজন ঘোড়ার পিঠে আরোহন করে নদীর কূল ঘেঁষে চলতে শুরু করে। সে সময়ে তাবরিজ মেয়েটিকে নদী থেকে তুলে উপরে এনে পেটের পানি বের করছিলো। ওখানে নদীর বাঁক ছিলো। ছিলো টিলাও। সে কারণে মেয়েটির অনুসন্ধানকারীরা তাবরিজ ও মেয়েটিকে দেখতে পায়নি। বাঁক ঘুরে যখন তারা ওখানে পৌঁছে, ততক্ষণে তাবরিজ মেয়েটিকে পিঠে করে গুহায় পৌঁছে গেছে। অনুসন্ধানকারীরা সম্মুখে চলে যায়। তারপর সূর্য অস্ত্র গেলে তারা মেয়েটির আশা ত্যাগ করে ব্যথিত মনে হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

'এমন মূল্যবান একটা মেয়েকে হারিয়ে ফেলার দায়ে যদি তারা আমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড না দেয়, তাহলে মনে করবো, তারা অনেক দয়ালু হয়ে গেছে'– বৃদ্ধ বললো– 'মেয়েটি কীভাবে ডুবলো জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেবো?'

'বলবো, আমরা প্রবল তরঙ্গের মধ্যে নিপতিত হলে মেয়েটি খামখেয়ালী করেছে'– ইহুদী বললো– 'আমাদের কথা অমান্য করতে গিয়ে তার এই পরিণতি ঘটেছে। জিদ্‌ ধরে বললো, আমি আলাদা উটে চড়ে একাকী নদী পার হবো। হঠাৎ একটি ঢেউ এসে তাকে আমাদের থেকে দূরে নিয়ে গেছে। তারই হঠকারিতার কারণে আমরা তাকে রক্ষা করতে পারিনি।'

'যা খুশি বলো'– এক খৃষ্টান বললো– 'আমাদের এ বিচ্যুতি যদি ক্ষমাও করে দেয়া হয়, তবুও কি অনুতাপের কথা নয় যে, এমন একটা দক্ষ ও কর্মঠ মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে?' অন্য মেয়ে এনে তার স্থান পূরণ করতে এক মাসেরও বেশী সময় লেগে যাবে।'

'আমি কতবার পরামর্শ দিয়েছিলো, এ কাজে আমাদের দু'টি মেয়ের প্রয়োজন'– বৃদ্ধ বললো– 'হেম্‌সের মুসলমানরা উত্তেজনায় ফেটে যাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই, তারা যে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, তা সাময়িক কিংবা আবেগতাড়িত নয়। আমি গভীরভাবে তাদের প্রশিক্ষণ লক্ষ্য করেছি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, এটা গেরিলা অপারেশন ও কমান্ডো হামলার নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ। আমি তাদের চারজন প্রশিক্ষক দেখেছি। তাদের কায়রো কিংবা দামেশ্‌ক থেকে পাঠানো হয়েছে। লোকগুলোকে কমান্ডো মনে হচ্ছে।'

'তারা যদি আমাদের শাসনাধীন হতো, তাহলে আমরা দেখে নিতাম কীভাবে তারা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।' এক খৃস্টান বললো।

'তুমি কি মনে করো এখানে তারা প্রশিক্ষণ পরিপূর্ণ করতে পারবে?' ইহুদী বললো– 'আমরা তাদের মাঝে আপসে সংঘাত বাঁধিয়ে দেবো।'

'এ লক্ষ্যেই তো আমি মেয়েটিকে দামেশ্‌ক থেকে এনেছিলাম'– বৃদ্ধ বললো– 'হেম্‌সে অরাজকতা সৃষ্টি করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আমি এই মেয়েটির কথা বললাম। তারা বললো, তুমি মেয়েটির পিতা হয়ে যাও এবং তাকে নিয়ে হেম্‌স চলে যাও। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, বসতি স্থানান্তর করছি।'

লোকগুলো রাতের অন্ধকারে পথ চলছে আর নিজেদের গোপন মিশন সম্পর্কে কথা বলছে। বৃদ্ধ খৃস্টানদের অভিজ্ঞ গুপ্তচর এবং ঈমান ও চেতনা বিধ্বংসের ওস্তাদ। সে তার সঙ্গীদের বললো– 'মুসলমান সর্বত্র সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। দামেশ্‌কে নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী মেয়েদেরকে যথারীতি সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। আমি সবখানে মুসলমানদের মাঝে এই জোশ দেখতে পেয়েছি। তবে হেম্‌স ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো আমাদের জন্য এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, এসব অঞ্চলে মুসলিম গেরিলাদের ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ না পাওয়া উচিত। আমি জানতে পেরেছি, এটি সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা সফল না হওয়া দরকার।'

'হেম্‌স সীমান্তবর্তী শহর'– ইহুদী বললো– 'যদি মুসলমানরা এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারে, তাহলে আমাদের জন্য বিপজ্জনক হবে। এখানকার মুসলমাদেরকে বরং সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে তাদেরকে দলে ভিড়িয়ে নেয়া প্রয়োজন।'

'এটা সম্ভব নয়'– বৃদ্ধ বললো– 'আমাকে অবহিত করা হয়েছে, আমাদের লোকেরা নাকি অনেক গুজব ছড়িয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা তাতে কান দিচ্ছে না। আমাকে এও বলা হয়েছে, তাদের খতীব নাকি বেশ প্রভাবশালী মানুষ এবং মুসলমানদের সামরিক প্রশিক্ষণ তারই নির্দেশনা ও পরিকল্পনা মোতাবেক চলছে। মেয়েটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর এখন আমার হেম্‌স না যাওয়াই উচিত ছিলো। কিন্তু তারপরও এই জন্য যাবো যে, দেখতে হবে খতীব লোকটি কে এবং সে আলেম নাকি কোন সেনা কমান্ডার। আমাদেরকে হেম্‌সের খৃস্টান ও ইহুদী পরিবারগুলো থেকে দু'-

একটি মেয়ে সংগ্রহ করতে হবে, যারা এই মিশনে আমাদের সাহায্য করবে। মেয়েদের কাজ কী, তা তোমাদের জানা আছে।'

'আমি তোমাদেরকে দামেশ্‌কেও বলেছিলাম, এখানকার মুসলমানরা পাকা ঈমানদার'– এক খৃস্টান বললো– 'এ পর্যন্ত আমরা তাদের একজনকেও ক্রয় করতে পারিনি।'

আমি সারা জীবন সেই নদীটির উপর অভিশম্পাত করবো, যে আমাদের দিরাকে আমাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে।

'আমার নাম দিরা'– তাবরিজের প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি বললো– 'আমরা গরীব মানুষ। মুসলমানরা দামেশ্‌কে আমাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব করে দিয়েছে। খোদা যেনো গরীবের মেয়েকে রূপ না দেন। বড় বড় আমীরগণ আমাকে ক্রয় করার চেষ্টা করেছে। একজন আমাকে অপহরণ করতে চেয়েছিলো। আমার পিতা আমাকে কাজীর নিকট নিয়ে যান। তিনি আমার ফরিয়াদ শুনেন এবং আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেখানকার শাসন মুসলমানদের হাতে। আমাদের ভয় দূর হয়নি। আমার পিতা দামেশ্‌ক থেকে বের হয়ে যাওয়াই শ্রেয় ভাবলেন। হেম্‌সে আমাদের আত্মীয় আছে। এখন আমরা তাদের নিকট যাচ্ছিলাম। জানি না আব্বা বেঁচে আছেন কিনা। আচ্ছা, তুমি কি একটি অসহায় নিরাশ্রয় নারীর উপর দয়া করবে না?'

রাত অতিক্রান্ত হতে থাকে। বৃদ্ধ খৃস্টান– দিরা যাকে পিতা বলে দাবি করছে– সঙ্গীদেরসহ বহুদূর এগিয়ে গেছে।

'আমার জামা শুকিয়ে গেছে'– তাবরিজ জামাটা দিরার প্রতি ছুঁড়ে দিয়ে বললো– 'আমি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। ওঠো, গায়ের ভেজা জামাটা খুলে এটা পরে নাও। লম্বা আছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে যাবে। পরে নিজেরটা শুকিয়ে বদলে ফেলো।'

'তোমার হাতে আমি অসহায়'– দিরা ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– 'শিকার মারার আগে তার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, তুমি আমার সঙ্গে সেই পশুসুলভ আচরণ করো না।'

'বলছি, ভেজা পোশাকটা খুলে ফেলো।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেই তাবরিজ বাইরে বেরিয়ে যায়।

তাবরিজ আড়ালে চলে গেছে। সেখান থেকে দিরাকে দেখা যায় না।

দিরা সামান্য এগিয়ে গিয়ে তাকায়। তাবরিজ গুহার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গুহার অভ্যন্তরে প্রজ্বলমান আগুন এতো বেশী জ্বলছে যে, আলোটা তাবরিজের পিঠে গিয়ে পড়েছে।

দিরা বুকের ভেতর হাত ঢুকায়। ভেতরে কোমরের সঙ্গে কাপড় বাঁধা আছে। সেই বস্ত্রের মধ্যে খঞ্জর লুকানো। খঞ্জরটা বের করে দিরা পা টিপে টিপে সম্মুখে এগিয়ে যায়। তাবরিজ সম্পূর্ণ অসতর্ক দাঁড়িয়ে আছে। দিরা তার থেকে মাত্র এক পা দূরে। মেয়েটি খঞ্জরটা ডানদিকে নিয়ে তাবরিজের ডান পাজরে সেঁধিয়ে দেয়ার লক্ষে আঘাত হানে। তাবরিজ বিদ্যুৎগতিতে মোড় ঘুরিয়ে দিদার ডান হাতটা ধরে ফেলে এতো জোরে মোচড় দেয় যে, দিরা ঘুরে যায় এবং তার হাত থেকে খঞ্জরটা পড়ে যায়।

তাবরিজ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, তার কয়েক পা সামনেই আরেকটি টিলা। আগুন তাবরিজের পেছনে। তাবরিজ সম্মুখের টিলার গায়ে নিজের ছায়া দেখতে পায়। মেয়েটি আঘাত হানতে উদ্যত হলে তাকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ছায়ার ডান বাহু ডানে বিস্তৃত হয়ে যাওয়া মাত্র তাবরিজ খঞ্জরের ছায়াটা স্পষ্ট দেখে ফেলে। দিরা তাবরিজের পাজরে আঘাত হেনে তার পেটটা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলো। ছায়ার নড়াচড়া দেখে তাবরিজ পেছন দিকে ঘুরে গিয়ে মেয়েটির হাতের কব্জি ধরে ফেলে। মেয়েটির হাত থেকে খঞ্জরটি তুলে নেয়। তাবরিজ খঞ্জরের আগাটা মেয়েটির দিকে তাক করে ধরলে মেয়েটি হাঁটু গেড়ে তার সম্মুখে বসে পড়ে এবং হাতজোড় করে অনুনয় করতে শুরু করে– 'যা বলবে শুনবো; আমাকে খুন করো না।'

'অন্য কোন কথা নেই। বলছি গায়ের ভেজা পোশাকটা খুলে আমার জামাটা পরে নাও'– তাবরিজ আদেশের ভঙ্গিতে বললো– 'দেখেছো তো, আমাকে খুন করার সাধ্য তোমার নেই! আমার চোখ তো সামনেই আছে, পেছনে নয়। তাহলে তোমার আক্রমণটা দেখলাম কীভাবে? আত্মার চোখে দেখেছি। ইচ্ছা করলে কি আমি আমার সামনে তোমাকে পোশাক খোলাতে পারি না? কিন্তু আমি তোমাকে উলঙ্গ দেখতে চাই না। নাও, কাপড়টা বদলে নাও।'

তাবরিজ পুনরায় বেরিয়ে গিয়ে পূর্বের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। দিরা গুহার এক কোণে চলে যায়। তাড়াতাড়ি করে গায়ের ফ্রকটা খুলে। তারপর সেমিজটাও খুলে ফেলে তাবরিজের জামাটা পরিধান করে। দিরার সর্বাঙ্গ ঢেকে যায়। এবার তাবরিজকে ডাক দিয়ে বললো– 'কই এসে পড়ো।'

তাবরিজ ভেতরে প্রবেশ করে। দিরার ফ্রকটা আগুনের উপর ধরে শুকাতে শুরু করে। দিরা লুকিয়ে লুকিয়ে তাবরিজকে দেখতে থাকে। তাবরিজ কোন কথা বলছে না। তার নীরবতা দিরাকে অস্থির করে তুলছে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না, এই তাগড়া সুদর্শন যুবকটা তাকে ক্ষমা করবে। এখন তো খঞ্জর তার হাতে।

তাবরিজ চুপচাপ দিরার পোশাক শুকাতে থাকে। শুকিয়ে গেলে ফ্রকটা মেয়েটির হাতে দিয়ে বললো, পরে নাও। বলেই তাবরিজ গুহা থেকে বেরিয়ে যায়। মেয়েটি আবারও সভয়ে পোশাক পরিবর্তন করে তাবরিজকে ভেতরে ডেকে আনে।

'তোমার কাছেই রাখো'– তাবরিজ খঞ্জরটা দিরার দিকে ছুঁড়ে মেরে বললো– 'ঘুমিয়ে পড়ো। সকালে রওনা হবো।'

'তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো'– দিরা বললো– 'নাকি তুমি অনুভূতিহীন ও মৃত মানুষ?'

'আমি অনুভূতিহীন মৃত কিনা প্রমাণ করবো তোমার বাহিনীর সামনে'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'আমার অন্তরে তোমার বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই। আমি তোমাদের সেই সম্রাটদের শত্রু, যারা আমার মাতৃভূমি দখল করতে এসেছে এবং যারা আমাদের প্রথম কেবলা দখল করে আছে।'

'তোমাদের ভুল তথ্য দিয়ে উত্তেজিত করা হচ্ছে'– দিরা বললো– 'তুমি অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ। যাকে তুমি প্রথম কেবলা বলছো, ওটা ইহুদীদের উপাসনালয়। ওটা হাইকেলে সুলায়মানী। সালাহুদ্দীন আইউবী তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতে চাচ্ছেন। তিনি তোমাদের ন্যায় সহজ-সরল যুবকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে বলে বেড়াচ্ছেন– 'ওটা প্রথম কেবলা, ওটা মসজিদ।'

'আমরা আমাদের খতীব ছাড়া আর কারো কথা শুনে না'– তাবরিজ বললো– 'তুমি শুয়ে পড়ো। আমি তোমার কোন কথা শুনবো না।'

'আমার ঘুম আসছে না'– দিরা বললো– 'তোমাকে আমার ভয় লাগছে। আচ্ছা, তোমাদের খতীব হেম্‌সেরই লোক, নাকি অন্য কোথাও থেকে এসেছেন?'

'তিনি হেম্‌সেরই নাগরিক'– তাবরিজ উত্তর দেয় এবং জামাটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে।

দিরার গুপ্তচরবৃত্তি এবং চরিত্র ধ্বংসের প্রশিক্ষণ আছে। দামেশ্‌কে তাকে এ লক্ষ্যেই পাঠানো হয়েছিলো। আর এখনো একই উদ্দেশ্যে হেম্‌স যাচ্ছিলো। মেয়েটি হেম্‌সের খতীব এবং সেখানকার মুসলমানদের তথ্য

নেয়ার জন্য অনেক প্রশ্ন করছে। কিন্তু তাতে তাবরিজের কোন আগ্রহ নেই। এসব আলাপচারিতায় অনীহা প্রকাশ করে চলেছে সে। মেয়েটি চেষ্টা করছে, যাতে চোখে ঘুম না আসে। কিন্তু এক সময় তার দু'চোখের পাতা বুজে আসে। দিরা ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দিরা চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে ধড়মড় করে উঠে বসে। বাইরে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দিরা অর্ধ মুদিত ফ্যাল ফ্যাল চোখে এদিক-ওদিক তাকায়। দেখে, তাবরিজ বিশেষ এক ভঙ্গিতে নিজ মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বসে। আবার মাথা মাটিতে ঠেকায়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে যায়।

তাবরিজ ফজর নামায আদায় করছে। তাবরিজের নামায পড়ার দৃশ্যটাই দেখে ফেলেছে খৃস্টান মেয়ে দিরা।

দিরা পরিধানের পোশাকটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেয়। রাতে না ঘুমানোর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিদ্রা তাকে জড়িয়ে ধরেছিলো। ঘুম ভাঙ্গার পর সর্বপ্রথম তাবরিজের কথা মনে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে গাটা ছমছম করে ওঠে। কিন্তু মেয়েটি বুঝতে পারে, যে অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো সেই অবস্থায়ই জেগেছে। সব ঠিক আছে তার।

মেয়েটি তাবরিজকে মহান আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত দেখতে পায়। পরিস্থিতিটা আগাগোড়া স্বপ্ন বলে মনে হলো তার কাছে। দিরা জানতো, মুসলমান জংলী জাতি। কিন্তু তাবরিজের মতো একজন সুঠাম দেহের অধিকারী যুবকের তার মতো এক রূপসী যুবতীর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই নেই! এ কেমন জংলীপনা! তাবরিজকে স্বপ্ন জগতের মানুষই মনে হচ্ছে তার।

দিরা পবিত্র মেয়ে নয়। শৈশব থেকেই তাকে চরিত্রহীনতা ও শয়তানি কর্মের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। রূপ এবং দেহের আকর্ষণকে জাদুর ন্যায় ক্রিয়াশীল বানানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত যৌনতা আর অসচ্চরিত্রতা স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু মানব স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যতোই চেষ্টা করা হোক না কেন মানুষের সৃষ্টিগত মৌলিকত্ব ধ্বংস করা যায় না। মানুষ অনৈতিকতা ও আদর্শহীনতার যতোই গভীরে নিমজ্জিত হোক, কোন দিন সুযোগ পেলে তার আসল রূপটা ভেসে ওঠে। মানুষ সুপথে ফিরে আসে। দিরা যেভাবে মৃত্যুর মুখে চলে গিয়েছিলো, সেখান থেকে উদ্ধার লাভের পর এখন তার

মন-মস্তিষ্কে নতুন ভাবনা জাগতে শুরু করেছে। মেয়েটি জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে নিরাপদে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ভয় এখনো কাটেনি। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে তাবরিজ ভীতি। এই মুসলমান যুবকটির ব্যাপারে তার অন্য কোন ভয় নেই। একটিই ভয়, লোকটি যদি যাযাবর কিংবা বেদুইন হয়ে থাকে, তাহলে তাকে কারো নিকট বিক্রি করে দেবে। মেয়েটি বিক্রি হওয়ার পরের কষ্টদায়ক জীবনের ভয় করছে।

রাত কেটে গেছে। তাবরিজ মেয়েটির এই মনোহারী দেহটার প্রতি কামনার দৃষ্টিতে একবারের জন্যও তাকায়নি। মেয়েটি অবচেতনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তারপরও তাবরিজ তার থেকে দূরে থেকেছে। সকালে যখন পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হয়, ততোক্ষণে মেয়েটির সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। বিদূরিত হয়েছে তাবরিজের ভয়ও। রাত নাগাদ মেয়েটি তাবরিজকে বেরসিক, অনুভূতিহীন ও মৃতপ্রাণ কাপুরুষ মনে করছিলো। কিন্তু লোকটাকে তার গভীর দৃষ্টিতে দেখতে ইচ্ছে হলো। তাবরিজের ঠোঁট দু'টি নড়ছে। দিরার মনে হচ্ছে, লোকটা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছে। তার তাবরিজের একটি উক্তি মনে পড়ে যায়– 'আল্লাহ কেবল তাদেরকে সাহায্য করেন, যাদের নিয়ত ও আত্মা পবিত্র।'

তৎক্ষণাৎ দিরার মনে পড়ে যায়, তার নিয়ত তো পবিত্র নয়। তাবরিজের জাতির জন্য সে আপাদমস্তক একটি প্রতারণা। মেয়েটি রাতে এই সিদ্ধান্ত ঠিক করে রেখেছিলো, নিজেকে তাবরিজের হাতে তুলে দিয়ে বলবে, তুমি যা খুশি করো, বিনিময়ে আমাকে হেম্‌স পৌঁছিয়ে দাও।'

আর আত্মা? দিরা জীবনে এই প্রথমবার অনুভব করলো, তার দেহ আত্মা থেকে বঞ্চিত। আর থেকেও যদি থাকে, তা অপরাধ-অশ্লীলতার আবর্জনায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু মরে যায়নি। দিরার উপর দিয়ে যে ঝড় অতিক্রান্ত হয়েছে, তাতে তার আত্মা জেগে ওঠেছে, যা এখন তাকে লজ্জিত করে চলছে। তাবরিজের দেহাবয়বটা এখন তার কাছে অন্য রকম মনে হচ্ছে। তাবরিজকে ফেরেশতা বলে মন হচ্ছে। ফেরেশতা না হলে খোদার সঙ্গে কথা বলতে পারে নাকি। দিরার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। অশ্রু যতোই ঝরছে, মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে নিজের অস্তিত্বটা তাবরিজের অস্তিত্বের মধ্যে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

তাবরিজ দু'আর জন্য হাত উত্তোলন করে। বোধ হয় সে ভুলে গেছে, গুহায় আরো একজন মানুষ আছে। তাবরিজ কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে দু'আ করছে–

'মহান আল্লাহ! তুমি আমাকে সব রকম পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকার হিম্মত দান করো। আমাকে তুমি এমন পবিত্রতা ও সচ্চরিত্র দান করো, যেনো তোমার এই সুন্দর আমানতটা কোন প্রকার খেয়ানত ব্যতীত গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। তোমার এই বান্দা দুর্বল, অসহায়। তুমি আমাকে শয়তানের মোকাবেলা করার সাহস দান করো।'

তাবরিজ আকাশের ফেরেশতা নয়- মাটির মানুষ, রক্ত-মাংসের মানুষ। লোকটি আল্লাহর নিকট মানবীয় দুর্বলতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। দু'আ শেষ করে মুখে হাত বুলিয়ে পেছনে ঘুরে তাকায়। দিরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তাবরিজ কিছুক্ষণ মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে থাকে। মেয়েটিও মূর্তির ন্যায় তার প্রতি তাকিয়ে আছে।

'বাইরে যাও'- তাবরিজ দিরাকে বললো- 'ওদিকে পরিষ্কার পানির ঝরনা আছে। হাত-মুখ ধুয়ে এসো।' তাবরিজ নিজের মাথায় জড়ানো মোটা কাপড়ের হাত দুয়েক লম্বা রোমালটা নামিয়ে দিরাকে দিতে দিতে বললো- 'ভালোভাবে হাত-মুখ ধুয়ে মাথার চুলগুলোও ঝেড়ে-মুছে নাও। জলোচ্ছ্বাসে নিপতিত হওয়ার আগে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, আমি ঠিক সেইরূপ তোমাকে তোমার স্বজনদের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে চাই।'

দিরা তাবরিজের হাত থেকে রোমালটা নিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে যায়, যেনো একজন বোবা ও বধির শিশু কারো ইঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করেছে। তাবরিজের সঙ্গে যে খাদ্য-পানীয় ছিলো, তা ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা ছিলো। এখন তার কাছে খাওয়ার কিছুই নেই।

তাবরিজ দিরার অপেক্ষায় বসে আছে।

দিরা হাত-মুখ ধুয়ে আসে। দেখে তাবরিজ হঠাৎ চমকে ওঠে, যেনো নতুন কাউকে দেখছে। এতোক্ষণ দিরার মাথার চুলগুলো মাটিমাখা ও এলোমেলো ছিলো। আপন রূপটা তার চাপা ছিলো। ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হওয়ার পর এখন মেয়েটির আসল রূপ ফুটে উঠেছে। এখন তাবরিজ তাকে চিনতেই পারছে না। এমন যাদুকরী চুল মাথায় নিয়ে ফিরছে দিরা, যা তাবরিজ কল্পনাও করেনি। এমন রূপ অতীতে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি তাবরিজ। দিরার সুদর্শন মুখাবয়ব এবং মনোহরী আঁখিযুগল তাবরিজকে হতবাক করে দেয়। তাবরিজ সেই তাবরিজের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে, যে খানিক আগে আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান

ছিলো। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে বললো– 'খাওয়ার কিছু নেই। আমাদের উপোস করেই সফর করতে হবে। চলো রওনা হই।' বলেই তাবরিজ দাঁড়াতে উদ্যত হয়।

দিরা তার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'একটু বসো, আমি তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, কিছু জানতে চাই।'

সারাটা রাত তাবরিজ মেয়েটির জন্য মহা এক আতঙ্ক হয়ে ছিলো। কিন্তু এখন তার মানসিক অবস্থা এমন, যেনো মেয়েটি তার উপর জয়ী হয়ে গেছে। তাবরিজ কিছু না বলে উঠতে উঠতে বসে পড়ে।

'আচ্ছা, তুমি যখন খোদার সঙ্গে কথা বলছিলে, তখন কি তুমি খোদাকে দেখতে পাচ্ছিলে?' দিরার প্রথম প্রশ্ন।

'আমি আল্লাহকে দেখি না'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'আমি আলেম নই, তাই বলতে পারবো না দেখা না দিয়েই আল্লাহ কীভাবে নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি দান করে থাকেন। আমি শুধু এটুকু জানি, আল্লাহ আমার কথা ও দু'আ শোনেন।'

'তুমি কি নিশ্চিত, যিনি আমাকে উত্তাল নদীর নিমজ্জন থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি খোদা-ই ছিলেন?' দিরা জিজ্ঞেস করে।

'খতীব আমাদেরকে বলেছেন, আত্মা যদি পবিত্র হয়, তাহলে আল্লাহ যে কোন বিপদে-সমস্যায় সাহায্য করে থাকেন'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'আমি যদি এই নিয়তে তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতাম যে, তুমি অতিশয় রূপসী মেয়ে। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে ডুবে মরতাম।'

'কিন্তু আমার আত্মা তো পবিত্র নয়'– দিরা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো– 'আল্লাহ আমাকে কেন সাহায্য করেছেন? তিনি আমাকে কেন নিমজ্জন থেকে রক্ষা করেছেন?'

'হেম্‌স গিয়ে খতীবকে জিজ্ঞেস করবো– 'তাবরিজ উত্তর দেয়– 'আমার অতো জ্ঞান নেই।'

'আচ্ছা, তুমি আমার দেহটাকে এভাবে উপেক্ষা করলে কেন?' দিরা জিজ্ঞেস করে।

'একজন নারী হিসেবে তুমি আমার যে আচরণের ভয়ে শঙ্কিত ছিলে, আমি যদি তা-ই করতাম, তাহলে আমি তোমার খঞ্জর থেকে রক্ষা পেতাম না'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'আমার হাতে তুমি আল্লাহর আমানত। আর...'

তাবরিজ চুপ হয়ে যায়। খানিক পর অলক্ষ্যে বলে ওঠে– 'তুমি অতিশয় সুন্দর এক আমানত। চলো রওনা হই।'

তাবরিজ অস্থির মনে উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হয়। দিরা তাকে ধরে রাখে। তাবরিজ বললো– 'আমাকে নিজের কাছে বসিয়ে রেখো না দিরা। এমন কঠিন পরীক্ষায় আমাকে ফেলো না বোন! তুমি আমাকে মহান আল্লাহর সমীপে অবনত থাকতে দাও।'

'তোমার আল্লাহর কসম'– দিরা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললো– 'আমাকেও তোমার আল্লাহর সম্মুখে অবনতমস্তক হওয়ার যোগ্য বানিয়ে দাও। তুমি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। তুমি খোদার দূত।'

দিরার চোখে অশ্রু এসে যায়।

'তুমি কাঁদছো কেন?' তাবরিজ জিজ্ঞেস করে।

'আমি একটি পাপী মেয়ে'– দিরা উত্তর দেয়– 'খোদা আমার প্রতি রুষ্ঠ। আমার উট যখন আমাকেই স্রোতের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো, তখনও আমার খোদার কথা মনে আসেনি। আমি মনে করতাম, দেহটাই সব। এই দেহটা আমাকে রক্ষা করতে হবে। পরে নদীর গ্রাস থেকে রক্ষা করে তুমি যখন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে, তখনও আমার একই ভাবনা ছিলো, তোমার থেকে আমার দেহটা রক্ষা করতে হবে। নিজের শরীরটা রক্ষা করার লক্ষ্যেই আমি তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি ব্যর্থ হলাম। আমি নদীর তরঙ্গ থেকেও বেঁচে গেলাম, তোমার থেকেও রক্ষা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তোমার ইবাদত আর দু'আ আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, আমাকে রক্ষাকারী শক্তি অন্য কিছু ছিলো। বলো, সেই শক্তিটা কী? কোথায়?'

'এটি আল্লাহর শক্তি'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'এটি আত্মার পবিত্রতার সুফল।'

'আমার গোটা জীবন একটি পাপ।'

'স্পষ্ট বুঝিয়ে বলো'– তাবরিজ বললো– 'তুমি কি নর্তকি? আমীর-উজিদের কাছে থাকো? আমি শুনেছি, এ ধরনের মেয়েরা খুবই সুন্দরী হয়ে থাকে। তোমার মতো রূপসী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি।'

দিরার মুখে কথা নেই। চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। হঠাৎ জায়গা থেকে সরে তাবরিজের ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। কিন্তু তাবরিজ দূরে সরে বসে। দিরা বললো– 'আমাকে ভয় পাচ্ছো? ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ভীতি এখনো আমাকে তাড়া করে ফিরছে। তুমি আমাকে তোমার কাছে রাখো।'

'না'– তাবরিজ এক বিস্ময়কর হাসি হেসে বললো– 'তুমি আমার এতো কাছে এসো না। আমি বিচ্যুৎ হয়ে যাবো।'

'দেখছো তো আমি কতো বড় গুনাহগার'– দিরা বললো– 'তুমি এ কারণে আমার থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছো যে, তুমি বিচ্যুৎ হয়ে যাবে। আমি বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছি।'

দিরা বুঝে ফেলে তাবরিজের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা আছে; কিন্তু ভাবনায় গভীরতা নেই। ইচ্ছে করলে নতুন যে কোন ছাঁচে তাকে গড়ে নেয়া সম্ভব। দিরা তার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে শুরু করে। বললো– 'আমি যদি বলি, আসো আমরা সারা জীবনের সফরে একত্রে থাকি, তাহলে তুমি কী উত্তর দেবে?'

তাবরিজ মেয়েটির মুখ পানে তাকায়। মুচকি একটা হাসি দিয়ে খানিকটা উজ্জীবিতের ন্যায় বললো– 'চলো, রওনা হই। সূর্য উঠে গেছে। দেরি করলে সমস্যায় পড়বো।'

দিরা নিজের অস্তিত্বে একটি বিপ্লব অনুভব করে, যার তাৎপর্য সে ভালোভাবে বুঝতে পারছে না। উঠে তাবরিজের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। তার দৃষ্টি যতোটা না পথের দিকে, তার চেয়ে বেশি তাবরিজের প্রতি। গত রাতে তাবরিজকে খুন করে হেম্‌স পালিয়ে যাওয়ার চিন্তায় বিভোর ছিলো। কিন্তু এখন তার দ্রুত পথ চলতে ভালো লাগছে না। যতো দীর্ঘ সময় সম্ভব তাবরিজের সঙ্গে থাকার বাসনা বিরাজ করছে তার মনে। চলতে চলতে একবার তাবরিজের হাত চেপে ধরে দিরা বললো– 'আস্তে হাঁটো।'

'না, আমাদের দ্রুত হাঁটা উচিত'– তাবরিজ বললো– 'অন্যথায় আরো একটি রাত এসে পড়বে।'

'আসতে দাও'– দিরা বললো– 'আমি দ্রুত হাঁটতে পারছি না।'

'এখন তাড়াতাড়ি হাঁটো'– তাবরিজ বললো– 'পরে হাঁটতে না পারলে পিঠে করে নেবো।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই আল-আদিল খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনকে হামাতের বাইরে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেছিলেন, যার ফলে বল্ডউইনের বাহিনী দিশা হারিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পেছনে সরে গিয়েছিলো। সেই যুদ্ধের কাহিনী আপনারা পাঠ করেছেন। বল্ডউইন অনেক কষ্টে তার বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে একত্রিত করেছিলেন। খুঁজে-পেতে জীবিত সৈন্যদের

একত্রিত করার পর সম্রাট বুঝতে পারেন, তার কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। এখন বেঁচে আছে অর্ধেকের সামান্য বেশি সৈন্য। তিনি দামেশ্‌ক দখল করতে এসেছিলেন। তার বিপুলসংখ্যক সৈন্য আল-আদিলের কমান্ডো আক্রমণে মারা গেছে। পিছপা হয়ে পালাবার পর অনেকে বিভিন্ন উপত্যকা ও বিজন অঞ্চলে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কতিপয়কে মুসলমান রাখাল, যাযাবর ও গ্রামবাসীরা মেরে ফেলেছে এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও ঘোড়াগুলো কেড়ে নিয়েছে।

বল্ডউইন যখন তার অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে হামাত থেকে দূরে এক স্থানে একত্রিত করেন, তখন তাকে অবহিত করা হলো, আপনার ফৌজের যেসব সৈন্য ও কমান্ডার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো, তারা মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। পরাজয়ের কারণে বল্ডউইনের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। বল্ডউইন বেজায় ক্ষুব্ধ। এই সংবাদে তার ক্ষোভ আরো বেড়ে গেছে। তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, যেখানেই মুসলমানদের কোন বসতি চোখে পড়বে, লুট করো, যুবতী মেয়েদের তুলে নিয়ে আসো এবং কাজ সমাধা করে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দাও।

নির্দেশমতো বল্ডউইনের বাহিনী পুনঃপ্রস্তুতি গ্রহণ করার লক্ষ্যে পিছপা হতে গিয়ে পথের মুসলিম বসতিগুলো একের পর এক ধ্বংস করে ফেলে।

এই বাহিনীটি এখন হেম্‌স থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। বল্ডউইন চেষ্টা করছেন, কোন খৃষ্টান সম্রাট তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, যাতে তিনি আল-আদিল থেকে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারেন এবং নিজের শাসন ক্ষমতাকে– যাকে তিনি ক্রুশের শাসন বলে দাবি করতেন– দামেশ্‌ক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় বাস্তবায়িত করতে পারেন। এ সুবাদেই তিনি অপর এক খৃষ্টান সম্রাট রেজিনাল্ট অফ শাইতুনের নিকট গিয়েছিলেন।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর দিরার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে বৃদ্ধ খৃষ্টান ও তার সঙ্গীরা রাতভর পথ চলতে থাকে এবং সকাল বেলা হেম্‌স গিয়ে পৌঁছে। কাফেলার অন্যান্য লোকেরাও পৌঁছে গেছে। তাদের একজনও হেম্‌সের অধিবাসী নয়। তাদের গন্তব্য আরো সম্মুখে। তাবরিজের ঘোড়া তাদের সঙ্গে। তারা ঘোড়াটা এক মসজিদের ইমামের হাতে তুলে দিয়ে বললো, এটির মালিক হেম্‌সের এক ব্যক্তি। লোকটি জলস্রোতে ঘোড়া থেকে পড়ে ডুবে গেছে এবং ঘোড়াটা তীরে উঠে এসেছে। ইমাম সাহেব ঘোড়াটা বুঝে

নেন। কিছুক্ষণ পরই জানা গেলো ঘোড়াটা কার। ঘোড়া তাবরিজের ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া হলে ঘরে মাতম শুরু হয়ে যায়।

হেম্‌সে এক ইহুদী ব্যবসায়ীর বাড়ি ছিলো। অত্যন্ত ধনশালী মানুষ। যে লোকটি নিজেকে দিরার পিতা বলে দাবি করতো, সে সঙ্গীদেরসহ এই ইহুদীর ঘরে উপবিষ্ট। সে সংবাদ জানায়, দিরা পানিতে ডুবে মারা গেছে।

শুনে সকলে আক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু আক্ষেপে তো আর তাদের সমস্যার সমাধান হবে না। বৃদ্ধ ইহুদী মেজবানকে জিজ্ঞেস করে, হেম্‌সের মুসলমানদের তৎপরতা ও পরিকল্পনা কী?

'খুবই ভয়ঙ্কর'– মেজবান উত্তর দেয়– 'তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এই নগরী সুলতান আইউবীর কমান্ডো সেনাদের আস্তানায় পরিণত হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের বড় মসজিদের খতীব শুধু খতীবই নয়, ফৌজের কমান্ডার এবং প্রশিক্ষক মনে হচ্ছে।'

'আচ্ছা, লোকটাকে খুন করে ফেললে কী লাভ হবে?' বৃদ্ধ খৃস্টান জিজ্ঞেস করে।

'কোন লাভ হবে না'– ইহুদী উত্তর দেয়– 'বরং ক্ষতি হবে। আমাদের উপর মুসলমানদের সন্দেহ সৃষ্টি হবে এবং তারা আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেবে। জানেন তো, এই নগরী মুসলমানদের শাসনাধীন এলাকা।'

'এখানকার ইহুদী-খৃস্টান পরিবারগুলোর মেয়েরা কি কিছু করতে পারে না?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে।

'আপনি জানেন, এ কাজের জন্য কী পরিমাণ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়ে থাকে'– মেজবান উত্তর দেয়– 'আমাদের কোন মেয়েই এতোটা চতুর নয়।'

'সে যাই হোক, এখানকার মুসলমানরা সামরিক প্রশিক্ষণ না গ্রহণ করুক, এটা জরুরী বলে স্বীকার করেন তো?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে।

'আপনি কী নির্দেশ নিয়ে এসেছেন?' মেজবান জিজ্ঞেস করে।

'নির্দেশ খুবই স্পষ্ট'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'রামাল্লায় সালাহুদ্দীন আইউবীর পরাজয় হয়েছে। কিন্তু এই পরাজয় তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। ইতিমধ্যে তিনি সব সামলে নিয়েছেন। তিনি ফৌজ প্রস্তুত করে ফেলেছেন। আমাদের গোয়েন্দারা কায়রো থেকে যে খবরাখবর প্রেরণ করছে, তা সুখকর নয়। সালাহুদ্দীন আইউবী কায়রো ত্যাগ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু এখনো জানা যায়নি তিনি কোন্ দিকে রওনা হবেন এবং কোথায় আক্রমণ

চালাবেন। এদিকে তার ভাই আল-আদিল দামেশ্‌ক থেকে সাহায্য পেয়ে গেছেন। তিনি সম্রাট বল্ডউইনকে এমনভাবে পরাজিত করেছেন যে, এতো সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি পুনর্গঠিত হতে পারেননি। আপনি তো জানেন, সালাহুদ্দীন আইউবী গেরিলা ও কমান্ডো যুদ্ধ লড়ে থাকেন। আমাদের ফৌজের রসদ তার থেকে নিরাপদ থাকে না। হেম্‌সের মুসলমানরা যদি তার গেরিলাদের জন্য আস্তানা করে দেয়, তাহলে এরা রসদ ও অগ্রসরমান সেনাদলের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

এমনি পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের দ্বারা মুসলমানদের মাঝে ফাটল ধরানো এবং তাদের চরিত্র ধ্বংসের কৌশল ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। এসব কাজের জন্য স্থান-কাল স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। সব ক্ষেত্রে সকল কৌশল কার্যকরী হয় না। আমি আমাদের সেই অফিসারদের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করছি, যারা এখানে একটি মেয়েকে প্রেরণ করেছিলেন।'

'তাহলে কী করা যায়?'

'একদম ভিনিস'– মেজবান তার ডান হাতটা তরবারীর ন্যায় ডানে-বাঁয়ে দুলিয়ে বললো– 'পুরো নগরটাকে মানুষজনসহ একদম নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তখন আমরাও এখানে থাকতে পারবো না। আমরা প্রথমে আমাদের স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পদ এখান থেকে সরিয়ে ফেলবো। আমি আশা করি, খৃষ্টান সম্রাট আমাদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসিত হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের আর্থিক ক্ষতি পূরণ করে দেবেন। আমি ইহুদী। হাইকেলে সুলাইমানীর জন্য আমি আমার ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিতে প্রস্তুত আছি।'

'কিন্তু নগরী ধ্বংসের ব্যবস্থা কী হবে?'– বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে– 'এ কাজের জন্য তো সেনাবাহিনীর প্রয়োজন।'

'ফৌজ আছে'– ইহুদী বললো– 'সম্রাট বল্ডউইনের ফৌজের অবস্থান এখান থেকে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় মাইল দূরে। আপনি সম্ভবত জানেন না, এই ফৌজ পিছপা হওয়ার পথের সমস্ত মুসলিম বসতি ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের দ্বারা হেম্‌স ধ্বংস করানো যাবে। আমি আজই রওনা হয়ে যাবো এবং সম্রাট বল্ডউইনকে বলবো, আমাদের এই নগরীটি তার বাহিনীর জন্য কতটুকু বিপজ্জনক।'

'নগরী ধ্বংস করা তো উদ্দেশ্য নয়'– বৃদ্ধ বললো– 'আমাদের উদ্দেশ্য তো হচ্ছে এখানকার একজন মুসলমানকেও বেঁচে থাকতে দেয়া যাবে না।'

'আর মেয়েদেরকে ফৌজ তুলে নিয়ে যাবে।'

সকলে একমত হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, মেজবান ইহুদী আজ রাতেই সম্রাট বল্ডউইনের ছাউনীর উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

ইহুদী রওনা হয়ে যাওয়ার সময় এক অশ্বারোহীকে নগরীতে প্রবেশ করতে দেখে। লোকটি অপরিচিত। খতীবের বাড়িটি দেখা যাচ্ছে। আরোহী খতীবের বাড়ির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খতীবের গৃহের দরজায় করাঘাত করে। খতীব বেরিয়ে এসে লোকটির সঙ্গে হাত মেলান এবং তাকে ভেতরে নিয়ে যান।

'লোকটি কায়রোর দূত।' ইহুদী বললো।

ঈশার নামাযের পর। মুসল্লীরা চলে গেছে। পাঁচ-ছয়জন লোক খতীবের কাছে বসে আছে। তাদের মধ্যে অশ্বারোহী আগন্তুকও আছে। খতীব একজনকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করতে বললেন।

'আমার বন্ধুগণ!'– খতীব বললেন– 'আমাদের এই বন্ধু আল-আদিলের তরফ থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অতি তাড়াতাড়ি কায়রো থেকে রওনা হবেন। আপনারা সবাই সৈনিক এবং গেরিলা অপারেশনে দক্ষ। আপনাদের করণীয় কী বলা প্রয়োজন মনে করি না। প্রশিক্ষণ ও মহড়া জোরদার করুন। আল-আদিল এ সংবাদও প্রেরণ করেছেন যে, খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনের যে বাহিনী হামাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো, তারা আমাদের কাছাকাছি কোথাও ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাদের গতিবিধির সংবাদ আল-আদিলকে পৌঁছাতে হবে। তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন, আমরা খৃস্টানদের এই বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাবো এবং কমান্ডো অভিযান অব্যাহত রাখবো, যাতে তারা স্থির হয়ে বসতে না পারে। সেই সঙ্গে আল-আদিল এ-ও বলেছেন, এই বাহিনী মুসলমানদের বহু জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছে। সৈন্য স্বল্পতার কারণে তিনি তাদের ধাওয়া করতে পারেননি। তিনি আরো বলেছেন, বল্ডউইনের বাহিনী যদি পেছনে নিজ অঞ্চলে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, তবে তাদের ঘাটাবে না। আমি আশঙ্কা করছি, লোকটা ক্ষিপ্ত হয়ে হেম্‌স নগরীকে ধ্বংস করে দেবে। তিনি আমাদেরকে প্রশিক্ষণ ও মহড়া জোরদার করার আদেশ প্রদান করেছেন। হতে পারে, সুলতান আইউবী কোনদিকে আক্রমণ চালালে বল্ডউইন তাদের উপর পেছন কিংবা পার্শ্ব থেকে আক্রমণ করবেন। তখন

আমাদেরকে বল্ডউইনের পেছন অংশের উপর গেরিলা হামলা চালাতে হবে এবং তাকে এখানেই আটকে রাখতে হবে।'

খতীব এক ব্যক্তিকে বল্ডউইনের ফৌজের অবস্থান ও গতিবিধি দেখে আসার জন্য প্রেরণ করেছেন। এ সময় তাবরিজ ও দিরা নগরীতে প্রবেশ করে। তাবরিজ দিরাকে পিঠে করে নিয়ে এসেছে। পথে পানি পাওয়া গিয়েছিলো বটে, কিন্তু খাবার জোটেনি। দিরা খৃস্টানদের রাজকন্যা। পায়ে হেঁটে সফর করায় অভ্যস্ত নয়। তাবরিজ রাতের জন্য কোথাও বিরতি দিতে চাচ্ছিলো না। তাই দিরাকে পিঠে তুলে নিয়ে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করে এসেছে। নিজ গৃহের সম্মুখে এসে তাবরিজ দিরাকে পিঠ থেকে নামিয়ে তাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। ঘরের লোকদের বিশ্বাস হচ্ছে না, তাবরিজ জীবিত আছে। তার ঘোড়াটা আগেই ঘরে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাবরিজ পরিজনকে ঘটনার বিস্তারিত শোনায়।

দিরার জানা আছে, তার গন্তব্য ইহুদী ব্যবসায়ীর ঘর। মেয়েটি এখনই সেখানে পৌছে যেতে চাচ্ছে। পিতার চিন্তায় উদগ্রীব সে। তার আশা, পিতা হয়তো জীবনে রক্ষা পেয়ে পৌছে গেছেন। তাবরিজের ইহুদীর ঘর জানা ছিলো। সে মেয়েটিকে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য রওনা হয়।

দু'জনে পথ চলছে। অন্ধকার পথ। এক স্থানে দিরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় এবং তাবরিজকে জড়িয়ে ধরে। মেয়েটি তাবরিজের প্রতি হৃদতা ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে শুরু করে।

'আমাদের গন্তব্য আলাদা– তোমার এক আমার আরেক'– দিরা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো– 'কিন্তু কোন এক দোরাস্তায় আমরা আবার মিলিত হবো। আমি আমার আত্মার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিলাম। এখন তা পেয়ে গেছি। ভালোবাসা কী বস্তু আমি জানতাম না। তুমি আমাকে তা দিয়েছো। আমি হৃদয়ে তোমার স্মরণ নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে যাবে।'

'না দিরা!'–তাবরিজের মানসিক অবস্থা দিরার চেয়েও বেশি নড়বড়ে। বলতে শুরু করে– 'আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না। তুমি এতোদিন যাবত একটি মিথ্যা ধর্মের অনুসরণ করে এসেছো। অবশিষ্ট জীবন ইসলামের ছায়াতলে কাটিয়ে দাও। আমি তোমার অপেক্ষা করবো। আমার হৃদয়ে এখন অন্য কোন নারী স্থান পাবে না। এখন তো তুমি এই নগরীতেই অবস্থান করবে। সময়-সুযোগ মতো সাক্ষাৎ হবে। তবে সাবধান থাকতে হবে কেউ যেনো না দেখে ফেলে।'

তাবরিজ আমানতের খেয়ানত করেনি। সফরকালেই মেয়েটি তার অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিলো। পরে সে তাবরিজের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিলো। এখন তাবরিজ মেয়েটিকে ইহুদী ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

তাবরিজ দিরাকে নিয়ে ইহুদীর গৃহে পৌঁছে যায়। দিরার পিতা দাবিদার বৃদ্ধ খৃস্টান ইহুদীর ঘরে বসা। দিরাকে দেখে লোকটি আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ উঠে এগিয়ে এসে মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ইহুদী ব্যবসায়ী ঘরে ছিলো না। সিদ্ধান্ত অনুসারে সে সম্রাট বল্ডউইনের সেনা ছাউনির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। বৃদ্ধের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাবরিজ দিরাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আর বিলম্ব করেনি। সেখান থেকেই মসজিদে চলে আসে। মসজিদের দরজা বন্ধ ছিলো। তাবরিজ বিশেষ পদ্ধতিতে দরজায় করাঘাত করে। দরজা খুলে গেলে তাবরিজ ভেতরে ঢুকে পড়ে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এক বছরের মধ্যে বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলেন। তিনি বেশি অপেক্ষা করলেন না। যে রাতে হেম্‌সের ইহুদী ব্যবসায়ী সেনা অভিযান পরিচালনা করে হেম্‌সের মুসলমানদের ধ্বংস করার আবেদন নিয়ে সম্রাট বল্ডউইনের নিকট রওনা হয়ে গিয়েছিলো, সে রাতেই সুলতান আইউবীর ফৌজ কায়রো ত্যাগ করে। তাঁর গন্তব্য দামেশ্‌ক। বাহিনী দ্রুত এগিয়ে চলছে। সুলতান আইউবী সময় নষ্ট করতে চাচ্ছেন না। তৎকালের ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতান আইউবী দামেশ্‌ক অবস্থান করে সেখানকার পরিস্থিতি, বিশ্বাসঘাতক ও কুচক্রীদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে এবং তাদের প্রতিহত করে আল-আদিলের সঙ্গে মিলিত হতে চাচ্ছেন। তারপর সেখান থেকে সামরিক অভিযান শুরু করবেন। কিন্তু পথেই তিনি রাস্তা পরিবর্তন করে ফেলেন।

পথে ইয্‌যুদ্দীনের এক দূতের সঙ্গে আইউবীর সাক্ষাৎ ঘটে। দূত আইউবীর নামে কায়রোতে বার্তা নিয়ে যাচ্ছিলো। সুলতান যে কায়রো থেকে রওনা হয়ে এসেছেন, সে জানে না। মধ্যপথে সে একটি বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে। পতাকা দেখে বুঝে ফেলে এটি সুলতান আইউবীর ফৌজ। দূত বাহিনীর সম্মুখে চলে যায়। সুলতান আইউবী বাহিনীর সম্মুখ অংশে অবস্থান করছেন।

দূত ইয্‌যুদ্দীনের পত্রখানা সুলতান আইউবীর হাতে দেয়। ইয্‌যুদ্দীন নূরুদ্দীন জঙ্গী মরহুমের উপদেষ্টাদের একজন। পদমর্যাদায় একজন

আমীরের সমান। লোকটি নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোক। তাই তার প্রতি জঙ্গীর বিশেষ দৃষ্টি ছিলো। জঙ্গী তাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে সুলতান জঙ্গী তাকে হাল্‌ব প্রদেশে কারাহেসার নামক একটি দুর্গ দান করে তার অধিপতি নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। বেশকিছু অঞ্চল এই দুর্গের অধীনে ছিলো। ইবনে লাউনের প্রদেশটিও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো, যিনি খৃস্টানদের সঙ্গে খৃস্টান আর মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমান হয়ে যেতেন। খৃস্টানদের মদদে তিনি ইয্‌যুদ্দীনের অঞ্চলে সীমান্তের উপর হানা দিতে শুরু করেন। ইয্‌যুদ্দীন একাকী তার মোকাবেলায় পেরে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু হাল্‌ব ও মসুল থেকেও তিনি সাহায্য নিতে চাচ্ছিলেন না। কারণ, হাল্‌ব ও মসুলের শাসনকর্তা আল-মালিকুস সালিহ ও সাইফুদ্দীন প্রমুখ যখনই সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন থেকেই তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিলেন।

ইয্‌যুদ্দীন সুলতান আইউবীর নিকট যে বার্তা প্রেরণ করেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ–

'মহামান্য সুলতান! আপনার এবং সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার অফাদারী সম্পর্কে আপনার কোন সংশয় নেই বলেই আমার বিশ্বাস। আমি তালখালেদের দিক থেকে খৃস্টানদের পথ বন্ধ করে রেখেছি। সমস্ত অঞ্চল এবং অগ্রযাত্রার রাস্তা আমার কমান্ডো সেনাদের দৃষ্টিতে থাকছে। খৃস্টানরা আমাকে রাস্তা থেকে হঠানোর জন্য ইবনে লাউনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। আপনি জানেন, আমার সীমান্ত সেই অঞ্চলের সঙ্গে লাগোয়া, যেটি মূলত আর্মেনিয়ার এলাকা। আর্মেনীয়রা আমার সীমান্ত চৌকিগুলোর উপর আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমার সৈন্য কম। খৃস্টান ও আর্মেনীয়রা দু'বার মূল্যবান উপঢৌকনসহ আমার নিকট দূত প্রেরণ করেছে। তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, যেনো আমি তাদের জোটে যোগদান করি এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে তারা আমাকে হামলার হুমকি দিয়েছে। আমার স্থলে অন্য কেউ হলে নিজের ভূখণ্ড রক্ষার জন্য এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিতো। জায়গাটা এতোই দূরে যে, প্রয়োজন হলে কারো সাহায্য নিয়ে সময় মতো পৌঁছানো সম্ভব নয়। তথাপি আমি তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে তাদের হুমকিকে বরণ করে নিয়েছি। এই পদক্ষেপ আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে নিয়েছি। আমি আমার দুর্গ, অঞ্চল এবং সেই সঙ্গে নিজের জীবনটাও কুরবান করে দিতে

প্রস্তুত আছি। তবু আমি খৃস্টানদের সঙ্গে জোট বাঁধবো না, কাফিরদের সঙ্গে হাত মেলাবো না। আমাকে নূরুদ্দীন জঙ্গীর আত্মার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আমাকে সেই লাখো শহীদের সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, যারা-প্রথম কেবলার জন্য জীবনদান করেছে। আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে আমার জানা নেই। আমি কেবল এটুকু জানি, রামাল্লার দুর্ঘটনার পর আপনি পুনর্গঠন ও অন্যান্য আয়োজন-প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছেন। আমি এও জানি, মুহতারাম আল-মালিকুল আদিল আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। আমি আপনাকে আমার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা আবশ্যক মনে করছি। আপনি যদি আদেশ করেন, তাহলে আমি আমার অঞ্চল ও কারাহেসার দুর্গের দখল ত্যাগ করে বাহিনীসহ আপনার নিকট চলে আসবো। অন্যথায় বলুন, আমি কী করবো। কোন মূল্যেই আমি ক্রুসেডার ও আর্মেনীয়দের সঙ্গে সমঝোতা করবো না।'

সুলতান আইউবী বার্তাটি পাঠ করেন। তৎক্ষণাৎ সালার ও উপদেষ্টাদের তলব করেন। বার্তাটি পড়ে তাদের শোনান এবং নির্দেশ প্রদান করে সকলকে বিস্মিত করে দেন যে, রাস্তা পরিবর্তন করো। আমরা ইবনে লাউনের অঞ্চলে আক্রমণ করবো।

একনায়কের ন্যায় আদেশ করা সুলতান আইউবীর নীতি নয়। তিনি আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে কোন সামরিক অভিযান পরিচালনা করতেন না। কিন্তু এবারকার আদেশের পেছনে সমর কৌশলের পাশাপাশি আবেগও কার্যকর ছিলো।

'কারাহেসার মুহতারাম ওস্তাদ নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্মৃতি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আর ইয্‌যুদ্দীনের ভাষায় আমি জঙ্গী মরহুমের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। আমি সেই লোকটিকে নিঃসঙ্গ ফেলে রাখতে পারি না, যে আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে একমত, যে আমাদের একই পথের অভিযাত্রী।'

'মহামান্য সুলতান!'– এক সালার বললেন– 'আমরা যদি বাস্তবতার আলোকে বিবেচনা করি, তাহলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো।'

'বাস্তবতা হলো, আমাদেরকে সর্বাগ্রে দামেশ্‌ক পৌঁছে সেখানকার পরিস্থিতি অনুধাবন করা আবশ্যক ছিলো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কিন্তু এখন যদি আমরা দামেশ্‌ক চলে যাই, তাহলে ইবনে লাউন তালখালেদের উপর আক্রমণ করে বসবে এবং ইয্‌যুদ্দীন তার হাতে পরাজয় বরণ করবে। সম্মুখে হাল্‌ব। তোমরা আল-মালিকুস সালিহ্ এবং

তার উপদেষ্টাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানো। আমাদের সঙ্গে তারা যে চুক্তি করেছে, তা এখনো বহাল আছে বটে; কিন্তু চুক্তি লোহার প্রাচীর নয় যে, ভাঙ্গা যাবে না। খৃস্টানদের সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। আমি খৃস্টানদেরকে হাল্‌ব দখল করতে দেবো না, আমি ইয়্যুদ্দীনকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে রাখতে পারবো না।'

কিছুক্ষণ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, বাহিনী তালখালেদ অভিমুখেই এগিয়ে যাবে। সুলতান আইউবী ইয়্যুদ্দীনের দূতকে মৌখিক বার্তা প্রদান করেন, ইয়্যুদ্দীনকে বলবে, তিনি যেনো ইবনে লাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের ফাঁদ পাতেন। বলবে, আপনি বন্ধুত্বের টোপ দিয়ে আলাপ-আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করুন। তাকে এই আশ্বাসও দিন যে, আমার বাহিনীকে আপনার হাতে তুলে দেবো। আমি আমার বাহিনীকে তালখালেদ অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।'

দূত বিদায় নিয়ে চলে যায়।

খৃস্টান গুপ্তচররা সুলতান আইউবীর গতিবিধির প্রতি নজর রাখছে এবং খৃস্টানদের নিকট সংবাদ পৌঁছাচ্ছে। তারা রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের দুর্গ ও অঞ্চলগুলোর প্রতিরক্ষা সংহত করছে। তারা জানে, সুলতান আইউবীর পদক্ষেপ-পরিকল্পনা সম্পর্কে আগাম কিছু বলা যায় না। খৃস্টান হেডকোয়ার্টার যখন গোয়েন্দা মারফত সংবাদ পায়, সুলতান আইউবীর ফৌজ দামেশ্‌কের পথ ত্যাগ করে অন্যদিকে যাচ্ছে, তখন তাদের সেনাপতিরা বললো, আইউবী তার পরীক্ষিত ময়দানে যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন।

হেম্‌সের ইহুদী ব্যবসায়ী– যে হেম্‌সকে ধ্বংস করার জন্য সম্রাট বল্ডউইনের নিকট গিয়েছিলো– ফিরে এসেছে। বল্ডউইনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি তার খৃস্টান বন্ধুদের নিকট সাহায্যের আবেদন করতে গিয়েছেন। তার সেনাপতিরা ইহুদীকে বললো, আমরা সম্রাটের নির্দেশ ব্যতীত কিছু করতে পারি না। তবে কাজ হবে।

ইহুদী ফিরে আসার পর তাকে জানানো হলো, দিরা জীবিত ফিরে এসেছে এবং তাবরিজ নামক এক মুসলমান তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। খৃস্টান ও ইহুদীরা তাবরিজকে নগদ পুরস্কার পেশ করে। কিন্তু তাবরিজ এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

ইহুদী ব্যবসায়ী দিরাকে অকর্মণ্য মনে করছে। কারণ, নগরী ধ্বংস করার আয়োজন সম্পন্ন হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, দিরাকে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু দিরা চতুর মেয়ে। বললো, আমি খতীবকে ঘায়েল করবো এবং যেসব মুসলমান সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, তাদের মাঝে ফাটল ধরাবো। সে আরো বললো, এখানকার মুসলমানদের পরিকল্পনা জ্ঞাত হওয়ার জন্য আমাকে প্রয়োজন।

দিরাকে হেম্সেই রেখে দেয়া হলো। কিন্তু কেউ জানে না, তার এই থাকার আগ্রহ একমাত্র তাবরিজের জন্য।

দিরা তাবরিজের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকে। রাতে নগরী থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এবং দীর্ঘসময় বসে থাকছে। দিরা উঁচু স্তরের একটি সুন্দরী খৃস্টান মেয়ে। তার মোকাবেলায় তাবরিজের কোন মর্যাদাই নেই। দিরা আমীর-উজীর ও রাজা-বাদশাহদের প্রাসাদে বসবাস করার মতো মেয়ে। দামেশ্‌কে প্রশাসনের দু'জন পদস্থ কর্মকর্তাকে সে তার অনুগত বানিয়ে ফেলেছিলো এবং তাদের দ্বারা এমন সব ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলো, যার জন্য সুলতান আইউবীকে দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হয়েছিলো। কিন্তু জলোচ্ছ্বাসের ভীতি আর তাবরিজের চরিত্র তাকে এমন এক ধাক্কা দিয়েছে যে, মেয়েটির ব্যক্তি সত্ত্বায় আত্মা ও আবেগ জেগে ওঠেছে। দিরা তাবরিজের পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে এবং তাবরিজ তার ভালবাসার জালে আটকা পড়েছে।

'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তাবরিজ'– দিরা বললো– 'খতীব এবং অন্যান্য যারা তোমাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, তারা কোথা থেকে এসেছেন?'

তাবরিজ উত্তর দিতে শুরু করলে দিরা বলে ওঠে– 'রাখো, ওসব বাদ দাও তাবরিজ! তাতে আমাদের কিছু আসে-যায় না। যার যা খুশি করুক। এমন সুন্দর রাতটাকে আমি যুদ্ধের আলোচনা দ্বারা কলঙ্কিত করবো কেন!'

দিরা দু'মুখো চরিত্রের মেয়েতে পরিণত হয়ে যায়। যখন তাবরিজের সঙ্গে থাকে, তখন নিষ্পাপ ও পবিত্র মেয়ের রূপ ধারণ করে। তখন তার মনেই থাকে না সে গুপ্তচর। গুপ্তচরবৃত্তির মানসে তাবরিজকে খতীব ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেও শেষ পর্যন্ত তাবরিজকে জবাব দিতে বারণ করে দেয়। আবার এই দিরাই যখন ইহুদী ব্যবসায়ীর ঘরে গিয়ে বসে, তখন সে মুসলমানদের ধ্বংস সাধন বিষয়ে কথা বলে।

❖ ❖ ❖

দেড়-দুই মাস সময় চলে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় দিরা তাবরিজের ঘরে গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। কথার ফাঁকে দিরা তাবরিজকে বিশেষ ভঙ্গিতে ইশারা করে, যার মর্ম তাবরিজ বুঝে ফেলে। তাবরিজ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সাঁঝের আঁধার গভীর হওয়া মাত্র তাবরিজ তাদের সাক্ষাতের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে যায়। দিরাও এসে পৌঁছে। দিরা তাবরিজকে নগরী থেকে দূরে নিয়ে যায়। মেয়েটি কেমন যেনো আতঙ্কিত। তাবরিজ তার ভীতির কারণ জানতে চায়। কিন্তু দিরা কোন উত্তর দেয় না। হঠাৎ একটি শব্দ তাদের কানে ভেসে আসে। কে যেন দিরাকে ডাকছে। তাবরিজ জিজ্ঞেস করে, কে ডাকছে? দিরা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, আমার লোকেরা আমাকে খুঁজছে। চলো, আরো দূরে চলে যাই। বলেই তাবরিজকে টেনে দ্রুতপায়ে আরো দূরে চলে যায়। দিরাকে কে যেন এখনও ডাকছে।

'এসব ডাকাডাকিতে কান দিও না তো তাবরিজ!'– দিরা বিরক্তি প্রকাশ করে বললো– 'আমি যখন তোমার সঙ্গে থাকি, তখন অন্য কারো আওয়াজ শুনতে চাই না।'

সম্মুখে ছোট-বড় অনেকগুলো টিলা। তাবরিজ খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে দিরার সঙ্গে হাঁটতে থাকে। দিরা এক স্থানে দাঁড়িয়ে যায়। এখানে কারো শব্দ এসে পৌঁছাচ্ছে না। হঠাৎ তাবরিজ চমকে উঠে কান খাড়া করে বললো– 'কেমন একটা শোরগোলের মতো শোনা যাচ্ছে! তুমিও শুনতে চেষ্টা করো। মনে হচ্ছে, অনেক লোকজন একসাথে চীৎকার করছে আর ঘোড়া ছুটাছুটি করছে।'

'কিছু না, তোমার কান বাজছে'– দিরা অট্টহাসি হেসে বললো– 'বাতাসের তীব্র ঝাপ্টা টিলার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে অতিক্রম করছে। এটা সেই বাতাসের শব্দ।'

নিজের সুকোমল বাহু আর রেশমী চুলের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিরা তাবরিজের চোখ, কান ও বিবেক কব্জা করে নেয়। তাবরিজ দিরার ব্যাখ্যা মেনে নেয়, এই শব্দ বাতাসের, যা দূর থেকে আসা শোরগোলের ন্যায় শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তার জানা নেই, এই হৈ-হুল্লোড় তার অঞ্চলের মানুষদের এবং সেখানে সেই প্রলয় ঘটে গেছে, যা ইহুদী ব্যবসায়ী ঘটাতে চেয়েছিলো। ঘটনাটা দিরা জানে। এই প্রলয়ের শব্দ তাবরিজের কানে পৌঁছুক, দিরার তা কাম্য নয়।

প্রথমবার ফিরে আসার পর ইহুদী ব্যবসায়ী আবারো বন্ডউইনের নিকট গিয়েছিলো। হেম্‌সের মুসলমানরা কী করছে এবং কিভাবে খৃস্টান বাহিনীর জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, ইহুদী বন্ডউইনকে তা অবহিত করে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করে। মুসলমান বন্ডউইনের প্রিয় শিকার। তিনি ইহুদীর প্ররোচনা ও প্রস্তাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি ইহুদীকে দিনক্ষণ জানিয়ে দেন। তিনি বলে দেন, সে রাতে হেম্‌সের ইহুদী ও খৃস্টানরা যেন আগে-ভাগে এলাকা থেকে সরে যায়। কাজটা করবে তারা রাতে। দিনে এলাকা ত্যাগ করতে গেলে মুসলমানরা সন্দেহ করে ফেলবে, কিছু একটা সমস্যা আছে। ইহুদী ফিরে এসে যখন তার লোকদেরকে পরিকল্পনা জানালো, তখন দিরা বললো, আমি তাবরিজ এবং তার পরিবারকে রক্ষা করতে চাই।

'আমরা একে ক্রুশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করবো।' বৃদ্ধ খৃস্টান বললো।

'সাপের বাচ্চাকে রক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' ইহুদী বললো।

'এখানে মুসলমানদের দু'টি পরিবার আছে, যাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে'– হেমসের এক খৃস্টান অধিবাসী বললো– 'কিন্তু আমি তাদেরকে রক্ষা করার কথা ভাবি না। আমি মুসলমানদের রক্ত চাই। কোন মুসলমানের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু তারপরও সে আমার ধর্মের শত্রু।'

'যে লোকটি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এনেছে, আমি তাকে বাঁচাতে চাই।' দিরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো।

'আমরা তাকে এতো পরিমাণ পুরস্কার পেশ করেছিলাম, যা সে কখনো স্বপ্নেও দেখেনি'– ইহুদী বললো– 'কিন্তু সে বললো, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আমরা পুরস্কার পেশ করে আমাদের দায়িত্ব আদায় করেছি। এখন সে আমাদের শত্রু, আমরাও তার শত্রু।'

'আমি তাকে শত্রু মনে করি না'– দিরা ঝাঝালো কণ্ঠে বললো– 'আমি এই একজন পুরুষ পেয়েছি, যে আমার দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হয়নি। তোমরা সকলে পাপী। তোমাদের মধ্যে একজন লোকও এমন আছে কি, আমার ব্যাপারে যার নিয়ত পরিচ্ছন্ন? আমার চোখে নিজের চেহারাটা দেখে জবাব দাও।'

'আচ্ছা, তুমি শুধু তাবরিজকে রক্ষা করো'– ইহুদী বললো– 'কিন্তু বাঁচাবে কী করে? কী ঘটতে যাচ্ছে, যদি তুমি তাকে বলে দাও, তাহলে সে

সকলকে বলে দেবে না? তুমি যদি তার পরিবারকে নগরী থেকে বেরিয়ে যেতে বলো, তাহলে কি তারা এর কারণ জিজ্ঞেস করবে না? তখন তুমি কী উত্তর দেবে? একজন মুসলমানকে উপকারের প্রতিদান দিতে গিয়ে তুমি সেই সকল মুসলমানকে সতর্ক করে দেবে, যারা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আমাকে আনাড়ি মনে করো না'– দিরা বললো– 'আমি ক্রুশকে ধোঁকা দেবো না।'

আক্রমণের দিন সন্ধ্যায় দিরা তাবরিজের ঘরে গিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে আসে। দিরা রাতে প্রায়ই কোথায় চলে যায়, তার লোকেরা জানে। তারা জানে, প্রেমের ধোঁকা দিয়ে দিরা তাবরিজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে।

দিরা তাবরিজকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে নগরীর ইহুদী ও খৃস্টানরা পা টিপে টিপে বের হতে শুরু করে। তারা দিরার সন্ধানে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যে তাকে ডাকতে থাকে। কিন্তু দিরা তাবরিজকে নিয়ে দূরান্তে চলে যেতে থাকে। মেয়েটি তাবরিজকে এতোটুকু দূরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, যেখান থেকে নগরীর হৈহুল্লোড় শোনা যাবে না। দিরার অনুসন্ধানে বের হওয়া লোকটি নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সমগ্র নগরী। খৃস্টান বাহিনীর পদাতিক সৈন্যরা পা টিপে টিপে নগরীর একেবারে নিকটে এসে পৌঁছুলে পেছন থেকে অশ্বারোহীরাও এসে পড়ে। নগরীর মুসলমানরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। খৃস্টান বাহিনী হঠাৎ ঝড়ের ন্যায় আক্রমণ করে বসে। খৃস্টান সৈন্যদের হাতে মশাল। অধিক আলোর জন্য তারা দু'তিনটি ঝুপড়িতে অগ্নি সংযোগ করে দেয়। খৃস্টান সৈন্যরা প্রাচীর টপকে মুসলমানদের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ে। অধিকাংশ মুসলমান সজাগ হওয়ার আগেই মারা যায়। যারা সময় মতো জাগ্রত হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে সক্ষম হয়, তারা মোকাবেলা করে। অনেক মেয়ে খৃস্টানদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করে। খৃস্টান অশ্বারোহীরা নগরীটি ঘেরাও করে রেখেছিলো। তারা কাউকে পালাতে দেখামাত্র বর্শা কিংবা তরবারীর শিকারে পরিণত করে।

এই সেই হট্টগোল ও ডাক-চীৎকার, যা তাবরিজ টিলার অভ্যন্তরে বসে শুনেছিলো। তার গৃহটি ধ্বংস হয়ে গেছে। সম্রাট বল্ডউইন মুসলমানদের এই বসতিটি অধিবাসীদেরসহ ধ্বংস করে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

'আজ তুমি আমাকে এতো দূর নিয়ে এসেছো কেন?'– তাবরিজ দিরাকে

জিজ্ঞেস করে— 'আজ তুমি কথা বলছো না কেন? তুমি সন্ত্রস্ত কেন?'

'কারণ, তুমি আমার সঙ্গ দেবে না'— সুচতুর মেয়ে দিরা বললো— 'আমি তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছি। আগামীকাল ফিরে আসবো।'

'কোথায়?'

'কেন, আমার উপর কি তোমার আস্থা নেই?' দিরা তাবরিজকে উভয় বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে মুখটা তাবরিজের এতো নিকটে নিয়ে যায় যে, তার বিক্ষিপ্ত রেশমী চুলগুলো তাবরিজের গণ্ডদেশ ছুয়ে যায়। এই সেই চুল, গুহায় থাকাবস্থায় যাকে দেখে তাবরিজ যুগপৎ রোমাঞ্চ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। এখন তো মেয়েটির ভালোবাসা তার হৃদয় জুড়ে বাসা বেঁধে বসেছে— 'আমরা আর কতোদিন চোরের ন্যায় এভাবে মিলিত হবো? এখন আর আমি তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারছি না। তোমার হৃদয়ে যদি আমার ভালোবাসা থাকে, তাহলে জিজ্ঞেস করো না আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। মনে করো, সেখানে গিয়ে উপনীত হবো, যেখানে আমাদের মাঝে ধর্মের দেয়াল অন্তরায় হবে না। তুমি পুরুষ। আমাকে দেখো, আমি অবলা নারী হয়ে তোমার ভালবাসার খাতিরে কত বড় ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছি।'

দুর্বল মূলত তাবরিজ। দিরা তার বিবেকের উপর জয়ী হয়েছে। এখন তার প্রচেষ্টা তাবরিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে না যাক। দিরা জানে, ফিরে গিয়ে তাবরিজ তার ভিটায় ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষ আর স্বজনদের অগ্নিদগ্ধ লাশ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। তখন লোকটা পাগল হয়ে যাবে। হয়তো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দিরাকে খুন করে ফেলবে। তাবরিজ দিরাকে জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে স্বসম্মানে হেম্‌স এনে পৌঁছানোর বিনিময়ে এবং ভালবাসার খাতিরে তাবরিজকে খৃস্টানদের হাতে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। এবার তাকে নিজ গৃহ এবং স্বজনদের ধ্বংস ও করুণ পরিণতি দেখার যন্ত্রণা থেকেও বাঁচাতে চায়।

মেয়েটি তাবরিজকে নিয়ে একদিকে হাঁটা দেয়। তাবরিজ তার সঙ্গে কথা বলে চলেছে, যেনো দিরা তাকে যাদু করেছে।

রাত পোহায়ে ভোর হলো। গোটা হেম্‌স নগরী একটি ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই নয়। এখানকার একজন মুসলমানও জীবিত নেই। বড় মসজিদের মিনারটি কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খতীব ও সঙ্গীরা কোন প্রকার মোকাবেলা ছাড়াই শহীদ হয়ে গেছেন। এতক্ষণে

দিরা তাবরিজকে নিয়ে খৃস্টান বাহিনীর সেনা ছাউনির নিকট পৌছে গেছে। এবার তাবরিজের মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে উঠেছে। দিরাকে জিজ্ঞেস করে, আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছো? দিরা চাপার জোরে তাবরিজকে বুঝ দিয়ে দেয়। তাবরিজকে একধারে দাঁড় করিয়ে দিরা এক কমান্ডারের সাথে কথা বলে। কমান্ডার তাকে একটি পথের নির্দেশনা প্রদান করে। দিরা তাবরিজকে নিয়ে সেদিকে চলে যায়।

দিরা সম্রাট বল্ডউইনের প্রাসাদোপম তাঁবুর নিকট গিয়ে পৌছে। রক্ষীরা অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে তাকে বল্ডউইনের তাঁবুতে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে। তাবরিজকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে দিরা তাঁবুতে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর তাবরিজকেও তাঁবুতে ডেকে নেয়া হয়।

বল্ডউইন তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন– 'এই মেয়েটি তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাচ্ছে। আমরা তার আবদার উপেক্ষা করতে পারি না। তোমার ভয় কিংবা সন্দেহ পোষণ করার কোন কারণ নেই।'

'আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবো না।' তাবরিজ বললো।

'ধর্ম পরিবর্তন করতে তোমাকে কে বলেছে?' দিরা বললো।

'তারপর কী হবে?'– তাবরিজ জিজ্ঞেস করে– 'এখানে অবস্থান করে আমি কী করবো? আমাকে ফিরে যেতে দাও।'

'তাবরিজ!'– দিরা নিজের প্রতি তাবরিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার চোখে চোখ রেখে বললো– 'আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমিও সেখানে যাবো, যেখানে তোমাকে যেতে হবে।'

তাবরিজ কিছুই বুঝতে পারলো না।

ইয্‌যুদ্দীনের দূত সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জবাব নিয়ে ইয্‌যুদ্দীনের নিকট পৌছে গেছে। সুলতান আইউবীর নির্দেশনা মোতাবেক ইয্‌যুদ্দীন ইবনে লাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবো এবং সালাহুদ্দীন আইউবীকে ধোঁকা দেবো। তিনি ইবনে লাউনকে এমন এক সবুজ বাগিচা প্রদর্শন করেন, যেনো ইবনে লাউন তার ফাঁদে পড়ে যায়। পরক্ষণেই ইবনে লাউন ইয্‌যুদ্দীনের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে কারাহেসার এসে হাজির হয়। কারাহেসার একটি উচ্চ ও সবুজ-শ্যামল অঞ্চল, যার দর্শনে ইবনে লাউনের চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলে যায়।

দিন কয়েক পর সুলতান আইউবী বাহিনী নিয়ে কারাহেসারের সন্নিকটে এসে ছাউনি ফেলেন। বাহিনী ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। কিন্তু তিনি বিশ্রাম নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছেন না। এই আশঙ্কাও ছিলো যে, আক্রমণে বিলম্ব করলে ইবনে লাউন বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে যাবে। সুলতান আইউবীর ধারণা, ইবনে লাউনের সঙ্গে তার কঠিন মোকাবেলা হবে। এই আশঙ্কার ভিত্তিতেই তিনি হালবের বাহিনীকেও ডেকে এনেছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সহযোগিতা করবেন বলে সুলতান আইউবীর সঙ্গে আল-মালিকুস সালিহের চুক্তি ছিলো।

মধ্য রাতের খানিক পর সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে আক্রমণের জন্য রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। আর্মেনীয়দের চৌকিগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত এবং কোন্ চৌকিতে কতোজন করে সৈন্য আছে, সুলতান আইউবী গোয়েন্দা মারফত সেসব তথ্য জেনে নিয়েছেন। সেনাসংখ্যা যতোই হোক না কেন তারা সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে আছে। ইযযুদ্দীনের পক্ষ থেকে আক্রমণের কোন আশঙ্কাই তাদের ছিলো না এবং সুলতান আইউবীর এতো নীরবে সেখানে পৌঁছে যাওয়া ছিলো তাদের কল্পনার অতীত।

আইউবীর এই আক্রমণ ছিলো তিনতরফা। হামলাকারী প্রতিটি গ্রুপের সঙ্গে ইযযুদ্দীনের গঠন করা গাইড ছিলো। যে গ্রুপটি কৃষ্ণসাগরের দিক থেকে আক্রমণ করেছিলো, সুলতান আইউবী ছিলেন তাদের সঙ্গে।

কৃষ্ণসাগর ইবনে লাউনের রাজ্যের সীমান্ত। ইবনে লাউন তার উপর নৌকার পুল তৈরি করে রেখেছেন। নদীর কূলে আর্মেনীয়দের দুর্গ মুখাযাতুল আহযানের অবস্থান। ইবনে লাউন সেই দুর্গেই অবস্থান করছেন। এই দুর্গটি জয় করতে পারলে সমগ্র এলাকার জয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে কারণেই সুলতান আইউবী নিজের বাহিনীর এই গ্রুপের সঙ্গে থাকেন। এই গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুলতান আইউবীর ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখ শাহ, যিনি বীরযোদ্ধা ও যুদ্ধাভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। অপর দু'টি গ্রুপ চৌকিগুলোর উপর আক্রমণ করে দুশমনের সৈন্যদেরকে হতাহত ও বন্দী করে ফেলে এবং চৌকিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য কয়েকটি জনবসতিতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

সুলতান আইউবীর জানবাজ সৈন্যরা যখন দড়ি বেয়ে দুর্গের প্রাচীরের উপর উঠে যায় এবং মিনজানিকের সাহায্যে ভারি ভারি পাথর নিক্ষেপ করে

দুর্গের দরজা ভেঙ্গে ফেলে, তখন ইবনে লাউনের চোখ খোলে। দুর্গে বাহিনী ঘুমিয়ে ছিলো। টের পেয়ে জাগ্রত হয়ে ইবনে লাউন দৌঁড়ে দুর্গের একটি মিনারের উপর উঠে যান। তিনি দূরে আগুনের শিখা দেখতে পান। কী ঘটছে এবং তার করণীয় কী, ভাবতে না ভাবতে সুলতান আইউবীর একদল জানবাজ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার রক্ষীরা যথাসাধ্য মোকাবেলা করে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আইউবীর সৈন্যরা ইবনে লাউনকে বন্দী করে ফেলে।

ভোরে সূর্যোদয়ের আগে ইবনে লাউনকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে দাঁড় করানো হয়। সুলতান দুর্গটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার আদেশ প্রদান করেন। এ কাজের জন্য তার এই বাহিনী যথেষ্ট ছিলো না। ইয্‌যুদ্দীনও সুলতানের সঙ্গে আছেন। সুলতান আইউবীর পরামর্শ মোতাবেক ইবনে লাউন চতুর্দিকে এই নির্দেশসহ দূত প্রেরণ করেন, যেনো সকল সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করে দুর্গের নিকটে এসে জড়ো হয়। ইতিমধ্যে সুলতান আইউবী ইবনে লাউনের সঙ্গে সন্ধির শর্তাবলী ঠিক করে নেন। একটি শর্ত হলো, ইবনে লাউন তার অর্ধেক বাহিনীকে সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দেবেন। আরেকটি হলো, ইবনে লাউন সুলতান আইউবীকে বাৎসরিক কর প্রদান করবেন। এরূপ আরো কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদিত হয়, যা ইবনে লাউনকে একজন অথর্ব শাসকে পরিণত করে।

ইবনে লাউনের বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করে দুর্গের নিকট এসে সমবেত হয়। সুলতান আইউবী তাদের আদেশ করেন, দুর্গটা এমনভাবে ধ্বংস করে দাও, যেনো এখানে দুর্গের কোন চিহ্ন না থাকে। পরাজিত বাহিনীটি সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ ধ্বংসের কাজ শুরু করে দেয় এবং সুলতান আইউবী তার বাহিনীকে মাসাফা নামক একটি পল্লীর নিকট নিয়ে যান। তিনি হাল্‌বের বাহিনীকে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং নিজ বাহিনীকে বিশ্রামের জন্য দীর্ঘ সময় প্রদান করেন। ইবনে লাউনের যে অর্ধেক বাহিনীকে নিয়েছিলেন, তাকে তিনি ইয্‌যুদ্দীনকে দিয়ে দেন। কিন্তু সুলতান আইউবীর জানা ছিলো না, তার বাহিনীর ছাউনি যে পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত, তার ভেতরে ও চূড়ায় বল্ডউইনের বাহিনী এসে পৌঁছেছে এবং তার উপর ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। সুলতান আইউবী সেই এলাকাটিতে খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। সেখানে কোন শত্রু বাহিনীর আগমন ঘটতে পারে, তা তাঁর ধারণা ছিলো না।

প্রায় সকল ঐতিহাসিক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, সুলতান আইউবী ইয্‌যুদ্দীনের পয়গামের ভিত্তিতে কেন নিজের এতো বিশাল পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ইবনে লাউনের ন্যায় একজন অগুরুত্বপূর্ণ শাসকের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করলেন! সে যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন বটে; কিন্তু যে পরিমাণ সময় ও সৈন্য নষ্ট হয়েছে, তার মূল্যও অনেক ছিলো। আরনল নামক এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, সুলতান আইউবী আশপাশের সমস্যাগুলোকে দূর করতে চাচ্ছিলেন। তৎকালের ইতিহাসবেত্তাগণ– যাদের মধ্যে আসাদুল আসাদী উল্লেখ্যযোগ্য– লিখেছেন, ইয্‌যুদ্দীনের বার্তা পাঠ করে সুলতান আইউবী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন।

মোটকথা, সমর বিশেষজ্ঞরা সুলতান আইউবীর এই অভিযানকে যৌক্তিক বলে মেনে নেননি। তারা লিখেছেন, সুলতান আইউবী জানতেন, নিকটেই কোথাও সম্রাট বল্ডউইনের ফৌজ অবস্থান করছে, যারা তাঁর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসতে পারে। সুলতান আইউবীর ফৌজ যখন পর্বতমালার পাদদেশে ছাউনি স্থাপন করছিলো, ঠিক তখন বল্ডউইন তার বাহিনীকে যুদ্ধ বিন্যাসে পাহাড়ের অভ্যন্তরে ও উপরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এর জন্যও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, বল্ডউইন সময়মতো আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই বলতে পারেননি, এটা তার রাজকীয় নির্বুদ্ধিতা নাকি অপারগতা ছিলো। তিনি যদি তখনই আক্রমণ করতেন, তাহলে সুলতান আইউবীর সেই পরিণতিই ঘটতো, যা রামাল্লায় ঘটেছিলো– পরাজয় আর পিছুহটা।

এখানে ছাউনি স্থাপনের পরও সুলতান আইউবী জানতে পারলেন না, সম্রাট বল্ডউইন তার মাথার উপর বসে দাঁতে ধার দিচ্ছেন। উপর থেকে বল্ডউইনের পর্যবেক্ষকরা সুলতান আইউবীর তাঁবুর প্রতি নজর রাখছে এবং বল্ডউইনকে আইউবী বাহিনীর গতিবিধির সংবাদ অবহিত করছে। সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ব্যবস্থার দুর্বলতার এটিই বোধ হয় প্রথম ঘটনা।

তাবরিজও আইউবীর এই বাহিনীর সঙ্গে আছে। দিরা এখনো বলেনি তাকে সঙ্গে করে কেন নিয়ে এসেছে। মেয়েটি সম্ভবত তাকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে গুপ্তচর বানাতে চাচ্ছে। তার মধ্যে দু'টি চরিত্র সমানভাবে কাজ করছে– এক. ক্রুশের অফাদারি। দুই. তাবরিজের ভালবাসা। তাবরিজকে নিয়ে বল্ডউইনের কোন ভাবনা না থাকলেও দিরার প্রতি তার দুর্বলতা রয়েছে। দিরা অতিশয়

রূপসী মেয়ে। একদিন দিরা বল্ডউইনকে বললো, আমাকে সম্মুখের ছাউনিতে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু বল্ডউইন তাকে ধরে রাখেন।

একদিন বল্ডউইনের গোয়েন্দারা সংবাদ প্রদান করে, সুলতান আইউবীর ফৌজ তালখালেদ অভিমুখে রওনা হয়েছে। বল্ডউইনের কল্পনায় ছিলো না, সুলতান আইউবী ইবনে লাউনের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার বাহিনীকে মাসাফার পার্বত্য অঞ্চল অভিমুখে রওনা হওয়ার আদেশ প্রদান করেন। তার পরিকল্পনা হলো, তিনি সুলতান আইউবীকে এই পার্বত্য অঞ্চলে টেনে এনে লড়াবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি তার সৈন্যদের পাহাড়ের উপযুক্ত এলাকা এবং গোপন স্থানে ছড়িয়ে দেন। আউইবীর জন্য বিশাল এক ফাঁদ পাতেন বল্ডউইন।

বল্ডউইনের এই আদেশ শুনে দিরা বললো, আমি আপনার নিকট আশ্রয় নিতে এসেছিলাম। তাবরিজের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিরা অবহিত করেছিলো, কেন সে তাবরিজকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। এখন যখন বল্ডউইন যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছেন, তো দিরার তার সঙ্গে থাকায় কোন লাভ নেই। কিন্তু বল্ডউইন দিরাকে ছাড়তে নারাজ।

'আমার কাছে মেয়ের অভাব নেই'– বল্ডউইন বললেন– 'কিন্তু তুমিই প্রথম নারী, যে আমার হৃদয়টাকে জয় করে নিয়েছে। তুমি কাছে থাকলে আমার আত্মা শান্তি পায়। তুমি আরো ক'দিন আমার কাছে থাকো।'

দিরা তার সম্রাটদের ভালভাবেই জানে। বল্ডউইনের উদ্দেশ্য বুঝা তার পক্ষে কঠিন নয়। সে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়, বিষয়টা যদি আত্মার শান্তি হয়ে থাকে, তাহলে আমি তা সেই মুসলিম যুবকের নিকট থেকেই লাভ করছি, যার গোটা পরিবারকে হত্যা করিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ফিরছি। জানি না তার পরিজনকে হত্যা করিয়ে এবং সেই সংবাদ তার থেকে গোপন রেখে আমি যে পাপ করেছি, আমার হৃদয় আমার থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে আদায় করবে।'

'তোমারও আত্মা আছে?'– বল্ডউইন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন– 'তোমার মন আছে? মুসলিম আমীরদের সঙ্গে রাত্রি যাপনকারী নারী পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করারও ভাবনা ভাবতে পারে?'

'আপনার সম্মুখে আমি শুধু একটি দেহ– একটি মনোহরী শরীর'– দিরা বললো– 'আর যখন আমি তাবরিজের সম্মুখে থাকি, তখন আমি আত্মা হয়ে যাই– প্রেমপিয়াসী আত্মা।'

বল্ডউইন রাজা। তিনি রাজাদের ন্যায় আদেশ করলেন– 'তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে।' দারোয়ানকে ডেকে বললেন– 'আমাদের তাঁবুতে যে মুসলমানটা থাকে, তার পায়ে শিকল পরিয়ে দাও।'

বল্ডউইন যখন মাসাফার পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে, তখন তাবরিজ শিকলপরা কয়েদী। আর দিরা বন্দী শিকল ছাড়া। রক্ষীদের নজরে দু'জনই বন্দী।

বল্ডউইন বাহিনীর বিন্যাসে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অবসর হয়ে তিনি দিরাকে মানসিকভাবে যন্ত্রণা দিতে শুরু করেন। তাবরিজকে উপস্থিত করিয়ে তিনি দিরাকে তার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তাবরিজকে বেত্রাঘাত করতে আদেশ করেন। তাবরিজের পিঠে হান্টারের আঘাত পড়লে চীৎকার বের হচ্ছে দিরার মুখ থেকে। বল্ডউইন দিরাকে বললেন– 'তুমি আমার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি তোমাকে আমার মুখের উপর কথা বলার শাস্তি দিচ্ছি।'

তাবরিজ বোবা ও বধির হয়ে গেছে যেনো। তার কিছুই বুঝে আসছে না, এসব কী ঘটছে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না, এই শাস্তি তাকে দিরা দেয়াচ্ছে। দিরার চীৎকার-আহাজারিতে সে বুঝে ফেলেছে, মেয়েটিও মজলুম।

তাবরিজ অত্যাচার সহ্য করতে থাকে।

কিন্তু একদিন দিরার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। মেয়েটি বল্ডউইনের নিকট গিয়ে তার পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো– 'আপনি যতোদিন বলবেন এবং যেভাবে বলবেন, আমি আপনার সঙ্গে থাকবো। আমি তাবরিজকে ত্যাগ করেছি।'

বল্ডউইনের নির্দেশে তাবরিজের হাত-পায়ের শিকল খুলে দেয়া হলো এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। দিরা সম্রাট বল্ডউইনের একাকীত্বের রওনকে পরিণত হয়ে যায়।

দিন কয়েক পর এক রাতে বল্ডউইন মদ ও দিরার রূপে মত্ত হয়ে দিরাকে বললো– 'আমি যদি সালাহুদ্দীন আইউবীকে তাবরিজের ন্যায় শিকল পরিয়ে তোমার সম্মুখে এনে দাঁড় করাই, তবে কি স্বীকার করবে আমি এতো বৃদ্ধ নই, যতোটা তুমি মনে করছো?'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবো, আমি রাজা বল্ডউইনের রাণী'– দিরা বললো– 'তোমার তরবারীটা আমার পায়ে রেখে দাও।'

'দুটা দিন অপেক্ষা করো। আমি কাজটা করে দেখাবো।' বল্ডউইন বললেন।

'মনে হয় পারবেন না।' দিরা বললো।

'তুমি দেখোনি, সালাহুদ্দীন আইউবী আমার পায়ের উপর ছাউনি ফেলে রেখেছে'– বল্ডউইন বললেন– 'পরশু ভোরের আঁধারে আমরা তার উপর আক্রমণ চালাবো। কী ঘটছে, তা জানতে না জানতেই তিনি আমার কয়েদী হয়ে যাবেন। এখানে আমার উপস্থিতির কথা তার জানা নেই।'

তাবরিজ এখন মুক্ত। বল্ডউইন তার ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেননি। এখন সে রাজ অতিথি। সকালে দিরা তার তাঁবুতে প্রবেশ করে। তাবরিজ হঠাৎ চমকে ওঠে কথা বলতে শুরু করে।

'কথা বলার সময় নেই'– দিরা বললো– 'আজ আমি তোমার উপকারের প্রতিদান এবং তোমার ভালোবাসার উত্তর দিতে চাই। আমি যা বলি, তা-ই করবে। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। আমি অনেক পাপ করেছি। তোমার হেম্‌স ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি ওখানে যাবে না। তোমার জন্মভূমিটা এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ। তোমার পরিবারের লোকদের হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই।'

দিরা তাবরিজকে এই ধ্বংসযজ্ঞের এবং তাকে রক্ষা করার বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললো– 'তোমাদেরকে বল্ডউইনের বাহিনী থেকে প্রতিশোধ নিতে হবে। আজ এই পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাও, যেনো কেউ দেখতে না পায়। সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট যাও এবং তাঁকে বলো, খৃস্টান বাহিনী তার মাথার উপর বসে আছে এবং পরশু তারা আক্রমণ করবে।'

দিরা তাবরিজকে বল্ডউইনের আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যক্ত করে বললো– 'এখন আর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করো না। অন্যথায় এখান থেকে নড়তে পারবে না। আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমাদের গন্তব্য আলাদা। আজ আমরা উভয়ে আপন আপন গন্তব্য পেয়ে গেছি।'

দিরা যদি হেম্‌সের ধ্বংসলীলা এবং গণহত্যার কাহিনী না শোনাতো, তাহলে তাবরিজ ওখান থেকে এতো তাড়াতাড়ি উঠতো না। তাবরিজ চোখে অশ্রু নিয়ে দিরা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

রাতের আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাবরিজ চুপি চুপি হাঁটতে শুরু করে এবং সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে পার্বত্য এলাকা থেকে বেরিয়ে যায়।

তাবরিজ সুলতান আইউবীর বাহিনীর ছাউনিতে এসে বললো, 'আমি সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

তাবরিজকে সুলতানের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হলো। সুলতান আইউবী

ধৈর্যের সাথে তার কাহিনী শোনেন এবং তার থেকে বল্ডউইনের ফৌজ ও তার পরিকল্পনার তথ্য জ্ঞাত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ তার সালারদের তলব করে তাদেরকে জরুরী নির্দেশনা প্রদান করেন।

সম্রাট বল্ডউইন তৃতীয় রাতে সুলতান আইউবীর ছাউনি এলাকায় আক্রমণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁবুর সারি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তাঁবুতে সৈন্য নেই। হঠাৎ আকাশে সলিতাওয়ালা তীরের স্ফুলিঙ্গ উড়তে এবং তাঁবুগুলোর উপর এসে পড়তে শুরু করে। তাঁবুগুলোতে শুক্‌নো ঘাস ভরে তাতে তরল দাহ্য পদার্থ ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো এসে নিক্ষিপ্ত হওয়ামাত্র ভয়ানক অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে যায়।

এই অবস্থা দেখে বল্ডউইন আক্রমণের জন্য আরো সৈন্য প্রেরণ করেন। তাদের উপর ডান ও বাঁ-দিক থেকে তীর এসে আঘাত হানতে শুরু করে। রাত পোহাতে না পোহাতে বল্ডউইনের উপত্যকায় লুকিয়ে থাকা সৈন্যদের উপর আক্রমণ হয়ে যায়। এবার বল্ডউইন বুঝতে পারে, সে সুলতান আইউবীর উপর অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ চালাতে পারেনি। বরং সে নিজেই আইউবীর ফাঁদে এসে পড়েছে।

বল্ডউইন একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে নিজ বাহিনীর পরিণতি দেখতে শুরু করেন। পেছন থেকে শাঁ করে তার প্রতি একটা তীর ধেয়ে আসে। কিন্তু তীরটি তার দু'জন দেহরক্ষীর গায়ে বিদ্ধ হয়। তিনি পালিয়ে নীচে নেমে এলে সম্মুখ থেকে সুলতান আইউবীর সৈনিকরা ছুটে আসে।

বল্ডউইন একটি সরু পথে পালিয়ে যায়।

১১৭৯ সালের অক্টোবর মাসের এই যুদ্ধে বল্ডউইন বন্দী হওয়া থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যান। সুলতান আইউবী রামাল্লার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে নেন। তাঁর বাহিনীর মনোবল ও আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আর তাবরিজ ও দিরা ইতিহাসের আঁধারে হারিয়ে যায়।
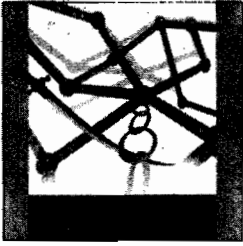
আল-মালিকুস সালিহ

জোহর নামায আদায় করে জায়নামাযে বসে তাসবীহ ঝপ করছেন রোজি খাতুন। খাদেমা কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে সমাহিত কণ্ঠে বললো– 'খালাম্মা! আপনার মেয়ে শামসুন্নিসা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। সঙ্গে আরো লোক আছে।'

রোজি খাতুন প্রথমে অপলক নেত্রে খাদেমার প্রতি তাকিয়ে থাকেন। পরক্ষণে তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করে।

মা-মেয়ের মাঝে যখন বিরহ ঘটে, তখন মেয়ের বয়স ছিলো ৯ বছর। এখন পনের। সংবাদ পাওয়া মাত্র মায়ের 'কই আমার বাছা' বলে ছুটে বেরিয়ে এসে কলজেছেঁড়া ধন মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরার কথা ছিলো। কিন্তু মা কঠিন গলায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন– 'ও কেন এসেছে?'

'আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে খালাম্মা!'– খাদেমা বললো– 'বোধ হয় ও আপনার কোলে ফিরে এসেছে।'

রোজি খাতুন চুপ হয়ে যান। খাদেমা অপেক্ষমান দাঁড়িয়ে আছে। খানিক পর মাথা তুলে বললেন– 'ওকে ফিরে যেতে বলো। বলো, বিশ্বাসঘাতক ভাইয়ের নিকট চলে যাক। আমার চোখের সামনে আসবার দুঃসাহস যেনো ও না দেখায়।'

'আপনার ছেলে যখন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, ও তো তখন অবুঝ ছিলো– মাত্র ৯ বছর'– খাদেমা বললো– 'অবুঝ মেয়েটি কি জানতো ভাই তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!'

'আমি জানি, ওকে তার ভাই পাঠিয়েছে'– রোজি খাতুন বললেন– 'কেন পাঠিয়েছে তাও বলতে পারি। আমার পুত্র গাদ্দার এবং আত্মমর্যাদাহীন। আমি মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো না।'

রোজি খাতুন নূরুদ্দীন জঙ্গী মরহুমের স্ত্রী। আপনারা পড়ে এসেছেন, ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী নূরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তার আমীর-উজির ও কতিপয় আমলা তাঁর পুত্র আল-মালিকুস সালিহকে রাজার আসনে আসীন

করেন। তখন তার বয়স ছিলো এগার বছর। শামসুন্নিসা তার ছোট বোন। বয়স ৯ বছর। নূরুদ্দীন জঙ্গীর শাসনকালের কতিপয় আমীর ও দুর্গপতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাগদাদের খেলাফত থেকে মুক্ত হয়ে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। সুলতান আইউবী সে সময়ে মিসর ছিলেন। জঙ্গী মরহুম ও সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিলো, তাঁরা তাদেরকে ভোগ-বিলাসিতা করতে দিচ্ছেন না। জীবনের সকল সুখ-আহলাদ পরিত্যাগ করে খৃস্টানদের প্রত্যয়-পরিকল্পনাকে চুরমার করে ফিলিস্তীনকে মুক্ত করা এবং সালতানাতে ইসলামিয়ার সম্প্রসারণ ঘটানোই তাদের একমাত্র ব্রত। নূরুদ্দীন জঙ্গী ও সুলতান আইউবীর এই নিরানন্দ জিহাদী জীবনধারাকে বরণ করে নিতে পারেননি তাদের এই বিলাসী আমীর-উজীরগণ।

বিদ্রোহী এই আমীরদের উপর ক্রুসেডারদের প্রভাব ছিলো বিস্তর। সে কারণে ভোগ-বিলাসিতা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য চরিত্রে পরিণত হয়ে যায়। খৃস্টানদের প্রেরিত নারী আর সোনা-মাণিক্য তাদের ঈমান ক্রয় করে ফেলেছিলো। নূরুদ্দীন জঙ্গী মৃত্যুবরণ করেছেন। এবার এই লোকগুলো সুলতার আইউবীকে পরাজিত করে তার শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছেন। তারা জঙ্গী মরহুমের অর্ধেক ফৌজকে বিদ্রোহী বানিয়ে ফেলেছেন। সংবাদ পেয়ে সুলতান আইউবী মাত্র সাতশ' অশ্বারোহী নিয়ে দামেশ্‌ক প্রবেশ করেন। জনগণ তাঁকে স্বাগত জানায়। নগরীর বিচারক তাঁকে ফটকের চাবি দিয়ে দেন। কিন্তু দামেশ্‌কের ফৌজের বিদ্রোহী অংশটি তাঁর মোকাবেলা করে। এটা ছিলো গৃহযুদ্ধ। নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী সুলতান আইউবীর সমর্থক ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে চাচ্ছিলেন।

এক রাতেই বিদ্রোহী বাহিনীর পরাজয় ঘটে। রাতেই আল-মালিকুস সালিহ, তার আমীর-অনুচরবৃন্দ, দু'-তিনজন সালার এবং বিদ্রোহী বাহিনী দামেশ্‌ক থেকে পালিয়ে হাল্‌ব চলে যায়। আল-মালিকুস সালিহ স্বীয় বোন শামসুন্নিসাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। যেসব আমীর ও দুর্গপতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, তন্মধ্যে হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগীন এবং মসুলের আমীর সাইফুদ্দীন অন্যতম।

আল-মালিকুস সালিহ হাল্‌বকে নিজের রাজধানী বানিয়ে নেন। পরে এই নগরীটি তার, গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর

হেডকোয়ার্টারে পরিণত হয়ে যায়। সকলের নিকট খৃস্টান উপদেষ্টা এসে পড়ে। তাদের সঙ্গে মদ আর এমন নারীও আসে, যারা শুধু অপরূপা সুন্দরীই নয়– গুপ্তচরবৃত্তি এবং চিন্তা-চেতনা বিধ্বংসের ওস্তাদও বটে। খৃস্টানরা তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে প্রোপাগান্ডা মিশনকে এমনভাবে ব্যবহার করে যে, তাদের অন্তরে সুলতান আইউবীর বিরোধিতা ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে যায়।

সুলতান নূরুউদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী দামেশ্ক থেকে যান। সেখানে তিনি মেয়েদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। বয়সে তিনি এখনও বার্ধক্যে উপনীত হননি। দু'টি মাত্র সন্তান। দু'জনই অপ্রাপ্তবয়স্ক। দু'জনই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি বুকে পাথর বেঁধে নেন এবং এই বলে সান্ত্বনা নেন যে, স্বামীর সঙ্গে আমার সন্তানরাও মরে গেছে। কিন্তু মাঝে-মধ্যে মমতা উথলে ওঠছে এবং চোখে অশ্রু নেমে আসছে। মায়ের মন বলে কথা।

সুলতান আইউবী হাল্‌ব ও হাররানে গোয়েন্দা প্রেরণ করেছেন। তারা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রিপোর্ট প্রেরণ করছে। ওখানে খৃস্টানরা জোরে-শোরে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

সুলতান আইউবী মিসর থেকে ফৌজ তলব করেন। দামেশ্কের বাহিনীর বৃহৎ অংশটি তাঁর সঙ্গে। তিনি প্রথমে বিদ্রোহী আমীরদের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন, তোমরা ইসলামের মর্যাদার খাতিরে খৃস্টানদের হাতে খেলো না এবং তাদের সঙ্গ দিও না। এসো, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদেরকে ইসলামী দুনিয়া থেকে উৎখাত করে ইউরোপ দখল করে নেই। কিন্তু ঈমান নিলামকারী আমীরগণ সুলতান আইউবীর দূতদের লাঞ্ছিত করে বিদায় দেন। গোমস্তগীন সুলতান আইউবীর দু'জন দূতকে বন্দি করে ফেলেন।

সুলতান আইউবী তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হাল্‌বের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রোজি খাতুন তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য দামেশ্ক থেকে অনেক দূর পর্যন্ত তার সঙ্গে যান। বিদায় জানিয়ে ফিরে আসার সময় বললেন– 'আমার পুত্র যদি আপনার তীর-তরবারী-বর্শার আয়ত্ত্বে এসে পড়ে, তাহলে ভুলে যাবেন ও আমার সন্তান। ও বিশ্বাসঘাতক। ওর লাশ পাওয়া গেলে দাফন করবেন না। শৃগাল-শকুনদের জন্য ফেলে রাখবেন।'

মায়ের চোখ শুষ্ক। কিন্তু সুলতান আইউবীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে

শুরু করে। রোজি খাতুন বয়সে সুলতানের ছোট। তিনি সুলতানের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বিগলিত কণ্ঠে বললেন– 'আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করুন।'

রোজি খাতুন অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাহিনীর যাওয়া প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

এখান থেকেই মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের দীর্ঘ ও খুনরাঙা যুগের সূচনা হয়। সুলতান আইউবীকে মুসলিম আমীরদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুদ্ধ লড়তে হয়েছিলো, আপনারা সে কাহিনী বিস্তারিত পড়েছেন। খৃস্টানদের পরিকল্পনা ছিলো, তারা নিজেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তাদেরকে আপসে লড়াবে এবং ঐক্যের সঙ্গে তাদের সামরিক শক্তিটাকেও নিঃশেষ করে দেবে। পাশাপাশি তারা হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ঘাতকদের দ্বারা বহুবার সুলতান আইউবীর উপর সংহারী আক্রমণও করিয়েছিলো। প্রতিবারই আল্লাহ ইসলামের এই অতন্দ্র প্রহরীটাকে রক্ষা করেছেন।

তিন-চার বছর যাবত মুসলমানরা আপসে যুদ্ধ করে করে মরতে থাকে। মহান আল্লাহ প্রতিটি যুদ্ধে সুলতান আইউবীকে বিজয় দান করেন। এক যুদ্ধে নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রীর প্রেরিত কয়েকশ' মেয়েও যুদ্ধ করেছিলো এবং যুদ্ধের পট-পরিবর্তন করে দিয়েছিলো। কিন্তু সুলতান আইউবী কঠোর নির্দেশ জারি করে দেন, আগামীতে কোন নারী রণাঙ্গনে আসবে না।

সর্বশেষ যুদ্ধে সুলতান আইউবী হাল্‌ব পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং হাল্‌বের প্রতিরক্ষা দুর্গ এজাজ দখল করে নেন। আল-মালিকুস সালিহ স্বীয় বোন শামসুন্নিসাকে কয়েকজন দূতের সঙ্গে সন্ধির প্রতিশ্রুতিসহ সুলতান আইউবীর নিকট প্রেরণ করেন এবং বোনের মাধ্যমে সুলতানের নিকট আর্জি পেশ করান, এজাজ দুর্গটা আমাদেরকে ফিরিয়ে দিন। সুলতান আইউবী জঙ্গীর মেয়েটিকে স্বস্নেহে গলায় জড়িয়ে ধরেন এবং আবেদন মঞ্জুর করে নেন। তিনি এজাজ দুর্গটি জঙ্গীর মেয়েকে দান করেন। কতিপয় শর্ত আরোপ করে আল-মালিকুস সালিহকে হাল্‌বের আধা স্বায়ত্বশাসন প্রদান করেন। তন্মধ্যে একটি শর্ত ছিলো, সুলতান আইউবীর যখন সৈন্যের প্রয়োজন হবে, আল-মালিকুস সালিহ তাঁকে সৈন্য দেবেন। গোমস্তগীনকে আল-মালিকুস সালিহ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হত্যা করেন। বাদ বাকি আমীরগণ সুলতান আইউবীর আনুগত্য মেনে নেন।

সুলতান আইউবী কারাহেসারের শাসক ইবনে লাউনকে পরাজিত করেছিলেন। সে কাহিনী আপনারা পাঠ করেছেন। সে যুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী

হাল্‌ব থেকেও ফৌজ এসেছিলো। তার অব্যবহিত পরই সুলতান আইউবী খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনকে– যিনি সুলতানের উপর আক্রমণ করতে এসেছিলেন– অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বল্ডউইন অল্পের জন্য বন্দি হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে যান এবং তার বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

এখন সুলতান আইউবী উক্ত অঞ্চলেরই কোন এক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। খৃস্টানরা তাদের গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করছে, আইউবীর পরবর্তী অগ্রযাত্রা কোন্‌ দিকে হবে।

নবেম্বর ১১৮১ মোতাবেক রজব ৫৭৭ হিজরীর ঘটনা। আল-মালিকুস সালিহ'র বোন শামসুন্নিসা হাল্‌ব থেকে দামেশ্‌কে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। মেয়েটি যখন মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তার বয়স ছিলো ৮-৯ বছর। এখন সে পনের বছরের তরুণী। আল-মালিকুস সালিহ'র বয়স সতের-আঠার। শামসুন্নিসার সঙ্গে রক্ষী সেনারা আছে। খাদেমা নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রীকে সংবাদটি জানায়। কিন্তু তিনি মেয়েকে সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকৃতি জানান। খাদেমাও নারী। সে রোজি খাতুনকে মত করার জন্য বললো– 'মেয়েটা এতোদূর থেকে এতোদিন পর আসলো। আপনি তাকে ভেতরে ডেকে এনে বলে দিন, সে যেনো চলে যায়। স্নেহ বলতে একটা কথা তো আছে খালাম্মা!'

'আমার স্নেহ মরে গেছে।' রোজি খাতুন বললেন।

এমন সময় এক তরুণী রোজি খাতুনের নামায কক্ষে প্রবেশ করে। মেয়েটার মাথার চুল, মুখমণ্ডল ও পরিধানের পোশাকে ধূলির স্তর জমে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দীর্ঘ সফর করে এসেছে। রোজি খাতুন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি কে?'

মেয়েটি নীরব দাঁড়িয়ে আছে। খাদেমা এক ধারে সরে গেছে। রোজি খাতুন ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর বাহুদ্বয় আপনা-আপনি প্রসারিত হচ্ছে। মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এলো– 'তুমি আমার কন্যা, আমার শামসুন্নিছা।' রোজি খাতুন ধীর পদবিক্ষেপে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছেন আর ক্ষীণ গলায় বলছেন– 'তুমি এতো বড় হয়ে গেছো!' শামসুন্নিসা দরজা ঘেঁষে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

এখন মা-মেয়ের মধ্যখানে ব্যবধান দু'-তিন পা। রোজি খাতুন থেমে

যান। তার প্রসারিত বাহু গুটিয়ে আসে। এতোক্ষণ ঠোঁটে যে মুচকি হাসির আভা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, তা উবে গেছে। দু'-তিন পা অগ্রসর হওয়ার স্থলে দু'-তিন পা পিছিয়ে যান। হাসি হাসি দাঁতগুলো রাগে কড়মড় করতে শুরু করে। মায়ের হৃদয়সাগরে মমতার যে ঢেউ উত্থিত হতে শুরু করেছিলো, তা মিলিয়ে যায়।

'তুমি এখানে কেন এসেছো?' মা চাপা অথচ রোষান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

'মা!'– শামসুন্নিছা দু'বাহু প্রসারিত করে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– 'আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হতে এসেছি। আমি বারো দিনের পথ তিন দিনে অতিক্রম করে এসেছি মা!'

'কিন্তু কেন এসেছো?' রোজি খাতুন উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন এবং বললেন– 'কাছে এসো না, দূরে দাঁড়িয়ে উত্তর দাও। আমি ক্রুসেডারদের ছায়ায় লালিত একটি মেয়েকে আমার কাছে ঘেঁষতে দিতে পারি না।'

'মা! আগে আমার দু'টো কথা শোনো'– শামসুন্নিছা অতিশয় মিনতির স্বরে বললো– 'আমার গায়ের ধুলোবালি দেখো।'

'এই ধুলা থেকে আমি মুজাহিদীনে ইসলামের রক্তের ঘ্রাণ পাচ্ছি'– রোজি খাতুন বললেন– 'সেই মুজাহিদদের রক্ত, যারা আমার পুত্রের বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছে। এটা গৃহযুদ্ধের রক্ত।'

'মা!'– শামসুন্নিছা সম্মুখে এগিয়ে এসে মায়ের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। শামসুন্নিছা কাঁদছে আর বলছে– 'ভাইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত মা। হয়তো এতোক্ষণে মারা গেছে। তিনি মা মা করে আপনাকে ডাকছেন। ভাইয়া বড় কষ্টে আছেন মা। তিনি আমাকে আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন। বলেছেন, তুমি মাকে নিয়ে আসো। আমি তার থেকে দুধের দাবি আর গুনাহ্ মাফ করাবো।'

'আমি তার দুধের দাবি ক্ষমা করতে পারি'– রোজি খাতুন বললেন– কিন্তু তার সেই খুন কে ক্ষমা করবে, যা সে মুসলমানের সন্তান হয়ে মুসলমানদের ঝরিয়েছে? মা স্বীয় পুত্রের গাদ্দারীর অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন না।'

'ভাইয়া আপনার একমাত্র পুত্র মা'– শামসুন্নিছা বললো– 'তিনি আপনার মহান স্বামীর একমাত্র স্মৃতি।'

'কিন্তু সে পিতার মহত্ত্ব-মর্যাদাকে ক্রুসেডারদের পায়ের তলে নিক্ষেপ করেছে।' রোজি খাতুন বললেন।

'তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছেন'–

শামসুন্নিছা বললো– 'এখন আর তাদের আপসে কোন যুদ্ধ হবে না।'

'তুমি কি আমাকে কসম খেয়ে বলতে পারবে, তার কাছে কোন খৃস্টান নেই'– রোজি খাতুন গর্জে ওঠে মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন– 'তার হেরেমে কি কোন ইহুদী-খৃস্টান মেয়ে নেই? এখন সে আঠার বছর বয়সের যুবক। তার নীচের ঘোড়াও অনুভব করতে পারে পিঠের আরোহী একজন পুরুষ। তুমি যদি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারো, আমার পুত্রের দরবার থেকে খৃস্টানদের অশুভ ছায়া সরে গেছে, তাহলে বারো দিনের যে দূরত্ব তুমি তিন দিনে অতিক্রম করে এসেছো, সে পথ আমি দেড় দিনে অতিক্রম করে আমার মুমূর্ষু পুত্রের নিকট পৌঁছে যাবো।'

'ভাইয়ার এখন কোন নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও শক্তি নেই মা'– শামসুন্নিছা বললো– 'আপনি তার জন্য দু'আ করুন।'

'আমি দু'আ করবো না'– রোজি খাতুন বললেন– 'অভিশাপও দেবো না।'

আবেগে রোজি খাতুনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তবু থামছেন না। থামতে পারছেন না। বললেন– 'আমি কাউকে বদ দু'আ দেই না। কিন্তু কোন মায়ের 'আহ' মহান আল্লাহ উপেক্ষা করেন না। আমার ছেলে ক্ষমতার লোভে খৃস্টানদের ক্রীড়নক হয়ে হাজার হাজার মুসলমানকে শহীদ করেছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের মা, স্ত্রী ও কন্যাদের সম্মুখে লজ্জিত হতে পারবো না। আমার হৃদয় উজাড়করা মমতা তাদের জন্য নিবেদিত। খুনী পুত্রের প্রতি আমার একবিন্দু মমতা নেই।'

'ভাইয়া নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছেন মা।' শামসুন্নিছা কান্না বিজড়িত কণ্ঠে চীৎকার করে বললো।

'এও এক প্রতারণা মনে হচ্ছে'– রোজি খাতুন বললেন– 'আমি জানি, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী হাল্‌ব দখল করে নেয়ার পর সে তোমাকে এজাজ দুর্গ ভিক্ষা চাওয়ার জন্য আইউবীর নিকট পাঠিয়েছিলো। মহান সুলতান তোমাকে নিজের কন্যা মনে করে তোমাদেরকে দুর্গটা দান করেছেন। সে আগেই নিজে সুলতানের দরবারে আসলো না কেন? পরাজিত হওয়ার পর তো তাকে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। নিজে এসে তরবারীটা আইউবীর পায়ে রাখা দরকার ছিলো। আইউবী তার শত্রু ছিলেন না। সে তো তাঁকে মামা ডাকতো। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, গাদ্দারদের ঈমানদারদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সাহস হয় না। যারা নিজেদের ঈমান নীলাম করে দেয়, তারা কাপুরুষ ও প্রতারক

হয়ে থাকে। আমার পুত্র মালিকুস সালিহ গাদ্দার, কাপুরুষ, প্রতারক।'

'এতো পাষাণ হয়ো না মা।' শামসুন্নিছা মিনতির সুরে বললো।

'এই গৃহযুদ্ধে যতো মুসলমান শহীদ হয়েছে, তাদের মায়েরা অন্তরে পাথর বেঁধে রেখেছে'– রোজি খাতুন বললেন– 'তারা বলতে লজ্জাবোধ করছে, তারা যে সন্তানদেরকে ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রেরণ করেছিলো, তারা আপসে যুদ্ধ করে মারা গেছে। সেই মায়েদের দায়িত্ব কে বহন করবে? আমার ছেলে!'

'তখন তো তিনি অনেক ছোট ছিলেন মা।'

'তাহলে আমার কাছেই থাকতো'– রোজি খাতুন বললেন– 'আমি যা বলি শুনতো। যখনই তার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছিলো, আমার নিকট ফিরে আসতো। হাল্‌বকে সুলতান আইউবীর হাতে অর্পণ করে দিতো। তাতো সে করেনি।... তুমি চলে যাও। ইসলামের মায়েরা যদি মমতার জালে আটকা পড়ে যায়, তাহলে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মতো কেউ থাকবে না। আমি মমতাকে গলাটিপে মেরে ফেলেছি। আমার দেহ শহীদ হয়ে গেছে।'

'মায়েরা কি গর্ভজাত কন্যাদেরকে এভাবে বিদায় করে দেয়! বলো মা, বলো!' শামসুন্নিছা বললো।

'তুমি আমার কাছে থাকো'– রোজি খাতুন মেয়েকে বললেন– 'তবে শর্ত থাকবে, আমার সামনে কখনো ভাইয়ের নাম উচ্চারণ করবে না।'

'এটা সম্ভব নয় মা! এটা সম্ভব নয়'– শামসুন্নিছা বললো– 'যে ভাইটি তার বোনকে অপত্য স্নেহে লালন-পালন করে বড় করেছে, সে তার নাম মুখে নেবে না কেন মা!'

'তাহলে সেই ভাইয়ের কাছেই চলে যাও'– রোজি খাতুন বললেন– 'তুমি খৃস্টানদের ছায়ায় বড় হয়েছো। এখানকার মেয়েদের দেখো, তারা ইসলামের জন্য জান কুরবান করতে প্রস্তুত। আমি যখন তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করি, তাদের রাগ-ধমক দেই, তখন ভয় লাগে কেউ বলে বসে কিনা, নিজের মেয়ের খবর নেই, আমাদেরকে ধমকায়। তুমি কি এই নোংরা বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবে যে, আমার ছেলে খৃস্টানদের সঙ্গে মদপান করে এবং তার হেরেমে খৃস্টান ও ইহুদী মেয়েরা আছে?'

শামসুন্নিছা মস্তক অবনত করে ফেলে। অভিযোগটা সে অস্বীকার করতে পারলো না।

'যাও, হাত-মুখ ধুয়ে মায়ের ঘরে কিছু খেয়ে চলে যাও'– রোজি খাতুন

বললেন– 'ফিরে গিয়ে যদি আমার ছেলেটাকে জীবিত পাও, তাহলে বলবে, মা তোমার দুধের দাবি ক্ষমা করে দিয়েছেন; কিন্তু শহীদের রক্তের দাবি ক্ষমা করেননি। তাকে বলবে, তোমার বুকে যদি খৃস্টানদের তীর বিদ্ধ হতো আর তুমি সালতানাতে ইসলামিয়ার পতাকাতলে জীবন কুরবান করে দিতে, তাহলে তোমার মা উড়ে এসে পৌঁছে যেতেন এবং তোমার মৃতদেহ বুকে করে দামেশ্‌ক নিয়ে যেতেন এবং গর্বভরে বলতেন, এই আমার শহীদ পুত্রের মাজার। এখন আমি কী বলবো? মায়ের গর্ব তো পুত্র কেরে নিয়ে গেছে।'

শামসুন্নিছা অনেকক্ষণ যাবত নীরব দাঁড়িয়ে থাকে। তার মাথাটা অবনত। পরক্ষণে যখন সে মাথা উঠায়, ততোক্ষণে উভয় গণ্ডদেশে ধূলির যে স্তর জমাট হয়েছিলো, তার মধ্যদিয়ে অশ্রুর নদীর ন্যায় রাস্তা হয়ে গেছে। হঠাৎ মেয়েটি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে হাঁটু গেড়ে বসে মায়ের আঁচল ধরে চুমো খেয়ে চোখের সঙ্গে লাগায়। সচেতন মেয়ে শামসুন্নিছা মাকে বুকে জড়িয়ে ধরেনি। কারণ, মায়ের নিষেধ আছে, খৃস্টানদের ছায়ায় লালিত মেয়ে যেনো তার কাছে না ঘেঁষে। শামসুন্নিছা খৃস্টানদের ছায়ায় লালিত মেয়েই বটে। এই মহাসত্য শামসুন্নিছা অস্বীকার করতে পারে না। শামসুন্নিছা উঠে দাঁড়িয়ে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললো– 'তিনি আমার ভাই, আমার শৈশবের সঙ্গী। তিনি বোধ হয় বাঁচবেন না। আমি তার কাফন-দাফনের পর আপনার কাছে ফিরে আসবো মা।'

'কী জন্য?' রোজি খাতুন নিরতিশয় কঠিন ও তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন।

'আমি এমন একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেবো, যে আল্লাহর পথে শহীদ হবে'– শামসুন্নিছা বললো– 'আপনার পুত্রের বিনিময়ে আমি এমন একটি পুত্রের জন্ম দেবো, যার কবরের উপর স্বস্নেহে হাত বুলিয়ে আপনি গর্বের সাথে বলবেন, এটি আমার নাতির মাজার।... আমি ফিরে আসবো মা। আমি ফিরে আসবো। আপনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে রাখুন। আমি চোখ বন্ধ করে এসেছিলাম। এখন চোখ খুলে ফিরে যাচ্ছি। আমাকে অনুমতি দিন, আমি নিজ হাতে ভাইয়ার কাফন পরাতে পারি।... বিদায় মা, বিদায়।'

শামসুন্নিছা পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে স্বভয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিলো। এখন বের হয়ে গেলো বুক ফুলিয়ে, ঘাড় উঁচু করে লম্বা পদক্ষেপে।

রোজি খাতুন মেয়ের প্রতি তাকিয়ে থাকেন। তিনি উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যান। তাঁর মুখ থেকে চীৎকার বেরিয়ে এলো– 'মেয়েটি আমার।' তিনি দরজাটা সামান্য ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকান। বাইরে থেকে

শামসুন্নিছার কণ্ঠ ভেসে আসে। মেয়েটি গর্জন করে বলছে– 'ইবনে আজর! সকল আরোহীকে ডাকো। জলদি করো। হাল্‌ব অভিমুখে রওনা হও। তাড়াতাড়ি করো।'

মা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছেন। মেয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে অশ্বারোহী কাফেলার সকলের সম্মুখে চলে যাচ্ছে। কাফেলার গতি তার আদেশে উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে।

রোজি খাতুন দরজা বন্ধ করে দেন। চোখ তার অশ্রু-আবিল। খাদেমা ভেতরে প্রবেশ করলে তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন– 'আহা, মেয়েটা না খেয়েই চলে গেলো।'

মা-মেয়ের এই সাক্ষাতের ঘটনা ১১৮১ সালের নবেম্বর মাসের। সুলতান আইউবীর ইবনে লাউনকে পরাজিত করে তারই বাহিনীর সৈন্যদের দ্বারা তার দুর্গকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এর দু'বছর আগের ঘটনা। দুর্গের ধ্বংসাবশেষগুলো নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো। তার পরপরই সুলতান আইউবী খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনকে পরাজিত করেছিলেন। কৃতিত্বটা ছিলো মূলত একজন মুসলিম গোয়েন্দার। তারই সময়োচিত রিপোর্টের ভিত্তিতে সুলতান আইউবী এই সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

এটি বল্ডউইনের দ্বিতীয় পরাজয়। এর আগে তিনি সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিলের হাতে এমনিভাবে পরাস্ত হয়েছিলেন। এবার আইউবী তার কোমর ভেঙ্গে দিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন। এখন আর তার উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকু অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু ওখানে তিনি খৃস্টান সম্রাট একা তো নন। ইসলামী দুনিয়ায় একাধিক খৃস্টান বাহিনীর উপস্থিতি বিদ্যমান। তারা অন্তরের দিক থেকে একে অপরের প্রতিপক্ষ। কিন্তু সকলের শত্রু অভিন্ন। এ কারণে তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতেন। সকলেরই কামনা, কীভাবে একাকী অধিকতর অঞ্চলে দখল প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এ লক্ষ্যেই বল্ডউইন একাকী আল-আদিল ও সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তার সৈন্য ও উপকরণের অভাব নেই। অস্ত্রও আছে বিস্তর। আছে বিপুলসংখ্যক শক্তিশালী উট-ঘোড়া। কিন্তু তারপরও হেরে গেলেন।

বিক্ষিপ্ত সৈনিকদেরকে একত্রিত করতে কিছু সময় লেগে যায় বল্ডউইনের। ইতিমধ্যে সংবাদ পান, সুলতান আইউবী ইবনে লাউনকে

পরাজিত করে তার রাজত্ব ও সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিয়েছেন। ইবনে লাউন আর্মেনীয় নাগরিক। আর্মেনীয়রা খৃস্টানদের মিত্র। তাদের পরাজয় খৃস্টানদের হৃদয়ে বেশ আঘাত হানে। সেই সঙ্গে বল্ডউইন আরো সংবাদ পান, ইবনে লাউনের রাজ্য তালখালেদ ও তার দুর্গ কারাহেসার আক্রমণে সুলতান আইউবীর ফৌজের সঙ্গে আল-মালিকুস সালিহ'র বাহিনীও ছিলো। এটি বল্ডউইনের জন্য একটি অতিরিক্ত দুঃসংবাদ। বল্ডউইন অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি এবং অন্যান্য খৃস্টান সম্রাটগণ অবশ্য জানেন, সুলতান আইউবী আল-মালিকুস সালিহকে পরাজিত করে তাকে নিজের অধীন করে নিয়েছেন। কিন্তু আল-মালিকুস সালিহ চুক্তি অনুযায়ী কাজ করবেন, তা তাদের ভাবনায় ছিলো না। না করাটা আস-সালিহ'র চরিত্র। তাদের ধারণা ছিলো, লোকটা উপরে উপরে সুলতান আইউবীর অনুগত হয়ে গেলেও খৃস্টানদের সঙ্গে বাঁধা গাঁটছড়া অটুট থাকবে। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

বল্ডউইন জেরুজালেমে খৃস্টান সম্রাটদের হেডকোয়ার্টারে ফিরে যান। খৃস্টানদের আরেকটি হেডকোয়ার্টার আছে আক্রায়।

'আপনারা কি জানেন, মুসলমানরা আবারও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে?' বল্ডউইন কমফারেন্সে খৃস্টান সম্রাট ও সেনানায়কদের উদ্দেশে বললেন– 'আল-মালিকুস সালিহকে আপনারা আপনাদের জোটভুক্ত মিত্র মনে করছেন আর তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে তার বাহিনী প্রদান করেছেন।'

'ইবনে লাউনের পরাজয় আমাদেরই পরাজয়'– ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– 'আপনারা যদি ওৎ পেতে বসে থাকার পরিবর্তে ইবনে লাউনের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন এবং পেছন থেকে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করতেন, তাহলে পরাজয় আইউবীরই হতো।'

'দেখুন, সালাহুদ্দীন আইউবীর অগ্রযাত্রার গতি পরিবর্তন করে তালখালেদ অভিমুখে মুখ করার সংবাদ যেমন আপনারা কেউ জানতেন না, তেমনি আমিও জানতে পারিনি।'

'এটা আপনার গোয়েন্দা ব্যবস্থার দুর্বলতা'– গাই অফ লুজিনান বললেন– 'আমরা অনেক দূরে ছিলাম। খোঁজ-খবর নেয়া এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থা সম্পন্ন করার দায়িত্ব আপনার ছিলো। আপনি নিকটে ছিলেন। আইউবীর বাহিনী আপনার সন্নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছে। কিন্তু আপনি টেরও পেলেন না। আপনি ওঁৎ পেতে চুপটি মেরে বসে রইলেন।'

'আমি জানতাম না, আমার সঙ্গে একজন মুসলমান আছে'– বল্ডউইন বললেন– 'আমি তাকে গুরুত্বহীন লোক মনে করতাম। সে আমার কয়েদী ছিলো। পরে পালিয়ে গিয়ে সুলতান আইউবীকে আমার তথ্য প্রদান করে। সে যা হোক এখন আমাদের ভাবনার বিষয়, আইউবী– আস-সালিহ'র ঐক্য কীভাবে ভেঙ্গে দেয়া যায়।'

'আপনি কি মুসলমানদের দুর্বলতাগুলো ভুলে গেছেন নাকি উপেক্ষা করছেন?'– এক খৃস্টান সম্রাট বললেন– 'আমরা যখন আস-সালিহ'র উপদেষ্টা, আমীর এবং সালারদেরকে উপঢৌকন ও বিলাস উপকরণ দিয়ে আমাদের হাতে এনেছিলাম, আস-সালিহ তখন কিশোর ছিলো। এখন যুবক হয়েছে। এখন তাকে হাতে আনা অধিকতর সহজ। আমরা আমাদের অস্ত্র ব্যবহার করি এবং বিশেষ উপহারটা দূত মারফত পাঠিয়ে দিই। আপনি যদি সামরিক শক্তির মাধ্যমে তাকে অনুগত বানাতে মনস্থ করে থাকেন, তাহলে এই ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। সুলতান আইউবীর বাহিনী এই অঞ্চলে উপস্থিত আছে। আপনারা যদি হাল্‌ব আক্রমণ করেন, তাহলে সুলতান আইউবী তার সমগ্র বাহিনীর কমান্ড নিজ হাতে তুলে নেবেন। তিনি যদি আমাদের উপর জয়ী নাও হতে পারেন, তবু আমাদের এই ক্ষতিটা অবশ্যই হবে যে, আস-সালিহ আমাদের হাত থেকে আজীবনের জন্য বেরিয়ে যাবে। ফিলিস্তীন আমাদেরকে রক্ষা করতেই হবে। আমরা আমাদের বাহিনীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং লক্ষ্য রাখছি, সালাহুদ্দীন আইউবী কোন্‌দিকে মুখ করেন এবং তার পরিকল্পনা কী। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না। আপনি নিজের মতো করে আস-সালিহকে হাত করে নিন।'

১১৮০ সালে মসুলের গবর্নর সাইফুদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলে ইয্‌যুদ্দীন মাসউদ শাসন ক্ষমতা হাতে নেন। একই বছর সুলতান আইউবীর ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহ ইস্কান্দারিয়ায় মারা যান। সুলতান মিসরে চলে যান। সেখানকার পরিস্থিতি খারাপ হতে চলেছে। তিনি নিজ বাহিনীকে স্বীয় ভাই আল-আদিলের কমান্ডে পেছনে রেখে যান।

এখন ১১৮১ সাল। বল্ডউইন তার বাহিনীর সেনা সংখ্যা পূরণ করে নিয়েছেন। তাদের প্রশিক্ষণও সম্পন্ন করেছেন। তিনি নিজ বাহিনীকে সুলতান আইউবীর কৌশল মোতাবেক সামরিক মহড়াও করিয়ে নিয়েছেন।

এখন তিনি পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তার আগে তাকে আল-মালিকুস সালিহকে হাতে নেয়া আবশ্যক।

আল-মালিকুস সালিহ এখন কিশোর নয়– পরিণত যুবক। রাষ্ট্র পরিচালনা বুঝতে শুরু করেছেন। তার উপদেষ্টা ও সালারগণ হচ্ছেন তার দুর্বলতা, যারা তলে তলে খৃস্টানদের সহযোগী-সমর্থক। সুলতান আইউবীর সঙ্গে তিনি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন বটে; কিন্তু রাজত্বের পোকা এখনো মাথা থেকে বের হয়নি। এখনো তিনি স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

একদিন তার নিকট সংবাদ আসে, খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনের দূত এসেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভেতরে নিয়ে আসার অনুমতি প্রদান করেন। এই দূত নাশকতার ওস্তাদ এবং মানবীয় দুর্বলতা বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। সে আল-মালিকুস সালিহকে জানায়, আপনার জন্য কিছু উপহারও নিয়ে এসেছি।

কী উপহার? মহা মূল্যবান হীরা-জহরত ও স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি বাক্স। দু'টি তরবারী। পঁচিশটি উন্নত জাতের ঘোড়া। আর? আর একটি মেয়ে।

আস-সালিহ বাইরে গিয়ে ঘোড়াগুলো দেখেন। হীরা-জহরত-স্বর্ণমুদ্রাগুলোও দেখেন। কিন্তু যে উপহারটির উপর তার চোখ আটকে যায়, সেটি হলো মেয়ে।

আস-সালিহ অনেকক্ষণ যাবত মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে থাকেন। তার উঠতি যৌবনের সবগুলো দুর্বলতা একটি যাদুর রূপ ধারণ করে বিবেকের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন, তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছেন এবং তিনি টগবগে এক যুবক।

দূত আস-সালিহ'র হাতে বল্ডউইনের একটি বার্তা প্রদান করে। পত্রখানা আরবীতে লেখা। কিন্তু খৃস্টান সম্রাটের পত্রের প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। মেয়েটি তার কল্পনার চেয়েও বেশি রূপসী।

দূত পত্রখানা খুলে অন্য চিন্তায় বিভোর আস-সালিহ'র সম্মুখে রেখে দেয়। এবার তার চৈতন্য ফিরে আসে। তিনি পত্রখানা পাঠ করেন। বল্ডউইন লিখেছেন–

'প্রিয় হাল্‌বের গবর্নর আল-মালিকুস সালিহ! আমি দূত ও উপহারের পরিবর্তে বাহিনী প্রেরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমি আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ প্রয়োজন অনুভব করি না। আপনি আমার বন্ধু ও সন্তানতুল্য। আপনি যখন কিশোর ছিলেন এবং সালাহুদ্দীন আইউবী আপনার

সালতানাতের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম। আমি আক্ষেপে ফেটে যাচ্ছি, গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীন আপনাকে বন্ধুত্বের ধোঁকায় রেখেছে। আমরাও তাদের প্রতারণা ধরতে পারিনি। আপনি যদি একা হতেন, তাহলে আপনার বাহিনী পরাজিত হতো না। আপনি দেখেছেন, গোমস্তগীন কত বড় ধোঁকাবাজ ছিলো, যার ফলে আপনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। সাইফুদ্দীনও আপনাকে বরাবরই ধোঁকার মধ্যে রেখেছে। সে হাল্‌বের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলো। আমরা তাকে তার প্রত্যয়-পরিকল্পনা থেকে বিরত রেখেছি।...

অবশেষে আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট পরাজয়বরণ করেছেন, যা আপনাকে তার আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য করেছে। আপনি এতোই অসহায় হয়ে পড়লেন যে, আপনি ইবনে লাউনের উপর আক্রমণ করার জন্য তাকে সৈন্য দিতে বাধ্য হলেন। আমি ভালো করেই জানি, আপনার ন্যায় একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যোদ্ধা এই অপমান সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু আপনি তো সঙ্গীহীন ছিলেন। আমি নিজেও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। অন্যথায় আমি আপনার সাহায্যে ধেয়ে আসতাম। এখন আমি আপনাকে নিয়ে ভাববার সুযোগ পেয়েছি। আপনার ভুলে গেলে চলবে না, সালাহুদ্দীন আইউবী আপনাকে এমন এক স্বায়ত্তশাসন দান করেছেন, যার অর্থ দাসত্ব। তিনি আপনাকে ধীরে ধীরে গোলামে পরিণত করছেন। তিনি ইযযুদ্দীনের সাহায্যার্থে আর্মেনীয়দের পরাজিত করেছেন এবং তাকে নিজের অনুকম্পার শিকলে বেঁধে ফেলেছেন। সমস্ত ছোট ছোট আমীর তার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। এখন তার দৃষ্টি আপনি ছাড়াও মসুল ও হাররানের উপর নিবদ্ধ।...

ভেবে দেখুন, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মিসর থেকে সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তালখালেদের উপর গিয়ে আক্রমণ করলেন এবং আপনার থেকেও সৈন্য নিলেন। এখন আবার মিসর ফিরে গেছেন। তার এই যাওয়ার রহস্য কী? গোয়েন্দারা আমাদেরকে অবহিত করেছে, তিনি বিপুল পরিমাণ ধন-ভাণ্ডার নিয়ে গেছেন। সেগুলো কায়রোতে রেখে আবার ফিরে আসবেন। বলুন তো, আপনাকে তিনি কী দিয়েছেন? আপনার বাহিনীকে তিনি গনীমতের সম্পদের কতো অংশ দিয়েছেন? তিনি জেরুজালেম অভিমুখে কেন অগ্রযাত্রা করলেন না? আপনি কি জানেন, তিনি আর্মেনীয়দের কয়েকটি মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন?...

আমি জানি, এসব প্রশ্ন আপনার মস্তিষ্ককে আউলা-ঝাউলা করে দেবে। আপনার নিকট সালাহুদ্দীন আইউবীর চরিত্র এবং তার নিয়তের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা এই ভূখণ্ডে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি। আমরা এও জানি, সুলতান আইউবী আমাদেরকে এখান থেকে উৎখাত করে ইউরোপের উপর আক্রমণ করার এবং নিজের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানোর ভাবনা ভাবছেন। তিনি আপনাকে এবং অন্যান্য আমীরদেরকে নিজের থলের মুদ্রা জ্ঞান করেন। আপনি যদি নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করেন, তাহলে আপনার নাম-চিহ্ন মুছে যাবে। এখানে আমরা ইউরোপের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছি। আমার বক্তব্য যদি আপনার বুঝে এসে থাকে, তাহলে আমাকে উত্তর দিন। আমি আপনাকে উপদেষ্টা পাঠিয়ে দেবো, যে আপনার আর্থিক ও সামরিক প্রয়োজনের পরিসংখ্যান নিয়ে আমাকে অবহিত করবে। আমি যে ঘোড়াগুলো প্রেরণ করেছি, এগুলো আপনার জন্য উপহার। আপনার ফৌজের জন্য আমি এমন হাজার হাজার ঘোড়া দিতে পারি। ইউরোপ থেকে আমি নতুন অস্ত্র চেয়ে পাঠিয়েছি। তাও আপনাকে দিয়ে দেবো। আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করবেন না। উপরে উপরে তার অনুগত থেকেই আপনি নিজের প্রতিরক্ষা শক্ত করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি।'

ইহুদীদের চিত্তহারী রূপসী এই মেয়েটি শুরুতেই আল-মালিকুস সালিহ'র তরুণ মস্তিষ্কটা কব্জা করে ফেলে। বার্তার প্রতিটি শব্দ যাদুর ন্যায় তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। তিনি দূতের বিশ্রাম ও খাওয়ার এমন আয়োজনের নির্দেশ প্রদান করেন, যেনো বল্ডউইন নিজেই এসে হাজির হয়েছেন। তারপর তিনি নিজেকে মেয়েটির হাতে সপে দেন। আল-মালিকুস সালিহ এর চেয়েও অধিক রূপসী মেয়ে দেখেছেন। কিন্তু এই মেয়েটি অপূর্ব ভাবভঙ্গি আর মুচকি হাসি তার রূপে অবিশ্বাস্য এক যাদুকরি ক্রিয়া সৃষ্টি করে রেখেছে।

আস-সালিহ অন্ধ হয়ে যান।

রাতে যখন মেয়েটি আল-মালিকুস সালিহ'র শয়নকক্ষে প্রবেশ করে, তখন তার হাতে পিপা ও পেয়ালা। এগুলোও তার সঙ্গে উপহার হিসেবে আসা। মেয়েটি তাকে বললো, এগুলো ফ্রান্সের মদ, যা কিনা শুধু সম্রাটদের জন্যই প্রস্তুত হয়ে থাকে।

'আপনার হেরেমে কিছুই তো নেই'– মেয়েটি বললো– 'আপনি কি প্রয়োজন মনে করেন না আপনার হেরেমটা সজ্জিত হোক?'

'আমার হেরেমের জন্য তুমি একাই যথেষ্ঠ।' আস-সালিহ্ বললেন।

'আমি আমার ন্যায় আরো মেয়েদের দ্বারা হেরেম ভরে দেবো'– মেয়েটি মদের পেয়ালাটা আস-সালিহ'র হাতে দিতে দিতে বললো– 'এটা কি সত্য, সালাহুদ্দীন আইউবীর একজনই স্ত্রী এবং তিনি কাউকে হেরেমে নারী রাখার অনুমতি দেন না?'

'হ্যাঁ'– আস-সালিহ্ জবাব দেন– 'এটাও ঠিক, তিনি মদপানের অনুমতি দেন না।'

'আপনি তাহলে জানেন না তার একটি গোপন হেরেম আছে, যাতে অসাধারণ সুন্দরী মেয়েরা আছে। তাদের মধ্যে মুসলমান আছে, ইহুদী-খৃষ্টানও আছে।' মেয়েটি বললো।

ঝাড়বাতির রঙিন ও হাল্কা মিষ্টি আলো আর ফ্রান্সের মদের নেশার মধ্যে এই মেয়েটি আপাদমস্তক যাদুর রূপ ধারণ করে আস-সালিহ্কে প্রভাবিত করে চলেছে। ক্ষণিকের মধ্যেই তিনি মেয়েটির রেশমী চুলের শিকলে বন্দী হয়ে যান।

রাত পোহাবার পর চোখ মেলে আল-মালিকুস সালিহ মেয়েটিকে বললেন– 'এখানে আমার এক বোন আছে। তুমি তার মুখোমুখি হবে না। বিবাহ ছাড়া কোন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া সে পছন্দ করে না। তোমার-আমার এই সম্পর্ক সে মেনে নেবে না। সুযোগ মতো আমি তাকে বলে দেবো, তুমি মুসলমান এবং আমার সঙ্গে বিয়ে বসতে এসেছো।'

'বোনকে মুক্ত করে দেন না কেন?'– মেয়েটি বললো– 'তাকে পুরুষদের সঙ্গে উঠা-বসা করতে দিন। সে রাজকন্যা। আপনি রাজা। সালাহুদ্দীন আইউবী আপনার পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন করছেন। আমরা আপনার বোনকে আলাদা একটা রাজ্য দিয়ে রাণী বানিয়ে দেবো।'

আল-মালিকুস সালিহ স্বপ্নের রাজা হয়ে যান।

'কী সংবাদ এনেছো?' বল্ডউইন মদমাতাল কণ্ঠে দূতকে জিজ্ঞেস করেন।

'আমি কখনো ব্যর্থ হয়ে ফিরেছি নাকি?' দূত জবাব দেয়। সে আল-মালিকুস সালিহ'র প্রাসাদে চার দিনের দীর্ঘ সফর শেষে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে। সে বললো– 'মুসলমানদের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করে আপনারা অযথা জীবন ও সম্পদহানি করছেন। একটি মেয়েই তো মুসলমানদের শাসকদের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে আনতে যথেষ্ঠ।'

'মেয়ে নয়'– বল্ডউইন বললেন– 'মুসলমানকে যদি তুমি একটি মেয়ের শুধু কল্পনা দাও, তাতেই সে নিজের নেক-বদ ভুলে গিয়ে সেই কল্পনার গোলাম হয়ে যায়। এবার বলো, তুমি কী করে এসেছো?'

'তিনি লিখিত উত্তর দেননি'– দূত বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা ও কমান্ডো সেনারা সর্বত্র গিজ গিজ করছে। লিখিত উত্তর দিলে পাছে ধরা পড়ে যায় কিনা। তিনি আপনার সব বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক নন। তবে সন্ত্রস্ত এবং আইউবীর মোকাবেলায় নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করছেন। আপনার বার্তা তাকে অনেক সাহস যুগিয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনি আপনার উপদেষ্টা পাঠিয়ে দিন, তবে তাকে যেতে হবে বণিকের বেশে। ওখানকার সকলকে বলবে, সে উচ্চ পর্যায়ে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা করতে এসেছে।'

'তার মনে কোন সন্দেহ নেই তো?' বল্ডউইন দূতকে জিজ্ঞেস করেন।

'আপনি তাকে ইহুদীদের যে উপহারটা প্রদান করেছেন, সে সন্দেহ করার কোন অবকাশ থাকতে দেয়নি'– দূত জবাব দেয়– 'আমি সেখানে চারদিন অবস্থান করেছি। এ সময়টায় আমি তার সালারদের ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, কথাবার্তা বলেছি ও মতবিনিময় করেছি। তাদের অনেকে আইউবীর সমর্থক। আমি তাদের দু'জনকে হাত করে নিয়েছি। তাদেরকে আমি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং লুকিয়ে লুকিয়ে উপহারও দিয়েছি। ওখানে সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দাও আছে। সে কারণে কোন কথাই গোপন রাখা সম্ভব হয় না। তথাপি আল-মালিকুস সালিহকে আপনারই লোক মনে করুন। যে দু'জন সালারকে হাত করে এসেছি, মেয়েটির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। সে তার দায়িত্ব পালন করবে। আপনি তাড়াতাড়ি উপদেষ্টা পাঠিয়ে দিন।'

এই দূত শুধু দূতই নয়; মানুষের মনস্তত্ব নিয়ে খেলা করার দক্ষ ওস্তাদ। সে বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবী তার অফিসার-কর্মকর্তা ও দেশের জনগণকে উপদেশ দিয়ে থাকেন, রাজত্বের স্বপ্ন-মোহ, সম্পদ ও নারী এই তিনটি বিষয় মানুষের ঈমানকে নিঃশেষ করে দেয়। এই তিনটি বস্তু যখন একজন বিজ্ঞ আলেমেরও সম্মুখে এসে হাজির হয়, তারও ঈমানের পা উপড়ে যায়। এটা মানবীয় দুর্বলতা। তখন তাকে ওয়াজ শুনিয়েও কোন লাভ হয় না।'

বল্ডউইন তখনই তিনজন উপদেষ্টা ঠিক করে ফেলেন। তারা রওনা হয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

ব্যবসার পণ্য বোঝাই অনেকগুলো উটের একটি কাফেলা হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহ'র প্রাসাদের সামান্য দূরে এসে দাঁড়িয়ে যায়। কাফেলায় জনাকতক লোক। তন্মধ্যে তিনজন এ্যারাবিয়ান পোশাক পরিহিত। উটগুলোকে দাঁড় করিয়ে রেখে এই তিনজন প্রাসাদের দিকে হাঁটা দেয়। দারোয়ান তাদের থামিয়ে দেয়। তারা নিজেদের ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে আলোচনার জন্য আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে বলে জানায়। বললো, আমরা হীরা এবং অন্য আরো মহা-মূল্যবান কিছু পণ্য নিয়ে এসেছি, যেগুলো রাজা-বাদশাগণ ক্রয় করে থাকেন। তাছাড়া আমরা আপনাদের রাজার সাথে হাল্‌বের সঙ্গে ব্যবসা করার ব্যাপারেও আলোচনা করবো। রক্ষী কমান্ডার ইবনে খতীব তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে। আলাপ জমিয়ে তাদেরকে মুক্তমনে কথা বলার সুযোগ করে দেয়। সে লোকগুলোর চোখের সবুজ ও নীলাভ বর্ণ এবং মুখশ্রীটা গভীরভাবে পরখ করে দেখে। তার জানা আছে, ব্যবসা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা কখনো সরাসরি রাজার সঙ্গে হয় না।

ইবনে খতীব লোকগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

'আপনাদের আসল উদ্দেশ্যটা বলুন।' ইবনে খতীব বললো।

'বলেছি তো আমরা ব্যবসায়ী। পণ্য বিক্রি করতে এবং আপনাদের রাজার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি।' লোকগুলো বললো।

'জেরুজালেম থেকে এসেছেন, নাকি আক্রা থেকে?' ইবনে খতীব জিজ্ঞেস করে।

'আমরা ব্যবসায়ী'– একজন উত্তর দেয়– 'আমরা সব দেশেই যাই। জেরুজালেম-আক্রায়ও যাই। আপনার সন্দেহটা কী?'

'না, আমার কোন সন্দেহ নেই'– ইবনে খতীব বললো– 'আমি নিশ্চিত, আমি আপনাদের তিনজনকেই চিনি। তবে আপনারা আমাকে চেনেন না। আমি আপনাদেরই লোক। আমার নাম ইবনে খতীব। এটা আমার আসল নাম নয়। হারমান আমাকে ভালো করেই জানেন।'

ইবনে খতীব কিছু সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করে, যেগুলো খৃস্টানদের গুপ্তচররা পরস্পর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে। ব্যবসায়ীগণ– যারা মূলত বল্ডউইনের প্রেরিতে উপদেষ্টা– মুচকি হাসে। তাদের বলে দেয় হয়েছিলো, আল-মালিকুস সালিহ'র দরবারে খৃস্টান

গোয়েন্দা আছে। ইবনে খতীব নিশ্চিত করে দেয়, সে তাদেরই গুপ্তচর।

'আপনারা কি সেই উদ্দেশ্যেই এসেছেন?'- ইবনে খতীব জিজ্ঞেস করে- 'আমাকে বলতে সমস্যা নেই। অন্যথায় আপনাদের ভেতরে যেতে দেয়া হবে না।'

'হ্যাঁ'- একজন অস্ফুট স্বরে বললো- 'সে উদ্দেশ্যেই। আচ্ছা, এই প্রাসাদে সালাহুদ্দীন আইউবীর চর আছে কি?'

'আছে'- ইবনে খতীব উত্তর দেয়- 'তবে তাদের উপর আমরা নজর রাখছি। আমরা আপনাদেরকে তাদের থেকে লুকিয়ে রাখবো। কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্য এবং তৎপরতা সম্পর্কে আমাকে পুরোপুরি অবহিত করতে হবে।'

গোপন সাঙ্কেতিক শব্দ এবং বর্ণনাভঙ্গি থেকে আগন্তুক তিন খৃস্টান নিশ্চিত হয়ে যায়, ইবনে খতীব তাদেরই লোক। তারা ইবনে খতীবকে তাদের উদ্দেশ্য খোলাখুলি ব্যক্ত করে। ইবনে খতীব ভেতরে ঢুকে আল-মালিকুস সালিহকে সংবাদ জানায়- 'তিনজন ব্যবসায়ী আপনার সাক্ষাৎ কামনা করছে।'

'তুমি কি রক্ষী বাহিনীর নতুন কমান্ডার?' আল-মালিকুস সালিহ জিজ্ঞেস করেন।

'জ্বি হুজুর।' ইবনে খতীব জবাব দেয়।

'বাড়ি কোথায়?'

ইবনে খতীব একটি গ্রামের নাম বলে। আল-মালিকুস সালিহ বললেন- 'আমি যখন তখন যার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি না। ভবিষ্যতে খেয়াল রাখবে। আচ্ছা, তাদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

ইবনে খতীব বেরিয়ে গিয়ে আগন্তুকদের ভেতরে যেতে বলে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে চোখ টিপে বলে দেয় অনেক সাবধানে কথা বলবেন।

এখন রাত। ঈশার নামাযের পর। ইবনে খতীব জামে মসজিদের ইমামের নিকট উপবিষ্ট। আরো দু'জন লোক আছে।

'এখন আর কোন সন্দেহ থাকলো না যে, আল-মালিকুস সালিহ পুনরায় খৃস্টানদের ফাঁদে চলে আসছেন'- ইবনে খতীব বললো- 'আমি আপনাকে প্রথমে একজন দূতের আগমন এবং উপহারের সংবাদ অবহিত করেছিলাম। সেসব খৃস্টানদের পক্ষ থেকে এসেছিলো। উপহারের মধ্যে একটি অপরূপা সুন্দরী মেয়েও ছিলো। আজ প্রমাণিত হয়ে গেলো, সেই

দূত বল্ডউইনের পক্ষ থেকে এসেছিলো। আজ তিনজন ব্যবসায়ী আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা করতে এসেছে। আপনি জানেন, আমি দুই বছর বায়তুল মুকাদ্দাসে খৃস্টানদের মাঝে অবস্থান করে গুপ্তচরবৃত্তি করেছি। আজ যে তিন ব্যক্তি এসেছে, তাদের চেহারা এবং বর্ণনাভঙ্গি প্রমাণ করছে, তারা যে এ্যারাবিয়ান পোশাক পরিধান করেছে, এটা তাদের ছদ্মবেশ। আমি তাদেরই লোক দাবি করে তাদের আসল রূপ দেখে নিয়েছি। বায়তুল মুকাদ্দাসের চরবৃত্তি আজ আমাকে অনেক উপকার করেছে। আমি তাদের সঙ্কেত জানি, বিশেষ ইঙ্গিতও বুঝি। মুহ্তারাম আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণের সুফল আজ আমি চোখে দেখেছি।'

ইবনে খতীব সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর। অল্প ক'দিন হলো হাল্‌বে এসেছে এবং আল-মালিকুস সালিহ'র এমন একজন নায়েব সালারের মাধ্যমে এখানকার রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছে, যিনি মূলত সুলতান আইউবীর সমর্থক। ইবনে খতীব আলী বিন সুফিয়ানের একজন বিচক্ষণ ও নির্ভীক গোয়েন্দা। বায়তুল মুকাদ্দাসে খৃস্টান সম্রাট ও সেনা অধিনায়কদের হেডকোয়ার্টারে দু'বছর অবস্থান করে সফল গুপ্তচরবৃত্তি করে এসেছে।

হাল্‌বের জামে মসজিদের এই ইমাম সে সকল গোয়েন্দাদের কমান্ডার, সুলতান আইউবী যাদেরকে হাল্‌বে প্রেরণ করে রেখেছেন। যার রিপোর্ট দেয়ার প্রয়োজন হয়, ঈশার নামাযে মসজিদ গিয়ে ইমামকে দিয়ে আসে। ইমাম এই সময়টায় গোয়েন্দাদের রিপোর্ট নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। সেসব রিপোর্টের সত্যতা ও বাস্তবতা যাচাই করে তিনি সুলতান আইউবীর নিকট প্রেরণ করেন। এখন ইবনে খতীব অতিশয় মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে ইমামের সম্মুখে বসা।'

এমন সময় এক মধ্যবয়সী মহিলা এসে হাজির হয়। মহিলা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো বোরকায় ঢাকা। ভেতরে প্রবেশ করেই সে বোরকাটা খুলে ফেলে। বোরকার ভেতরের মানুষটাকে দেখেই সকলে হেসে ওঠে। মহিলা আল-মালিকুস সালিহ'র চাকরানী। আস-সালিহ'র শয়ন কক্ষের দেখাশোনা করা তার দায়িত্ব। তার সকল গোপন তথ্য এই মহিলার পেটে। সেদিনই সে ইমামকে রিপোর্ট করেছিলো, খৃস্টানদের পক্ষ থেকে আল-মালিকুস সালিহ'র নিকট একটি মেয়ে এসেছে, যে কিনা আকার, গঠন, শরীর এবং অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখের ভাষায় আপাদামস্তক একটা যাদু, যার

থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি ইয়া বড় অলি-দরবেশেরও নেই। রূপের এক মূর্ত প্রতীক মেয়েটি। চাকরানী ইমামকে জানিয়ে রেখেছে, আস-সালিহ'র নিয়মতান্ত্রিক হেরেম নেই। কিন্তু নারী ছাড়া তার রাত কাটে না। নারী তার দুর্বলতায় পরিণত হয়েছে।

'... কিন্তু আমার কাছে মেয়েটা ইহুদী মনে হচ্ছে'– চাকরানী বললো– 'আস-সালিহকে সে নিজের গোলাম, বরং কয়েদী বানিয়ে নিয়েছে। লোকটা এমনই পাগল হয়ে গেছে যে, গর্বভরে আমাকে জিজ্ঞেস করে– মেয়েটাকে কি তোমার পছন্দ হয়?' আমি কি ওকে বিয়ে করে নেবো?' আমি একবার বলেছিলাম, আপনার বোনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে কী বলে। কিন্তু তিনি আমাকে শক্তভাবে বলে দেন, খবরদার ওকে কিছু বলবে না।'

আস-সালিহ'র চাকরানীও গোয়েন্দা। সে ইমামকে বিস্তারিত জানায়, আল-মালিকুস সালিহ পুরোপুরি মেয়েটির জালে আটকা পড়ে গেছেন। এখন আর অন্য কোন নারী তার শয়নকক্ষে ঢুকতে পারে না। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো, এখনই সুলতান আইউবীকে রিপোর্ট করবো নাকি দেখবো খৃস্টানরা কী করে কিংবা আস-সালিহকে দিয়ে কী করায়।'

ইমাম বললেন– 'আমার অভিমত হচ্ছে, আস-সালিহ যদি চুক্তি পরিপন্থী কোন আচরণ করে, তবেই সুলতানকে বিস্তারিত জানাবো।'

'সুলতান আইউবী মিসর চলে গেছেন'– অপর একজন বললো। লোকটি বৃদ্ধ এবং মনে হচ্ছে বিচক্ষণ– 'এদিকে আল-আদিল আছেন। সুলতানের সিদ্ধান্ত না নিয়ে তিনি কোন অভিযান পরিচালনা করবেন না। ততোক্ষণে এখানকার পরিস্থিতি এমন রূপ ধারণ করতে পারে, যা হয়তো আমাদের আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাবে। আমাদের এমন কিছু করা দরকার, যার ফলে এই ধারাটি এখানেই শেষ হয়ে যায়।

'আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি'– চাকরানী ইমামকে উদ্দেশ্য করে বললো– 'আস-সালিহ'র মনোযোগ শুধু মেয়েটির প্রতি। মেয়েটি ছাড়া তিনি এখন কিছুই বোঝেন না। ভাল-মন্দ ভাববার শক্তি তার নেই। মেয়েটি দিনের বেলায়ও তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে রাখে। হতভাগা আগেও মদপান করতেন. তবে শুধু রাতে পান করতেন। তাছাড়া এতো বেশি করতেন না। নেশা অবস্থায় বোনের মুখোমুখি হতেন না। বোনের সঙ্গে দিনে সাক্ষাৎ করতেন। এখনকার অবস্থা হলো, এই মেয়েটি আসার পর থেকে এ যাবত ভাই-বোনের সাক্ষাৎ ঘটেনি। বোনের মাঝে পিতার

কৌলিন্য আছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি, রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম এতো বেড়ে গেছে যে সময় পান না।... যা হোক, আমার পরামর্শ হলো, মেয়েটিকে গুম করে ফেলা দরকার। তবেই আস-সালিহ্ দিকদিশা হারিয়ে ফেলবেন।'

প্রস্তাবের উপর দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। ইবনে খতীব বললো, আমি বণিক তিনজনকেও গায়েব করে ফেলতে পারবো। কাজটা সহজ না হলেও অসম্ভব নয়।

১১৮১ সালের নবেম্বর মাস। উটের কাফেলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ কেনাকাটা করছে। তিন খৃস্টান উপদেষ্টা আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ-যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। তারা আস-সালিহ্কে বল্ডউইনের পরিকল্পনা মাফিক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করছে। দিনটা নবেম্বর মাসের ১৬ কি ১৭ তারিখ। ৫৭৭ হিজরীর ৭ কিংবা ৮। রাতে আল-মালিকুস সালিহ্ বিরাট এক ভোজের আয়োজন করেছেন। কারণটা বাহ্যত বুঝা যাচ্ছে না। বিষয়টা জানেন আস-সালিহ'র দু'জন সালার। আস-সালিহ্ খৃস্টান উপদেষ্টাদের সঙ্গে গোপন চুক্তি সম্পন্ন করেছেন। সে উপলক্ষেই এই ভোজের আয়োজন। মেহমান অসংখ্য। তন্মধ্যে বণিকবেশী তিন খৃস্টান উপদেষ্টাও আছে। কাফেলার উষ্ট্রচালকরাও আজকের এই ভোজসভার বিশিষ্ট মেহমান। কিন্তু আসলে তাদের উপস্থিতি উষ্ট্রচালকের বেশে নয়; তারা উষ্ট্রচালকও নয়। তাদের কেউ গোয়েন্দা, অন্যরা খৃস্টান বাহিনীর অফিসার। উষ্ট্রচালক তাদের ছদ্ম পরিচয়। ভোজের আসরে ইহুদী মেয়েটিও আছে। আছে আস-সালিহ'র বোনও। কিন্তু তার দায়িত্ব আয়োজন তদারকি করা।

আজ রাত রক্ষীসেনাদের তৎপরতা কম। মেহমানগণ দলে দলে আসছে। কোন আশঙ্কা বোধ হচ্ছে না। অন্তত আস-সালিহ'র মনে কোন শঙ্কা নেই। মদপানের ধারা চলছে। আস্ত খাসীর রোস্ট তৈরি করা হয়েছে। খোলা মাঠে জাঁকজমকপূর্ণ প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে। রাত যতো গভীর হচ্ছে, আসরের রং ততোটা উজ্জ্বল হচ্ছে। সর্বত্র মেহমানদের পদচারণা বিরাজ করছে।

ইহুদী মেয়েটি ফাং ফাং করে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। মেয়েটি কার সঙ্গে যেনো সাক্ষাৎ করে এদিকে আসছিলো। এমন সময় চাকরানী তাকে দাঁড় করিয়ে একজন সালারের নাম করে বললো, কি এক প্রয়োজনে তিনি আপনাকে

যেতে বলেছেন। মেয়েটি জানে, সালার তাদের লোক। সে সালারের নিকট চলে যায়। কিন্তু আর ফিরে আসেনি। কী হলো, কোথায় গেলো, কেউ বলতে পারছে না। ঘটনাটা আস-সালিহ এখনো জানতে পারেননি।

ইবনে খতীব আজ রাত ডিউটিতে নেই। সুযোগ সৃষ্টি করে সে তিন বণিকের একজনের সঙ্গে কথা বলে বললো– 'আপনারা তিনজন এখান থেকে বেরিয়ে যান। অন্যথায় মারা পড়বেন। বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। সুলতান আইউবীর কমান্ডোরা জেনে ফেলেছে, আপনারা মেহমানের বেশে এখানে আছেন।'

ইবনে খতীব একটি জায়গার নাম বলে বললো– 'আপনারা ওখানে চলে আসুন।'

'আমাদের চলে যাওয়ার সময়ও হয়ে গেছে'– খৃস্টান বললো– 'আমাদের কাজ হয়ে গেছে।'

'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন'– ইবনে খতীব বললো– 'অন্যথায় সকালে এখান থেকে আপনাদের লাশ বের হবে।'

তৎক্ষণাৎ খৃস্টান লোকটি কথাটা তার সঙ্গীদের কানে দেয়। তারা একজন একজন করে প্রাসাদ থেকে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ে, যেনো কারো মনে সন্দেহ না জাগে। প্যান্ডেলের ভেতর থেকে সাবধানে বের হয়েই তারা অন্ধকার পথে ঢুকে পড়ে। ইবনে খতীব তিনটি ঘোড়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। সেও একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। আসরে নাচ-গান চলছে। আমোদে উন্মাতাল অতিথিগণ। হট্টগোল এতো যে, চারটি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ কারো কানেই প্রবেশ করেনি। আস-সালিহ টেরই পাননি যে, তার বিশিষ্ট তিন মেহমান কাল্পনিক বিপদ থেকে পলায়ন করে প্রকৃত বিপদের মধ্যে চলে গেছে।

লোকালয় থেকে দূরে ঝুপড়ির মতো একটি ঘর। তিন খৃস্টান সেই ঘরে বসা। ইবনে খতীব মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে যে, তাদের জীবন রক্ষা পেয়ে গেছে। তারা তাদের উষ্ট্রচালকদের সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ইবনে খতীব তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করে। তাদেরকেও বের করে আনা হলে ইবনে খতীব বললো, আস-সালিহ'র সঙ্গে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমার জানা দরকার। আমাকেও তো সতর্ক থাকতে হবে। তারা বললো, আমরা আস-সালিহকে নেপথ্য থেকে সমর সরঞ্জাম ও ঘোড়া দেবো। তার বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবো। গোয়েন্দা দেবো। আর যখন তিনি সুলতান

আইউবীর উপর আক্রমণ করবেন, তখন আমরা আইউবী বাহিনীর উপর পেছন থেকে আক্রমণ করবো। মোটকথা, আস-সালিহ আইউবীর সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলবেন। কিন্তু যুদ্ধ তখন করবেন, যখন আমরা তাকে সবুজ সঙ্কেত দেবো।

'এখনই কি আমাদের রওনা হওয়া উচিত না?' এক খৃস্টান বললো।

'হ্যাঁ'– ইবনে খতীব বললো– 'আপনাদের রওনা হওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে আসুন।'

ইবনে খতীব কক্ষের দরজা খোলে। এটি অন্য এক দরজা। বললো, 'চলুন।'

তারা দরজা পেরিয়ে একটি কক্ষে ঢুকে পড়ে। কক্ষটা অন্ধকার। কিন্তু ঢোকামাত্র হঠাৎ কি যেনো ঘটে গেলো। তিন খৃস্টানের প্রত্যেককে একজন করে লোক ঝাপটে ধরে এবং পরক্ষণেই প্রত্যেকের হৃদপিণ্ডে খঞ্জর ঢুকে যায়। আগেই কক্ষের এক কোনে একটি গভীর গর্ত খুড়ে রাখা হয়েছিলো। আল-মালিকুস সালিহ'র তিন খৃস্টান উপদেষ্টাকে তাতে পুঁতে রাখা হলো।

সেই কক্ষেরই এক কোণে আল-মালিকুস সালিহ'র উপহার ইহুদী মেয়েটি উপবিষ্ট। অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হাত-পা বাঁধা। মুখে কাপড় গোজানো। তাকেও ভোজসভা থেকে চাকরানীর মাধ্যমে সফলভাবে অপহরণ করা হয়েছে। কক্ষে ইবনে খতীব ছাড়া আরও পাঁচ ব্যক্তি। তারা মেয়েটির হাত-পা খুলে দেয় এবং মুখের কাপড় বের করে ফেলে। মেয়েটি তার সহকর্মী খৃস্টানদের পরিণতি দেখেছে। বললো, আমাকে অপর কক্ষে নিয়ে চলো। তাকে অপর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একটি প্রদীপ জ্বলছে।

'তোমরা কি আমার চেয়ে রূপসী মেয়ে কখনো দেখেছো?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'তুমি কি আমাদের অপেক্ষা বেশি ঈমানদার কোন দিন দেখেছো?'– ইবনে খতীব পাল্টা প্রশ্ন করে– 'আমরা তোমাকে এতোটুকু সুযোগ দেবো না যে, তুমি আস-সালিহ'র ন্যায় আমাদের ঈমানও ক্রয় করে ফেলবে।'

'আমি তোমাদের নিকট জীবন ভিক্ষা চাচ্ছি'– মেয়েটি বললো– 'তোমাদের যদি আমাকে ভালো না-ই লাগে, তাহলে কী পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা তোমাদের দরকার বলো; আমি সকালেই সেসব তোমাদের নিকট এনে হাজির করবো। তারপর আমি এখান থেকে সোজা জেরুজালেম চলে যাবো।'

ইবনে খতীব সঙ্গীদের প্রতি তাকায়। দু'জনের চেহারায় বিস্ময়কর

প্রতিক্রিয়া দেখতে পায়। সে অতি দ্রুততার সাথে খঞ্জর বের করে অস্ত্রটা মেয়েটির বুকে সেঁধিয়ে দেয়। মেয়েটি লুটিয়ে পড়ে গেলে মাথার চুলে ধরে টেনে-হেঁচড়ে অপর কক্ষে নিয়ে গর্তে ছুঁড়ে ফেলে। সকলে মিলে গর্তটা মাটিতে ভরে দেয়।

ইমামকে রাতেই জানানো হলো, কাজ সমাধা হয়ে গেছে।

ওদিকে আস-সালিহ্ তিন উপদেষ্টা ও রক্ষিতা মেয়েটির জন্য অস্থির-বেচাইন হয়ে ওঠেছেন। কী ব্যাপার, ওরা গেলো কোথায়? ওদের দেখছি না কেন?

মধ্য রাতের খানিক পর যখন শেষ মেহমানটিও বিদায় নিয়ে গেলো, তখন আস-সালিহ্ ঘনিষ্ঠদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, ওরা গেলো কোথায়? অনেক খোঁজাখুঁজি করে কোথাও পাওয়া গেলো না। আস-সালিহ্ বিশেষত মেয়েটির জন্য বেশি অস্থির ছিলেন। এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছেন আর চাকরানীকে বকছেন। অবশিষ্ট রাত নিজেও ঘুমালেন না, চাকর-নকরদেরও ঘুমাতে দিলেন না। চাকরানী ইমামকে বলেছিলো, মেয়েটি হাতছাড়া হয়ে গেলে আস-সালিহ্ হুঁশ হারিয়ে ফেলবেন। এখন তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তার মন্তব্য সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আল-মালিকুস সালিহ্ পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

রাত পোহাবার পর আল-মালিকুস সালিহ্'র অবস্থা এখন পাগলের চেয়েও শোচনীয়। তিনি দু'জন ঘনিষ্ঠ সালারকে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তারা ইবনে খতীবকে ডেকে নিয়ে আসে। খতীবকে জিজ্ঞেস করা হয়– 'একটি মেয়ে এবং আরবীয় ব্যবসায়ীদের বের হতে দেখেছো কি?'

'হ্যাঁ দেখেছি'– ইবনে খতীব উত্তর দেয়– 'আমি তো বাহিনীসহ বাইরে প্রস্তুত দণ্ডায়মান ছিলাম। মধ্য রাতের আগে ব্যবসায়ী তিনজন বাইরে আসে। তাদের সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়েও ছিলো। তারা এখান থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেয়েছি। পরে আর তাদেরকে ফিরে আসতে দেখিনি।'

সুলতান আইউবীর সমর্থক সালারও এসে পড়েছেন। তিন খৃস্টান ও মেয়েটির সন্ধান তার জানা আছে। তিনি আস-সালিহকে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করেন। তারা এমন একটি রূপসী মেয়েকে আপনার কাছে রেখে যাওয়া সমীচীন মনে করেনি। আপনাকে ধোঁকা দিয়ে তারা

আপনার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য নিয়ে পালিয়েছে। হয়তোবা আপনিও জানেন না, কী সে মূল্যবান তথ্য।

আস-সালিহ'র উপর নীরবতা ছেয়ে গেছে। বোধ হয় তার চৈতন্য ফিরে এসেছে যে, মেয়েটি তাকে দিনের বেলায়ও মদপান করিয়ে অচেতন করে রাখতো। সে সময় কে জানে সে তার মুখ থেকে কী সব কথা বের করে নিয়েছে। এখন ভাবটা এমন, যেনো আল-মালিকুস সালিহ কৃতকর্মে মর্মাহত। গত রাতে একটুও ঘুমাননি। অনেক দিন যাবত মদপান করে আসছেন। একদিকে তার ক্রিয়া, অন্যদিকে আক্ষেপ-অনুশোচনা। হঠাৎ মুখ খুলে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আদেশ করেন– 'লোকগুলোর সঙ্গে যে কাফেলা এসেছিলো, তাদের প্রত্যেককে বন্দী করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করো, তাদের উট ও অন্যান্য মালপত্র ক্রোক করে নাও।'

সেদিনই সন্ধ্যায় আস-সালিহ'র পেট ব্যথা শুরু হয়। ডাক্তার দেখে ওষুধ দেন। কিন্তু রোগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। রাত নাগাদ পেট ফুলে ওঠে। ৫৭৭ হিজরীর ৯ই রজব অর্থাৎ পরদিন অবস্থা আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করে। ডাক্তার এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকছেন। কিন্তু আস-সালিহ'র অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না। পরবর্তী রাতও একইভাবে অতিবাহিত হয়। দ্বিতীয় দিন তার সংজ্ঞা হারিয়ে যেতে শুরু করে। ডাক্তার তাকে কিছু বুঝেত না দিয়ে সালার প্রমুখদের জানিয়ে দেন, মহারাজের সেরে ওঠার সম্ভাবনা নেই। জামে মসজিদের ইমামকে ডেকে আনা হলো। তিনি শিয়রে বসে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন। রাতে আস-সালিহ চোখ খোলেন। ইমামের প্রতি তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে বললেন– 'কুরআন যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তার বরকতে আমাকে সারিয়ে তুলুন।'

'আমার একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করা আপনার মিশনে পরিণত হয়েছে'– ইমাম বললেন– 'এই সংক্ষিপ্ত জীবনের পুরোটাই আপনি কুরআন ও ইসলামের বিপক্ষে ব্যয় করেছেন। কুরআনের বরকত সেই ব্যক্তির জন্য, যে তার আনুগত্য করে চলে। আপনি আল্লাহর সমীপে পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করুন। তার নিকট থেকে ক্ষমা নেয়ার চেষ্টা করুন।'

আস-সালিহ'র বোন পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আস-সালিহ বলে ওঠেন– 'যাও আমার মাকে ডেকে আনো। তাকে বলো, তোমার পুত্র মৃত্যুবরণ করছে; তুমি এসে তার দুধের দাবি এবং জীবনের পাপ ক্ষমা করে দাও।'

ইমাম শামসুন্নিসার প্রতি তাকান। শামসুন্নিসা ভাইয়ের মাথায় স্বস্নেহে

হাত বুলিয়ে বললো– 'আমি এক্ষুনি দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। আমি মাকে নিয়েই তবে আসবো। সে পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাকো ভাইয়া!'

শামসুন্নিসা দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে যায়। অল্পক্ষণ পরই সে রক্ষীদের সঙ্গে দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন– 'রজবের ১৩ তারিখ আস-সালিহ'র অবস্থা এতোই গুরুতর রূপ ধারণ করে যে, দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে সামান্য চৈতন্য ফিরে এলে আস-সালিহ ইয্‌যুদ্দীনকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। ইয্‌যুদ্দীন সাইফুদ্দীনের মৃত্যুর পর মসুলের গবর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় তিনি মসুল অবস্থান করছিলেন। এখন তাকে হালবেরও গবর্নর নিযুক্ত করা হলো। আস-সালিহ সকল আমীর ও সালারদের ডেকে বললেন, শপথ নাও, তোমরা ইয্‌যুদ্দীনকে গবর্নর হিসেবে বরণ করে নেবে এবং তার অনুগত হয়ে কাজ করবে। সবাই শপথ করে।

৫৭৭ হিজরীর ২৫ রজব আল-মালিকুস সালিহ অচেতন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মসুলে দূত প্রেরণ করে ইয্‌যুদ্দীনকে ডেকে আনা হলো। তাকে অবহিত করা হলো, আপনাকে হাল্‌বের গবর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে।

❖ ❖ ❖

যে সময়ে শামসুন্নিসা দামেশ্‌কে মায়ের পায়ের উপর বসে বলছিলো, আপনার একমাত্র পুত্র মৃত্যুবরণ করছে, আপনার দুধের দাবি মাফ করানোর জন্য তিনি আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন আর মা বলেছিলেন, আমি তার দুধের দাবি ক্ষমা করতে পারি; কিন্তু গুনাহের ক্ষমা আল্লাহর নিকট থেকে নিতে হবে, তখন আস-সালিহ'র জীবনের চির অবসান ঘটে। শামসুন্নিসা হাল্‌বে ফিরে এসে দেখতে পায়, দুর্গ থেকে তার ভাইয়ের জানাযা বের হচ্ছে।

দূত ইয্‌যুদ্দীনকে আস-সালিহ'র মৃত্যুর সংবাদ জানায়। ইয্‌যুদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যান। দ্রুত এসে পৌঁছানোর জন্য তিনি অন্য পথ ধরেন। সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিলের সেনা ছাউনীর পাশ দিয়ে তার অতিক্রম ঘটে। তিনি আল-আদিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আল-আদিল আস-সালিহ'র মৃত্যুর খবর জানতেন না। ইয্‌যুদ্দীন তাকে সংবাদটি জানান। সঙ্গে এও অবহিত করেন যে, তাকে হাল্‌বের গবর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে। আল-আদিল বললেন– 'তবে তো তুমি ইচ্ছে করলে গৃহযুদ্ধের

অবসান ঘটাতে পারো এবং হাল্‌বকে দামেশ্‌কের সঙ্গে একীভূত করে ফেলতে পারো। গাদ্দার মরেছে। তুমি তো গাদ্দার নও।'

ইয্‌যুদ্দীন ক্ষণিকের জন্য গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। পরক্ষণে আল-আদিলকে বললেন– 'হ্যাঁ, আমি হাল্‌ব ও দামেশ্‌কে এমন এক সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারি, যা কখনো ছিঁড়বে না। কিন্তু...। কিন্তু সেই সম্পর্কটা অটুট রাখার জন্য আপনি একটি কাজ বরং আমার একটি আকাঙ্খা পূরণ করে দিতে পারেন।... আমি নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবাকে বিয়ে করতে চাই– যদি ভদ্র মহিলা রাজি হয়।'

'আমি আজই দামেশ্‌ক চলে যাবো'– আল-আদিল বললেন– 'আমি আশা করি তিনি সম্মত হবেন।'

আল-আদিল দামেশ্‌ক পৌঁছে যান। রোজি খাতুনকে পুত্রের মৃত্যুর সংবাদটা জানান। শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

আল-আদিল রোজি খাতুনকে জানালেন– 'আস-সালিহ ইয্‌যুদ্দীনকে হাল্‌বের গবর্নর নিযুক্ত করে গেছে। আর... আর ইয্‌যুদ্দীন আপনাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে।'

রোজি খাতুন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

'এই পরিণয় আপনার আর ইয্‌যুদ্দীনের নয়'– আল-আদিল বললেন– 'এই বিবাহটা হবে দামেশ্‌ক ও হাল্‌বের। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে আগামীতে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং ক্রুসেড বিরোধী অভিযান আরো জোরদার হবে।'

'ঠিক আছে'– রোজি খাতুন বললেন– 'ইসলামের মর্যাদার খাতিরে আমি এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। আমার ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বলতে কিছু নেই।'

৫৭৭ হিজরীর ৫ শাওয়াল মোতাবেক ১১৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইয্‌যুদ্দীন ও রোজি খাতুনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।
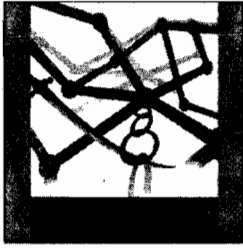
সাপ ও খৃস্টান মেয়ে

সাপটা দেড় বিঘতের বেশি লম্বা হবে না। কিন্তু প্রাণীটা ইসহাক তুর্কির এমন শক্তিমান ঘোড়াটাকে উপুড় করে ফেলে দিলো। গন্তব্য এখনো বহুদূর। সিনাই মরুদ্যানের অর্ধেক পথ এখনো বাকি।

ইসহাক তুরস্কের নাগরিক। সুঠাম দেহ, সুদর্শন চেহারা, আকর্ষণীয় গাত্রবর্ণ, নীলরঙা চোখ। দেখে কেউ বলতে পারবে না লোকটা মুসলমান না খৃস্টান। যেমন সুঠাম, তেমনি সুদর্শন। তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীতে যখন যোগ দেয়, তখন ইসহাক তুর্কির বয়স আঠার বছর। সৈনিকগিরি করে অর্থ উপার্জন তার উদ্দেশ্য ছিলো না। ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত এক সত্যিকার মর্দে মুমিন ইসহাক। ক্রুশের অনুসারীদের ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ইসহাক ইসলামের জন্য কাজ করতে দামেশ্‌ক এসেছিলো। এসেই ভর্তি হয়ে যায় সুলতান আইউবীর বাহিনীতে। সুলতান আইউবী মিসরের গবর্নর নিযুক্ত হলে ইসহাক তুর্কিকে মিসর পাঠিয়ে দেয়া হয়। গর্বের সাথে নিজেকে তুর্কি দাবি করতো ইসহাক।

তুরস্কের বহু নাগরিক সুলতান আইউবীর বাহিনীর সৈনিক ছিলো। তাদের উপর সুলতান আইউবীর পরিপূর্ণ আস্থা ছিলো। সুলতান যখন কমান্ডো ফোর্স গঠন করেন, তখন তুর্কিদেরই বেশি নিয়োগ দান করেন। সেই ফোর্স থেকে গোয়েন্দা বাহিনীও গঠন করা হয়েছিলো। ইসহাক তুর্কি তাদেরই একজন।

বাহিনীতে যোগ দেয়ার পরপরই ইসহাক তুর্কি নিজেকে অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ ও দুঃসাহসী কমান্ডো প্রমাণিত করে। তাকে কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। তারপর তাকে খৃস্টানদের বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তির লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়।

অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ ও দুঃসাহসী মানুষ ইসহাক তুর্কি। জীবনটা হাতে নিয়ে মাটির কয়েক স্তর নীচ থেকেও তথ্য বের করে আনার সাহস-যোগ্যতা আছে তার।

কিন্তু এই মুহূর্তে সিনাই মরুদ্যানে দেড় বিঘত লম্বা সামান্য একটা সাপ কঠিন এক পরীক্ষায় ফেলে দিলো লোকটাকে।

ইসহাক তুর্কি খৃস্টান অধ্যুষিত মুসলিম অঞ্চলে কর্মরত ছিলো। সেখান থেকে চলে যায় হাল্‌ব। এখন একটি নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে কায়রোর পথে। সুলতান আইউবী এখন কায়রো। অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে হবে ইসহাককে। তাই অবিশ্রাম পথ চলছে লোকটা।

সবুজ-শ্যামল এলাকা থেকে বেরিয়ে এসেছে ইসহাক তুর্কি। সম্মুখে বালির সমুদ্র, যার ভেতর থেকে কোন পথভোলা পথিক কখনো জীবিত বের হয়নি।

মরুভূমি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর শত্রু। ইসহাক তুর্কি মরু বিশেষজ্ঞ। সবুজ অঞ্চল থেকে পানি সংগ্রহ করে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে সে। পথটা তার জানাশোনা ছিলো। কোথায় কোথায় পানি আছে জানতো।

এই মরু অঞ্চলে একাধিকবার যুদ্ধও করেছে ইসহাক তুর্কি। হাল্‌ব থেকে রওনা হয়ে এ পর্যন্ত নির্ভয়ে-নিরাপদেই এসে পৌঁছেছে। খৃস্টান আর মরু যাযাবরদের ভয় করে না ইসহাক। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অবিরাম পথচলাকেই জীবন মনে করে লোকটা। তার বিশ্বাস, আল্লাহর সন্তুষ্টি এই জিহাদের মধ্যেই নিহিত।

সম্মুখে বিশাল মরু অঞ্চল। স্থানে স্থানে টিলা-পর্বত। ঘোড়াটাকে সামান্য বিশ্রাম দেয়ার জন্য একটি টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে যায় ইসহাক। দুপুরের সূর্যটা খানিকটা পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। ইসহাক একটি টিলার আড়ালে ছায়ায় বসে পড়ে। তার চোখের পাতা বুঝে আসে।

খানিক পর ঘোড়াটা উচ্চস্বরে ডেকে ওঠে। ইসহাকের চোখ খুলে যায়। ঘোড়াটা সামান্য জায়গার মধ্যে চারদিক ঘুরে ঘুরে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু বেশি দৌড়াতে পারলো না। থেমে গেলো। সমস্ত শরীর কাঁপছে প্রাণীটার।

কী হলো? ইসহাক এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পায়, সে যে জায়গাটায় শুয়েছিলো, তার চার-পাঁচ পা দূরে দেড় বিঘত লম্বা একটা সাপ। সাপটার রং কালো। কালোর মধ্যে সাদা সাদা গোলাকার দাগ। সাপটা ছটফট করছে। লেজের দিক থেকে দেহের অর্ধেকটা থেতলানো।

ঘোড়াটা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ইসহাক বুঝতে পারে, দংশনের আগে কিংবা পরে সাপটা ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়েছে। এখন তার চলচ্ছক্তি অবশিষ্ট নেই। ইসহাক তুর্কি সাপটার মাথাটা পায়ের নীচে পিষে ফেলে।

ঘোড়াটা বাঁচার আশা নেই। মরুভূমির বিচ্ছু আর এ জাতের সাপ এতোই বিষাক্ত যে, যাকে দংশন করে, সে পানি পান করারও সুযোগ পায় না। মরুভূমির পথিকরা প্রখর সূর্যতাপ এবং দস্যুদেরও এতো ভয় করে না, যতোটা করে এই সাপ-বিচ্ছুকে। এই সাপ মেঠো ও পাহাড়ী অঞ্চলের সাপের ন্যায় বুক টেনে সামনের দিকে অগ্রসর হয় না। এরা পাশের দিকে এক বিস্ময়করভাবে চলাচল করে থাকে।

ইসহাক হতাশ নয়নে ঘোড়াটার প্রতি তাকায়। ঘোড়াটা সজোরে কেঁপে ওঠে। মুখটা হা হয়ে গেছে। পাগুলো বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে কোন সাহায্য করার ক্ষমতা ইসহাকের নেই। উন্নত জাতের যোদ্ধাঘোড়া। ঘাস-পাতা, তরুলতাহীন মরু বিয়াবান, ক্ষুৎপিপাসা কিছুই আমলে নেয় না।

এরূপ একটি ঘোড়ার মৃত্যুতে ইসহাকের বিরাট ক্ষতির মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হলো, এখন তাকে পায়ে হেঁটে কায়রো পৌঁছতে হবে। তাকে অতি দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার কথা ছিলো। বুকে করে যে মূল্যবান তথ্য ইসহাক নিয়ে যাচ্ছিলো, তা যদি যথাসময়ে সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছানো না যায়, তাহলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

ইসহাক অনুতপ্ত চোখে ঘোড়াটার দিকে তাকায়। ঘোড়ার একটা পায়ের উপর তার দৃষ্টি পড়ে। ক্ষুরের সামান্য উপরে কয়েক ফোঁটা রক্ত জমে আছে। সাপটা এখানেই দংশন করেছে।

ঘোড়া মরে গেছে। ইসহাক ঘোড়ার যিন থেকে খেজুরের থলে এবং পানির মশক খুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। মৃত সাপটার প্রতি তাকিয়ে ঘৃণার সাথে বললো– 'সাপ আর খৃস্টানের স্বভাব একই।'

ইসহাক টিলাময় এলাকা থেকে বেরিয়ে গেছে। উপর থেকে সূর্যটা যেনো আগুন ঢালছে। ১১৮২ সালের এপ্রিল মাস। বসন্তকাল। কিন্তু মরু এলাকায় কখনো বসন্ত আসে না। ইসহাক তুর্কির সামনে এখন বালির সমুদ্র। বালি এমনভাবে চিক চিক করছে, যেনো এই আধা মাইল পথ অতিক্রম করলেই পানি পাওয়া যাবে।

ইসহাক এখনো সজীব-তরতাজা। খেজুরের থলে, মশক, তরবারী আর খঞ্জরের ভার তার অনুভবই হচ্ছে না। চলার গতি তীব্র। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কায়রো পৌঁছে যাওয়ার প্রত্যয় এখনো বিদ্যমান।

ইসহাক হাঁটছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা ডুবে গেছে।

একস্থানে সামান্য সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি দেয় ইসহাক। কয়েকটা খেজুর খেয়ে পানি পান করে। মিনিট কয়েক শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসে।

ইসহাকের মনে বেজায় আনন্দ যে, এক মহা-মূল্যবান তথ্য নিয়ে সুলতান আইউবীর নিকট যাচ্ছে সে। পানাহারের প্রয়োজনটা বেশি অনুভব করছে না ইসহাক। তার আত্মা পরিতৃপ্ত। কর্তব্যপরায়ণ মানুষ যখন কর্তব্য আদায় করে ফেলে, তখন তার আত্মা আনন্দিত হয়। ইসহাক তুর্কিও আত্মিক আনন্দে পরিতৃপ্ত।

ইসহাক উঠে দাঁড়ায়। তারকার দিকে তাকায়। দিক নির্ণয় করে হাঁটতে শুরু করে।

মরুভূমির রাত ততোটা শীতল হয়ে থাকে, যতোটা উত্তপ্ত থাকে দিন। তাই মরু অঞ্চলে রাতের সফর আরামদায়ক।

ইসহাক হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে তার মনের পাতায় অনেক কিছু ভেসে ওঠে। চিন্তা করে, এতো দীর্ঘ পথ এই সামান্য সময়ে অতিক্রম করতে পারবে কি। কোন নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী-উষ্ট্রারোহী যদি পাওয়া যায়, তাহলে তার বাহনটা কেড়ে নিয়ে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কিংবা যদি কোথাও অবস্থানরত কাফেলা পাওয়া যায়, তাহলে তাদের একটা উট বা ঘোড়া চুরি করে একটা বিহিত করা যায়। এছাড়া আর কোন উপায় দেখছে না ইসহাক।

ইসহাক আশায় বুক বেঁধে পথ চলতে থাকে। রাত অতিক্রান্ত হচ্ছে। ইসহাকের পায়ের তলা থেকে মরুভূমি ধীরে ধীরে পেছনে সরে যাচ্ছে। এখন তার ক্লান্তি অনুভব হতে শুরু করেছে। কিন্তু ক্লান্তি, ঘুম, ক্ষুধা ও পিপাসা কয়েকদিন পর্যন্ত সহ্য করার প্রশিক্ষণ তার আছে। ইসহাক ক্লান্তির প্রথম অনুভূতিটা একটা সঙ্গীতের কাছে পরাজিত করে দেয়। সে গান গাইতে শুরু করে– যুদ্ধের গান।

রাতের শেষ প্রহরে ইসহাক এক স্থানে বসে পড়ে। সামান্য পানি পান করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে।

এখনো সূর্য উদিত হয়নি। ইসহাক সজাগ হয়ে যায়। ক্ষিধেয় পেটটা চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু এই ক্ষুধাটাকেও জয় করে নেয় ইসহাক। এক ঢোক পানিও পান না করে হাঁটতে শুরু করে। গন্তব্য এখনো অনেক দূর। তাই যে সামান্য খেজুর-পানি আছে, তা এখনই শেষ করা যাবে না।

দূর থেকে আরেকটি বিপদ চোখে পড়ছে ইসহাকের। বালির গোল গোল

অসংখ্য টিলা। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে টিলাগুলো। দেখতে সবগুলো এক রকম। সবগুলোর উচ্চতাও প্রায় সমান। অপরিচিত কোন লোক তার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লে বের হতে পারবে না। এলাকাটা একটা মরণ ফাঁদের রূপ ধারণ করে আছে। কারণ, অনেক পথিক একই টিলার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে মনে করে সে পথ অতিক্রম করছে। আসলে সে গন্তব্যের দিকে না গিয়ে টিলার চতুর্দিকেই ঘুরছে। মরু বিশেষজ্ঞরাও এরূপ অঞ্চলকে ভয় করে।

ইসহাক তুর্কি প্রথমে ভাবে, দিক অনুযায়ী এই টিলাময় অঞ্চলটা তার অতিক্রম করার কথা ছিলো না। তাহলে কি সে ভুল পথে এসেছে? ইসহাক অস্থির হয়ে ওঠে। এখন তাকে সামনের দিকেই অগ্রসর হতে হবে। ইসহাক সম্মুখে এগিয়ে যায় এবং টিলার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।

সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসেছে। পায়ের তলার বালি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। ইসহাক টিলাময় অঞ্চলে পথ চলছে। ডান-বাম মোড় ঘুরে ঘুরে হাঁটছে ইসহাক। অঞ্চলটির বালুময় জমিন প্রমাণ করছে এ পথে ইসহাক ছাড়া অন্য কোন মানুষের আগমন ঘটেনি।

ইসহাক হাঁটছে তো হাঁটছেই। এই ডানে মোড় তো পরক্ষণেই বামে। আসলেই কি সে পথ অতিক্রম করছে কিছুই বুঝতে পারছে না ইসহাক।

এভাবে এক স্থানে মোড় ঘুরতে গিয়েই হঠাৎ চমকে ওঠে দাঁড়িয়ে যায় ইসহাক। মাটিতে পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। চিহ্নটা তারই পায়ের, যা অপর একটি টিলার পাশ হয়ে মোড় ঘুরে গেছে। ইসহাক বুঝে ফেলে, সে মরুভূমির নিঃসীম বিপজ্জনক ধোঁকায় পড়ে গেছে। যতোই হাঁটছে, একটুও অগ্রসর হচ্ছে না। কারণ, এতোক্ষণ যাবত হাঁটার পরও সে টিলাময় অঞ্চল থেকে বের হতে পারেনি।

ইসহাক পার্শ্বের টিলার উপর উঠে যায়। চতুর্দিকে চোখ মেলে তাকায়। তার মনে হচ্ছে, পৃথিবীটা গোল গোল উঁচু উঁচু বালির স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সূর্যের আগুন আর বালির উত্তাপ ইসহাকের দেহের রস চুষে নিতে শুরু করেছে। পা দুটো যেনো কয়েক মণ ওজন হয়ে গেছে।

ইসহাক পানি পান করে। দিকটা আন্দাজ করে নীচে নেমে আসে। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক, মাথাটা ঠিক রেখে কাজ করতে হবে। প্রতিটি মোড় মুখস্ত করে রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে তার প্রশিক্ষণও আছে। এখন প্রশিক্ষণটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে সে।

ইসহাক আবার হাঁটতে শুরু করে। এখন সে প্রতিটি টিলা, প্রতিটি মোড় হিসেব করে করে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু মরুভূমির নির্মমতা তার মাথাটা ঘুলিয়ে ফেলছে। ইসহাকের সহনশক্তি অস্বাভাবিক। অন্যথায় বহু আগেই তাকে বালির বিছানায় শুয়ে পড়তে হতো।

এখন বিকাল। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ইসহাক মরুভূমির ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু এখন তার দেহের ভার বহন করার শক্তি নেই। কর্তব্যের অনুভূতিটাই তাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

ইসহাক সম্মুখপানে তাকায়। দেখে, কতগুলো ঘোড়া সারিবদ্ধ হয়ে তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ঘোড়ায় একজন করে আরোহী। ইসহাক হাঁক দেয়। আবার উচ্চকণ্ঠে ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া নেই। ঘোড়াগুলো আপন গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইসহাক তুর্কি দাঁড়িয়ে যায়। চোখ দুটো বন্ধ করে মাথাটা সজোরে একটা ঝাঁকুনি দেয়। সে বুঝে ফেলে, আসলে ওগুলো ঘোড়া নয়– কল্পনা। ওগুলো মরিচিকা, যা কিনা মরুভূমির ভয়ানক এক প্রতারণা।

এখন পা টেনে টেনে হাঁটছে ইসহাক।

ইসহাক অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। এখন দিন না রাত সে বুঝতে পারছে না। এক স্থানে তার পা ফস্‌কে যায়। পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে চলে যায়। তার খানিকটা চৈতন্য ফিরে আসে। সে এদিকে-ওদিক তাকায়। তীব্র পিপাসা অনুভব করে। পিপাসায় কণ্ঠনালীতে কাঁটা বিঁধছে যেনো। ঠোঁট দুটো শুকনো কাঠের ন্যায় খসখসে হয়ে গেছে। কিন্তু তার কাছে না আছে পানির মশক, না আছে খেজুরের থলে। ওগুলো কোথায় হারিয়ে এসেছে খবর নেই।

ইসহাক এখন অনেকটা অসহায় ও হতাশ। তবুও চলার চেষ্টা করছে। যেদিকে তাকায় শুধু সাদা সাদা পরিচ্ছন্ন অগ্নিশিখা দেখতে পাচ্ছে। শিখাগুলো যেনো তাকে গোল বৃত্তের ন্যায় ঘিরে রেখেছে।

সে দাঁড়িয়ে যায়। এক স্থানে তিনজন লোক দেখতে পায়। দু'জন পুরুষ, একজন নারী। তিনজনই এক নাগাড়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকগুলোর পেছনে সামান্য দূরে খেজুর গাছও চোখে পড়ে ইসহাকের। তাদের সন্নিকটে টিলা। ইসহাক তুর্কি এসবকেও কল্পনা জ্ঞান করে এবং

মরিচিকা বলে ধারণা করে। তার হতাশা আরো বেড়ে যায়। তাতে দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায়। ডাকাডাকি করে লাভ নেই। কাল্পনিক দৃশ্য আর মরিচিকারা তো সাড়া দিতে পারে না। মরিচিকার কাজ পথচারীদের লোভ দেখিয়ে কাছে টানা আর নিজে পেছনে সরে যাওয়া। এক সময় তার পেছনে পেছনে ছুটে চলা মানুষটি পরাজিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে আর মরুভূমির বালি তার চামড়া-মাংস চুষে চুষে কংকালে পরিণত করে।

ইসহাক তুর্কির মধ্যে এতোটুকু জীবন অবশিষ্ট আছে, সে লোকগুলোকে কল্পনা বলে স্থির করেছে। কিন্তু চলার জন্য সম্মুখপানে পা ফেলা মাত্র পা দুটো নিথর হয়ে দু'দিকে সরে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে মরুভূমির মরিচিকা-কল্পনা সব ঘন অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

ইসহাক চৈতন্য হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আবার ধীরে ধীরে তার চৈতন্য ফিরে আসে। কারো কথপোকথন কানে আসছে তার। ইসহাক বালির উপর লুটিয়ে পড়েছিলো। তখন পায়ের নীচের বালিগুলো আগুনের উপর রাখা লোহার পাতের ন্যায় গরম ছিলো। কিন্তু এখন জ্ঞান ফিরে আসার পর ইসহাক শীতলতা অনুভব করছে।

'ওখানেই মরতে দেয়া ভালো ছিলো'– ইসহাক পুরুষালী কণ্ঠ শুনতে পায়– 'এখন তুলে বাইরে ফেলে দাও। লোকটা পথভোলা কোন পথিক হবে হয়তো।'

'না, লোকটা কোন সাধারণ পথচারী মনে হচ্ছে না।' আরেকটি পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেলো।

'হুঁশ ফিরে আসুক'– এবার নারীকণ্ঠ- 'আমার সন্দেহ হচ্ছে। লোকটা অচেতন অবস্থায় বিড় বিড় করছিলো। বলছিলো, কায়রো আর কতো দূর? সুলতান...। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী! আপনি সতর্কতার সঙ্গে কায়রো থেকে বের হবেন। আমি অনেক মূল্যবান সংবাদ নিয়ে এসেছি। লোকটাকে আমি একটু যাচাই করে দেখবো।'

এই কথোপকথনকেও ইসহাক তুর্কির কল্পনা মনে হতে লাগলো। কিন্তু সে জানে না, এই কণ্ঠ সেই দুই পুরুষ ও এক মেয়ের, যাদেরকে সে মরুদ্যানে নিজের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখেছিলো। তাদেরকে সে কল্পনা বলে মনে করেছিলো। কিন্তু আসলে তারা বাস্তবে মানুষ ছিলো- কল্পনা নয়।

'তুমি এর কাছে বসে থাকো'– একজন বললো– 'জ্ঞান ফিরে এলে পানি

পান করতে এবং কিছু খেতে দিও। তারপর তার পরিচয় জানা যাবে।' লোকটি বাইরে বেরিয়ে যায়।

ইসহাক ধীরে ধীরে চোখ খুলে। ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি তার কানে আসে। সে পুরোপুরি সজাগ হয়ে যায় এবং উঠে বসে। অলক্ষ্যে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে- 'এই ঘোড়াটা আমাকে দিয়ে দাও।'

'নাও, সামান্য পানি পান করো'- ইসহাক একটি নারীকণ্ঠ শুনতে পায়। এক মেয়ে এক পেয়ালা পানি হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি বললো- 'সামান্য পান করে নাও। একসঙ্গে সবটুকু পান করো না, অন্যথায় মারা পড়বে।'

পিপাসাকাতর ইসহাকের পানির বড্ড প্রয়োজন। মেয়েটির পরিচয় জানার চেষ্টা করে ইসহাক। পানির পেয়ালাটা হাতে নিয়ে ঠোঁট লাগিয়ে কয়েক ঢোক পান করে। তারপর পেয়ালাটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে বললো- 'আমি জানি, এরূপ অবস্থায় বেশি পানি পান করা ঠিক নয়।'

ইসহাক মেয়েটাকে পরখ করে। যুবতী মেয়ে। পোশাক-আশাকে এই অঞ্চলের মরু যাযাবরদের মতো হলেও গঠন-আকৃতি ও চেহারায় এখানকার মেয়েদের মতো নয়। মাথায় পেঁচানো রোমালের ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান চুলও যাযাবর মেয়েদের মতো মনে হলো না। ইসহাক ভাবে, এই অঞ্চলে তো কোন সম্ভ্রান্ত ধনী ঘরের মেয়েদের আসার কথা নয়। এখানে সাধারণত যাযাবররাই আসে।

'তুমি কি কোন কাফেলার সঙ্গে আছো?' ইসহাক মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ'- মেয়েটি জবাব দেয়- 'আমি এক বণিক কাফেলার সঙ্গে আছি। আমরা ব্যবসায়ী। তুমি কোথা থেকে এসেছো এবং কোথায় যাচ্ছো?'

ইসহাক তুর্কি উত্তর দেয়ার পরিবর্তে পানির পেয়ালাটা আবার ঠোঁটে লাগায়। কয়েক ঢোক পান করে। আস্তে আস্তে তার শরীরে সজীবতা ফিরে আসছে। চিন্তা করার শক্তি ফিরে পেয়েছে ইসহাক। তার মনে পড়ে যায়, সে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা এবং নিজের আসল পরিচয় যাবে বলা না।

'আমিও একটি বণিক কাফেলার সঙ্গে ছিলাম'- ইসহাক চিন্তা করে উত্তর দেয়- 'এক রাতে এখান থেকে দূরবর্তী এক স্থানে একদল দস্যু আমাদের কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে। উট-ঘোড়াগুলোও নিয়ে গেছে। আমি একা ওখান থেকে পালিয়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'আমি তোমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করছি।' বলেই মেয়েটি বেরিয়ে যায়।

ইসহাক তুর্কি একটি তাঁবুতে বসা। প্রদীপ জ্বলছে। ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকায়। জোৎস্না রাত। বাইরে ফকফকা চাঁদের আলো। তিন-চারজন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখতে পায় ইসহাক। মেয়েটির গাল ভরা হাসি শুনতে পায় সে। পরক্ষণে মেয়েটিকে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। ইসহাক পেছনে সরে গিয়ে নিজ জায়গায় বসে পড়ে। তাঁবুতে প্রবেশ করে মেয়েটি ইসহাকের সামনে খাবার রাখে। ইসহাক খেতে শুরু করে।

'তুমি কি এখন কায়রো যাচ্ছো?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'না'– ইসহাক মিথ্যা উত্তর দেয়– 'আমি ইস্কান্দারিয়া যাচ্ছি।'

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তো কায়রোতে আছেন'– মেয়েটি মুচকি হেসে বললো– 'ইস্কান্দারিয়া গিয়ে কী করবে?'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আমার আবার কী সম্পর্ক!' ইসহাক বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললো।

'আমাদের তো আছে'– মেয়েটি বললো– 'তিনি আমাদের সুলতান। তাঁর নির্দেশে আমরা জীবন কুরবান করতেও প্রস্তুত আছি।'

'ভালো কথা'– ইসহাক বললো– 'কিন্তু আইউবী কায়রোতে আছেন সে কথা আমাকে বললে কেন?'

'শোন'– মেয়েটি ইসহাকের মাথায় হাত রেখে বললো– 'তোমার একটি ঘোড়া দরকার। তুমি সুলতান আইউবীর নিকট যাচ্ছো। আমরা তোমাকে সাহায্য করবো। তোমাকে ঘোড়া দেবো। তুমি অনেক তাড়াতাড়ি সুলতানের নিকট পৌঁছে যাবে।'

'এসব তুমি কীভাবে জানলে?' ইসহাক বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

'ও কথা জিজ্ঞেস করো না'– মেয়েটি বলছে– 'তুমি তোমার কর্তব্য পালন করছো। আমাদের দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে দাও। তোমাকে ঘোড়া দিয়ে প্রমাণ করবো, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি।'

মেয়েটি এমন ধারায় কথা বললো যে, ইসহাক চিন্তায় পড়ে যায়। বললো– 'হ্যাঁ, আমাকে অনেক তাড়াতাড়ি সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছতে হবে।'

'জরুরী কোন সংবাদ আছে মনে হয়?'

'ওসব জিজ্ঞেস করো না'— ইসহাক উত্তর দেয়— 'সব কথা বলাও যায় না। সবকিছু সকলের জানারও প্রয়োজন নেই।'

'আমি তোমার ঘোড়ার ব্যবস্থা করছি'— মেয়েটি উঠতে উঠতে বললো— 'তুমি বিশ্রাম নাও। রাত সবে মাত্র শুরু হয়েছে। শেষ প্রহরে রওনা হলেই চলবে।'

মেয়েটি তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়। ইসহাক তুর্কি বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

❖ ❖ ❖

'কে না বলেছিলে ওকে ওখানেই মরতে দিলে ভালো হতো?'— মেয়েটি তাঁবুর বাইরে গিয়ে দলের লোকদের বললো— 'ওস্তাদ মানো আমাকে? লোকটা আইউবীর গুপ্তচর। বলছে কি জানো, বলছে, আমাকে একটা ঘোড়া দাও, সুলতান আইউবীর নিকট তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। লোকটা যখন অচেতন অবস্থায় বিড় বিড় করছিলো, তখন আমি কান পেতে শুনছিলাম, সে আইউবীর নাম উচ্চারণ করে বলছে, আমি বড় মূল্যবান তথ্য নিয়ে এসেছি।'

ইসহাকের সঙ্গে মেয়েটির যেসব কথাবার্তা হয় এবং তার মুখ থেকে যেসব কথা বের করে, মেয়েটি দলের লোকদেরকে সব জানায়।

এটি বণিক কাফেলা নয়। এরা সবাই খৃস্টানদের গুপ্তচর এবং নাশকতার কর্মী। মিসরে দায়িত্ব পালন করে এখন ফিরে যাচ্ছে কিংবা অন্য কোন অঞ্চলে যাচ্ছে। সঙ্গে রক্ষীও আছে। দশ-বারোজন পুরুষ। দু'টি মেয়ে। মেয়ে দু'টি অত্যন্ত রূপসী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।' ছদ্মবেশ ধারণ করেছে বণিকের। তাদের সঙ্গে উট আছে, ঘোড়া আছে। ছায়া-পানি দেখে এখানে অবস্থান নিয়েছে। সন্ধ্যার খানিক আগে তারা দূর থেকে ইসহাককে দেখতে পায়। দু'জন পুরুষ ও একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসে।

ইসহাক তুর্কি তাদেরকে দেখেছিলো। কিন্তু এই দেখাকে সে কল্পনা এবং মরিচিকা মনে করেছিলো। তার পরক্ষণেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। খৃস্টান পুরুষ দু'জন আর মেয়েটি তার কাছে যায়। মেয়েটি বললো, লোকটা সাধারণ মুসাফির মনে হয় না। পুরুষ দু'জন অভিমত ব্যক্ত করে, আনাড়ি কোন পথচারীই হবে। অন্যথায় এ দশা ঘটতো না। তথাপি ইসহাকের শারীরিক গঠন-আকারে তাদেরও কিছুটা সন্দেহ জাগে, অন্য কিছু হতে পারে। কিছুটা সন্দেহ, কিছুটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তারা ইসহাককে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে এবং এই তাঁবুতে শুইয়ে দেয়।

ফোঁটা ফোঁটা করে ইসহাকের মুখে পানি ও মধু ঢালে। ইসহাক বিড় বিড় করে ওঠে। ইসহাক অচেতন ছিলো। এই অচেতন অবস্থা আর ঘুমের মধ্যেই মানুষের মস্তিষ্ক জেগে ওঠে। গোয়েন্দাদের বিশেষভাবে নির্দেশনা দেয়া থাকে, যেনো তারা শত্রুর এলাকায় অচেতন না হয়। অজ্ঞান অবস্থায় অনেক সময় তার কাছ থেকে গোপন তথ্য বেরিয়ে আসে। মরুভূমি ইসহাককে অসহায় ও অচেতন করে দিয়েছিলো। অন্যথায় তার যথেষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিলো। অচেতন অবস্থায় যদি তার মুখ থেকে বিড় বিড় শব্দ বের না হতো, তাহলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারতো না।

ইসহাক বিচক্ষণ ও কৌশলী হওয়া সত্ত্বেও চেতনা ফিরে পেয়ে এখন সে খৃস্টান মেয়ের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। মেয়েটি সুদক্ষ খৃস্টান গোয়েন্দা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মেয়েটি নিশ্চিত হয়ে যায়, লোকটি মুসলমান এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর। তাঁবুর বাইরে গিয়ে সে সঙ্গীদের জানায়, আমার সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। এই সুদর্শন লোকটি সুলতান আইউবীর গোয়েন্দাই বটে।

'বড় শিকার'— দলনেতা বললো— 'এখন জানতে হবে, লোকটা কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছে এবং কোথায় কার নিকট যাচ্ছে।'

'তথ্য কোথা থেকে এনেছে জানার পর আরো জানতে হবে, ওখানে তারা কতোজন আছে এবং তাদের আস্তানা কোথায়।' দলের একজন বললো।

'কিন্তু আমাদের পরিচয় সে যেনো বুঝতে না পারে'— দলনেতা বললো— 'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দাদের ভালো করে জানি। তারা মৃত্যুকে বরণ করে নেবে; তবু তথ্য দেবে না। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'ঐ মুসলমানগুলোকে আমিও ভালোভাবেই জানি'— মেয়েটি অর্থবহ মুচকি হেসে বললো— 'তথ্য তো দেবেই, নিজের খঞ্জর দ্বারা নিজের হৃদয়টাও বের করে আমার পায়ের উপর রাখবে।'

'তুমি সেই মুসলমানদের জানো, যারা ক্ষমতা আর বিত্তের নেশায় মাতাল হয়ে গেছে'— অপর এক খৃস্টান বললো— 'সাধারণ মুসলমান আর সাধারণ সৈনিকের পাল্লায় তুমি পড়োনি। তোমাদের দ্বারা বিভ্রান্ত মুসলমানরাই সম্পদ ও মর্যাদার গোলাম হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব মুসলমানের নিকট ঐশ্বর্যের স্থলে ঈমান বড়, তাদের কাছে গিয়ে দেখো।'

দলে আরো একটি খৃস্টান মেয়ে আছে। সেও এই বৈঠকে উপস্থিত।

এ পর্যন্ত সে কোন কথা বলেনি। দলনেতা তার প্রতি তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বললো– 'তুমি এই মুসলমানটার কাছ থেকে তথ্য বের করতে পারবে না বারবারা?'

মেয়েটি মুখ তুলে দলনেতার প্রতি তাকায়।

দলনেতা আবার বললো– 'তুমি কায়রোতে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছো। মেরিনার দক্ষতা দেখো এবং তার থেকে শেখো। আমি তোমাকে আর সুযোগ দেবো না। মেরিনার দক্ষতার কথা চিন্তা করো। আমরা সবাই লোকটাকে পথভোলা পথিক মনে করেছিলাম। কিন্তু মেরিনা ঠিকই ধরে ফেলেছে, লোকটা মূল্যবান শিকার হবে। আমি তোমাকে এ জন্য মিসর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি যে, তুমি ক্রুশের উপকার করার পরিবর্তে ক্ষতি করছো।'

'তোমার পরিণতি খুবই মন্দ হবে বারবারা'– অপর এক খৃস্টান বললো– 'এই পেশায় তোমরা একজন রাজকন্যার মর্যাদ পেয়ে থাকো। কিন্তু তুমি এই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তারপর কারো গনিকা কিংবা বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া তোমার আর কোন উপায় থাকবে না।'

'উহ্!'– পাশ থেকে মেরিনা ঘৃণা প্রকাশ করে বারবারার উদ্দেশে বললো– 'এ তো যোগ্যই এ কাজের।'

বারবারা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে মেরিনার প্রতি তাকায়। রাগে-ক্ষোভে তার চেহারা লাল হয়ে গেছে। কিন্তু কোন কথা বলছে না। মেয়েটি মেরিনার মতোই রূপসী ছিলো। কিন্তু মিসর যাওয়ার পর তার দক্ষতায় ভাটা পড়ে যায়। সমস্যাটা সৃষ্টি করেছে দলনেতা। লোকটা পদস্থ অফিসার এবং সুদর্শন যুবক। বারবারাকে তার ভালো লাগতো। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা দু'জনে দু'জনার হয়ে যায়। কিন্তু এই দৃশ্য মেরিনার সহ্য হয় না। সে তার কূটচাল প্রয়োগ করে দলনেতাকে বারবারা থেকে সরিয়ে নিজের মুঠোয় নিয়ে আসে। তার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা শুরু করে দেয়। বারবারার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বারবারা বিষণ্ন হয়ে ওঠে এবং কর্তব্য পালনে অবহেলা শুরু করে। এই সুযোগে মেরিনা এমনও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় যে, বারবারার সন্দেহে নিপতিত হয়ে ধরা পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু শেষমেশ রক্ষা পেয়ে যায়।

মেয়েটিকে সুলতান আইউবীর উচ্চপদস্থ একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার পেছনে নিয়োজিত করা হয়েছিলো। কিন্তু সে উদ্দেশ্যে সফল হতে

পারেনি। দলনেতা টের পেয়ে যায়, বারবারা ও মেরিনার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। পরস্পর সহকর্মী হয়ে কাজ করার পরিবর্তে এখন তারা একজন অপরজনকে ঘায়েল করার সুযোগটাই কাজে লাগায়। এই পরিস্থিতি মিশনের জন্য খুবই ক্ষতিকর। মেয়েটি এই দল ত্যাগ করে অন্য দলে যাওয়ার চিন্তা করে।

বারবারা দলনেতার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মেরিনা তার সঙ্গে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়। নিজের অশুভ পরিণতি চোখের উপর ভাসছে মেয়েটির। আর এখন কিনা মেরিনা বলে ফেললো, বেশ্যাবৃত্তিই বারবারার মানানসই পেশা। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে বারবারার মনে।

'এই লোকটার কাছ থেকে তথ্য কেবল আমিই বের করতে পারবো'– মেরিনা বললো– 'এ কাজ বারবারার সাধ্যের অতীত।'

বারবারা ক্ষুব্ধ মনে নিজের তাঁবুতে চলে যায়।

'রাতে লোকটা পালাবার কোন সুযোগ পাবে না'– দলনেতা বললো– 'এ যাবত পালাবার কোন কারণও নেই। তথাপি সতর্ক থাকতে হবে। লোকটাকে অজ্ঞান করে রাখো।'

খানিক পর মেরিনা ইসহাকের তাঁবুতে প্রবেশ করে। ইসহাক শুয়ে আছে। প্রদীপটা জ্বলছে। মেরিনার হাতে একটি রোমাল। রোমালটি অচেতনকারী ওষুধে ভেজা। মেরিনা পা টিপে টিপে ইসহাকের নিকট গিয়ে বসে পড়ে। রোমালটি ইসহাকের নাকের উপর রেখে কিছুক্ষণ পর সেটি সরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মেরিনা সঙ্গীদের জানালো– 'আগামীকাল সূর্য উঠার সামান্য পর হুঁশ ফিরে পাবে।'

'এবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো'– দলনেতা বললো– 'আগামী দিন সালাহুদ্দীন আইউবীর এই গোয়েন্দাকে তার চাহিদা মোতাবেক ঘোড়া ঠিকই দেবো, তবে সেই ঘোড়ায় সে কায়রো নয়– আমাদের সঙ্গে বৈরুতে যাবে। লোকটা আমাদের সফরসঙ্গী হবে।'

সুলতান আইউবীর একজন গোয়েন্দাকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসা তাদের জন্য বিরাট সাফল্য। তারা উৎসবে মেতে ওঠে। মদের আসর বসায়। সাফল্যের আনন্দে মেরিনার পা যেনো মাটিতে পড়তে চাচ্ছে না।

কিন্তু আজ বারবারার মনে আনন্দের পরিবর্তে তুষের আগুন জ্বলছে। ফূর্তিতে যোগ না দিয়ে নিজ তাঁবুতেই ব্যথিত মনে অবস্থান করছে।

দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আমোদ-ফূর্তিতে কাটিয়ে প্রত্যেকে যার যার তাঁবুতে চলে যায়। দলনেতা মেরিনাকে নিয়ে একসাথে চলে যায়।

ব্যর্থ ও বেদনাহত বারবারা নিজ তাঁবুতে বসে অস্থির সময় অতিবাহিত করছে। অন্তরে তার প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাইরের আসরের হৈ-হুল্লোড় তার আগুনকে আরো উত্তেজিত করে তুলেছে। বারবারা উঠে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকায়। দেখে, তাদের দলনেতা আর মেরিনা টিলার দিকে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে তারা টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বারবারার কানে মেরিনার কণ্ঠ বাজছে– 'একমাত্র আমিই তার কাছ থেকে তথ্য বের করতে পারবো।' বারাবারার মাথায় চিন্তা জাগে, ইচ্ছে করলে আমি মেরিনাকে ব্যর্থ করতে পারি। একটা পন্থা এই হতে পারে, আমি ইসহাককে বলে দেবো আমরা সকলে খৃস্টান গোয়েন্দা, তুমি সতর্ক হয়ে যাও। আবার সহযোগিতা দিয়ে লোকটাকে ভাগিয়েও দিতে পারি। প্রতিশোধ আগুনে প্রজ্জ্বলমান বারবারার মাথায় নানা ভাবনা জাগে।

সকলের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে বারবারা। তার চোখে ঘুম আসছে না। এমন সময় তাঁবুর পর্দা সরে যায়। কে যেনো ফিসফিস শব্দে তাকে ডাকছে।

বারবারা বুঝতে পারে কে এসেছে।

'চলে যাও মার্টিন'– বারবারা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– 'চলে যাও এখান থেকে।'

মার্টিন চলে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁবুতে ঢুকে পড়ে এবং বারবারার পাশ ঘেঁষে বসে– 'তোমার হয়েছেটা কী বলো তো? তুমি কি মনে করো, দলনেতা মেরিনাকে হৃদয় থেকে ভালোবাসে? তুমি কি বিশ্বাস করো, তোমাকে সে মন দিয়ে ভালোবেসেছিলো? এ সবকিছুই তার বদমায়েশী ও ফষ্টিনষ্টি। বারবারা! তুমি অযথা হৃদয়ের উপর অস্থিরতার বোঝা চাপিয়ে কর্তব্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছো। তুমি যদি সত্যিকার ভালোবাসার প্রত্যাশী হয়ে থাকো, তাহলে সেটা তুমি আমার কাছ থেকেই আশা করতে পারো। আমি তোমাকে অন্তর থেকে কামনা করি। তুমিই বলো, আমি কি তোমাকে কখনো ধোঁকা দিয়েছি?'

'তোমরা আপাদমস্তক প্রতারক'– বারবারা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– 'তোমরা প্রত্যেকেই ধোঁকাবাজ। আমি আমার কর্তব্য থেকে সরে যাইনি। তবে আমার হৃদয় জগতটার প্রতিই অনীহা এসে গেছে। আমাদেরকে শৈশব

থেকেই প্রতারণার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে যে, আমরা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে ক্রুশের মোকাবেলায় তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দেবো। কিন্তু সেই বিদ্যা আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছি। গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে আমরা অপকর্ম করছি এবং একে অপরকে ধোঁকা দিচ্ছি। মুসলমানরা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান। তারা গুপ্তচরবৃত্তি-নাশকতার কাজে মেয়েদের ব্যবহার করে। আমাদের নেতা আমাকে ভালোবাসার টোপ দিলেন। কিন্তু মেরিনা বেশি চালাক বলে তাকে হাত করে নিলো। তুমি আমাকে দখল করার চেষ্টা করছো। ফল দাঁড়াচ্ছে, এখন আমরা পুরো দলটিই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। তোমাদের সঙ্গে যদি আমরা দুটি মেয়ে না থাকতাম, তাহলে তোমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হতে। নারীর উপস্থিতি পুরুষদের মধ্যে শত্রুতার জন্ম দিয়ে থাকে।'

'এ লক্ষ্যেই তো আমরা মুসলমানদের মাঝে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের ছেড়ে দেই'– মার্টিন বললো– 'তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা কাজটা এ জন্য করি, যাতে ইসলামের পতন ঘটে এবং ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।'

মার্টিন বারবারাকে নিজের দিকে টেনে এনে ফিসফিস করে বললো– 'এমন রাতটাকে নিরামিষ আলাপে বিস্বাদ করো না বারবারা! এসো বাইরে যাই। দেখো, চাঁদটা কতো সুন্দর!'

'আমার মনটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে'– বারবারা বললো– 'আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমার হৃদয়ে ঘৃণা জন্ম নিয়েছে। আমি কোথাও যাবো না। তুমি যেতে পারো।'

'একদিন এমন আসবে, তুমি আমার পায়ের উপর পড়ে কাকুতি-মিনতি করে বলবে, মার্টিন আমাকে বাঁচাও; ওরা আমাকে কুকুরের মুখে তুলে দিচ্ছে। তখন কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করবো না।'

'এখনো আমি কুকুরের মুখেই আছি'– বারবারা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো– 'আমি কোনদিন তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবো না। তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

মার্টিন ক্ষুব্ধ মনে উঠে দাঁড়ায় এবং তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

বারবারা মার্টিন চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং অপেক্ষা করতে থাকে মার্টিন কখন ঘুমিয়ে পড়ে। সে জানে, দলনেতা আর মেরিনার ফিরতে অনেক দেরি হবে।

খানিক পর বারবারা তাঁবু থেকে বের হয়। বসে বসেই সামনের দিকে এগুতে থাকে। সম্মুখের জায়গাটা সামান্য গভীর। বারবারা সেখানে নেমে পড়ে। সেখান থেকে ঝুঁকে ঝুঁকে কূপের পেছনে চলে যায়। অনেক দূর ঘুরে ইসহাক যে তাঁবুতে অবচেতন পড়ে আছে, সেখানে পৌঁছে যায়। বারবারা জানে না, ইসহাককে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে। সে তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ে। বাতিটা জ্বলছে। বারবারা পা ধরে ইসহাককে নাড়া দেয়। কিন্তু ইসহাক জাগলো না। মাথা ধরে নাড়ায়। হাত ধরে টানে। কিন্তু না, কিছুতেই লোকটা নড়ছে না।

'ওঠো হতভাগা!'— বারবারা ইসহাকের গালে চড় মেরে বিরক্তির সাথে বললো— 'তুমি প্রতারণার জালে আটকা পড়েছো। আমরা সবাই গোয়েন্দা। তুমি কায়রো যেতে পারবে না। বৈরুতের কারাগারের অন্ধকার পাতাল প্রকোষ্ঠে নির্যাতনের মুখে ধুকে ধুকে মরবে।'

ইসহাক অচেতন পড়ে আছে। যেনো মরে গেছে। বারবারা তাঁবুর বাইরে হাল্কা হাসির শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু ভয় পায় না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কিনা। শব্দগুলো নিকটে চলে আসার পরও মেয়েটি ইসহাকের নিকট বসে থাকে। হাসি আর ফিসফিস কথোপকথনের শব্দ তাঁবু পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। একটি কণ্ঠ মেরিনার। নেতার সঙ্গে কয়েদী দেখতে এসেছে।

'আমরা মুসলমান'— বারবারা ইসহাককে উদ্দেশ্য করে উচ্চস্বরে বললো— 'তোমাকে আমরা এমন একটি ঘোড়া দেবো, যে তোমাকে দু'দিনের মধ্যে কায়রো পৌঁছিয়ে দেবে।'

'বারবারা! বারবারা!' বারবারা দলনেতার কণ্ঠ শুনতে পায়। পেছন ফিরে তাকায়। দলনেতা ও মেরিনা দাঁড়িয়ে আছে। নেতা বললো— 'এই মুহূর্তে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করতে পারবে না। লোকটাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।'

'এটা আমার শিকার বারবারা'— মেরিনা তাচ্ছিল্যভরা হাসি হেসে বললো— 'এর থেকে কীভাবে তথ্য বের করতে হবে, সেটা শুধু আমিই জানি।'

দলনেতা ও মেরিনা হেসে ওঠে। এই তিরস্কারের হাসি বুঝতে পারে বারবারা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বললো— 'আমি কোন ভুল করিনি, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম।'

'যাও, ঘুমিয়ে পড়ো।' দলনেতা আদেশের সুরে বললো।

বারবারা উঠে দাঁড়ায়। তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

দলনেতা ইসহাকের শিরায় হাত রাখে। তারপর মেরিনাকে নিয়ে চলে যায়।

ইসহাক তুর্কি সুলতান আইউবীর জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে।

'আলী বিন সুফিয়ান!'– কায়রোতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর ইন্টেলিজেন্স প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন– 'ওদিক থেকে এ যাবত কোন সংবাদ আসেনি। তার অর্থ হচ্ছে, ওখানে কোন পরিবর্তন ঘটেনি, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমি বিষয়টা মানতে পারছি না।'

'আর আমিও মানতে পারছি না'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'ওখানে কোন পরিবর্তন আসবে, সমস্যা দেখা দেবে অথচ আমাদের নিকট কোন খবর আসবে না। ওখানে আমাদের যে লোক আছে, তারা সাধারণ গোয়েন্দা নয়। ইসহাক তুর্কিকে আপনি তো ভালো করেই জানেন। মাটির বুক চিরে তথ্য বের করে আনার মতো হিম্মত ও যোগ্যতা তার আছে। অন্যরাও তার মতোই বিচক্ষণ।'

'ওদিকে যেসব ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, খৃস্টানরা তা দ্বারা স্বার্থ উদ্ধার করবেই'– সুলতান আইউবী বললেন– 'বল্ডউইন তার ফিরিঙ্গি বাহিনীকে নিয়ে হাল্‌ব ও মসুলের আশপাশে অবস্থান করছে।'

'কিন্তু আল-মালিকুস সালিহ তো মারা গেছে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'হাল্‌বের শাসক এখন ইয্‌যুদ্দীন। তিনি তো খৃস্টানদের আনুগত্য করার মতো লোক নন।'

'আলী!'– সুলতান আইউবী মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন– 'তুমি কি তাহলে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত? তুমি সম্ভবত এ জন্য ইয্‌যুদ্দীনকে পরিপক্ক মুসলমান মনে করছো যে, আমি তাকে বন্ধু ভাবি এবং তার সাহায্যার্থে পরিকল্পনা বদল করে তালখালেদের উপর আক্রমণ করেছিলাম আর্মেনীয়দের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলাম। তাই না? কিন্তু শুনে রাখো আলী! আমি আমার মুসলমান শাসক ও আমীরদের উপর ভরসা রাখতে পারি না। ইয্‌যুদ্দীন আমাদের পক্ষভুক্ত শাসক হতে পারে। কিন্তু তার আমীর-উজীরদের মধ্যে খৃস্টানদের অনুগত লোকও আছে। আলী! তুমি কি দেখোনি, একজন ঈমানদার শাসকও মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের তোষামোদমূলক পরামর্শের জালে এসে মুমিন থেকেও দেশ-জাতিকে ভুল সিদ্ধান্ত দ্বারা ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করে থাকে? আমি পরামর্শ-

পরামর্শকের বিরোধী নই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পরামর্শ নেয়া কুরআনের নির্দেশ। কিন্তু যিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তার এতোটুকু বুদ্ধি-বিচক্ষণতা থাকতে হবে, যেনো পরামর্শকদের উদ্দেশ্য ও চরিত্র বুঝতে সক্ষম হন। তোষামোদ-চাটুকারিতা রাজত্বের মোহকে চাঙ্গা করে তোলে। একসময় শাসক তোষামোদের সুর লহরীতে সুখনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত বুদ্ধির শাসক যতো বড় যোদ্ধা কিংবা দুনিয়াবিমুখই হোক না কেন, জাতি ও মাতৃভূমিকে নিয়ে সাগরে ডুবে মরে। এমনি আশঙ্কা আমার ইয্‌যুদ্দীনের ব্যাপারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।'

'আমি আশাবাদী এই জন্য যে, নূরুদ্দীন জঙ্গী মরহুমের বিধবা মুহতারামা রোজি খাতুন ইয্‌যুদ্দীনকে বিয়ে করেছেন'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন, মুহতারামা রোজি খাতুন এই বিবাহ এ জন্য কবুল করেছেন, যেনো হাল্‌ব ও মসুলের শাসক ও সেনাবাহিনী আমাদের পক্ষে কাজ করে। ভদ্র মহিলার এছাড়া বিবাহের আর কী প্রয়োজন থাকতে পারে?'

'তথাপি আমার সন্দেহ হচ্ছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'সন্দেহের কারণটা হলো, ইয্‌যুদ্দীন খৃস্টানদের দ্বারা সরাসরি বেষ্টিত। নিজের নিরাপত্তার জন্য তিনি তলে তলে খৃস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারেন। ওখানকার খবরাখবর আমার তাড়াতাড়ি জানা দরকার। আমি কখনো অন্ধকারে পথ চলি না তুমি তো জানো।'

'আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন মহামান্য সুলতান।' আলী বিন সুফিয়ান পরামর্শ দেন।

'আমি বেশি দিন অপেক্ষা করবো না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তুমি জানো, আমি বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছি। এতো তোমার সম্মুখের ঘটনা, আমি দিন-রাত অবিশ্রাম বাহিনীকে মহড়া করাচ্ছি। গোপন কথাটা শুনে নাও, আমি হাল্‌ব-মসুলের দিকে যাবো না। আমার টার্গেট এখন বৈরুত। এখন আর আমি প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়বো না। হাল্‌ব, মসুল প্রভৃতি অঞ্চলে যাওয়ার অর্থ হবে, আমি প্রতিরক্ষা লড়াই করতে যাচ্ছি। কিন্তু এখন আমার যুদ্ধ হবে আক্রমণাত্মক-মারমুখী। বৈরুত ফিরিঙ্গিদের হৃদপিণ্ড। হাত-পায়ে আঘাত হানার পরিবর্তে কেন দুশমনের হৃদপিণ্ডে এক আঘাত হেনে নিঃশেষ করে দেবো না? এখন আমি বাহিনীকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। নিজ এলাকায় যুদ্ধে জড়িয়ে থাকলে আমি কোনদিন

বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে পারবো না। বুঝতে চেষ্টা করো আলী। ওদিক থেকে কোন সংবাদ এখনো না আসার কারণ কী। আমার দু'টি তথ্যের প্রয়োজন। প্রথমত, বৈরুতে ফিরিঙ্গি বাহিনীর তৎপরতা। দ্বিতীয়ত, হাল্‌বে ইয্‌যুদ্দীনের উদ্দেশ্য কী। আমার জানার প্রয়োজন, আমরা আরেকটি গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না তো।'

'বৈরুতে ইসহাক তুর্কি আছে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'নিজে না আসলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেবে। আমি এখান থেকে কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারবো না আলী'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তুমি এখান থেকে কাউকে পাঠাবে। সে খবর নিয়ে যাবে, তারপর আসবে। এই যাওয়া-আসার মাঝে সময় ব্যয় হবে কমপক্ষে তিন মাস। না, আমি এতোদিন অপেক্ষা করতে পারবো না। দিন কয়েকের মধ্যেই আমি বাহিনীকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেবো।'

'তা এই অগ্রযাত্রা কি অন্ধকারের পথচলা হবে না?' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'কমান্ডো ইউনিটগুলোকে অগ্রগামী বাহিনীরও অনেক সম্মুখে ছড়িয়ে রাখবো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি আল্লাহর আদেশে তাঁরই পবিত্র ভূমির মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছি। নিজের নিরাপত্তার জন্য আমি মিসরে আরামে বসে থাকতে পারি না আলী।'

১৯৮২ সালের কোন একদিন সুলতান আইউবী খৃষ্টানদের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় অস্থির প্রহর গুনছেন। আপনারা পেছনে পড়ে এসেছেন, তার দু'মাস আগে নূরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র আল-মালিকুস সালিহ– যিনি হাল্‌বের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে সুলতান আইউবীর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন– মৃত্যুবরণ করেছেন। সুলতান আইউবীর সঙ্গে তার যুদ্ধ না করা এবং সুলতানের জোটভুক্ত হয়ে কাজ করার চুক্তি থাকা সত্ত্বেও গোপনে গোপনে খৃষ্টানদের সঙ্গে মিত্রতা রেখেছিলেন। তার মৃত্যু সংবাদ খৃষ্টান ও সুলতান আইউবী উভয় পক্ষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। আল-মালিকুস সালিহ মৃত্যুর পূর্বে ইয্‌যুদ্দীন মাসউদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে ঘটনাটি, সেটি হচ্ছে ইয্‌যুদ্দীন-রোজি খাতুনের বিবাহ। নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী এবং আল-মালিকুস সালিহ'র মা এই বিয়ে সংসার পাতার জন্য বরণ

করেননি। সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিল ইয্যুদ্দীনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, এই বিবাহ হবে দামেশ্ক ও হাল্বের বিবাহ।। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে গৃহযুদ্ধের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং খৃস্টানদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান শক্ত হবে। রোজি খাতুন শেষ পর্যন্ত এই বলে সম্মতি প্রদান করেন যে, তার ব্যক্তিগত সব কামনা-বাসনা মরে গেছে। তিনি শুধুমাত্র ইসলামের মর্যাদার খাতিরে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন।

রোজি খাতুন ত্যাগ স্বীকার করে নেন এবং ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। হাল্ব এবং মসুলের প্রজাতন্ত্রগুলোর উপর বহুদিন যাবত খৃস্টানদের প্রভাব কাজ করে আসছিলো। যার ফলে এই প্রজাতন্ত্রগুলো সুলতান আইউবীর বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং তিন বছর পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। আপনারা তার বিস্তারিত কাহিনী পড়ে এসেছেন। এখন রোজি খাতুন ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে খৃস্টানরা চিন্তায় পড়ে যায়, রোজি খাতুন খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় শত্রু জঙ্গীর স্ত্রী। বিচক্ষণ এই মহিলা তো হাল্ব-মসুল ও অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলসমূহ থেকে খৃস্টানদের প্রভাব নস্যাৎ করে দেবেন। ওদিকে মিসরে সুলতান আইউবী এই ভাবনায় অস্থির যে, খৃস্টানরা সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলে কিনা। সুলতান আরো ভাবছেন, আরবে তার অনুপস্থিতিতে খৃস্টানরা স্বার্থ উদ্ধার করার অপচেষ্টা করতে পারে।

সুলতান আইউবী বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতের একটা সম্ভাব্য চিত্র এঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, খৃস্টানরা অগ্রযাত্রা করে হাল্ব-মসুল অবরোধ করে নেয়ার আগে তিনি দ্রুতগতিতে অগ্রযাত্রা করবেন এবং বৈরুত অবরোধ করে ফেলবেন।

সুলতান আইউবীর এ এক চরম স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত। বৈরুত অবরোধ করতে হলে তাকে শত্রুর এলাকা অতিক্রম করে যেতে হবে। পথেই সংঘাতের আশঙ্কা বিদ্যমান।

যা হোক, সুলতান আইউবী সম্ভাব্য সব ধরনের সকল শঙ্কা-বিপদের পরিসংখ্যান মাথায় নিয়ে সবরকম পরিস্থিতির মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গোয়েন্দা রিপোর্ট ব্যতীত অভিযান-অগ্রযাত্রা তিনি কমই করেছেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতির দাবি ভিন্ন। ইয্যুদ্দীনের নিয়ত

কী এবং ওখানে রোজি খাতুনের প্রতিপত্তি আছে কিনা জানা খুবই প্রয়োজন ছিলো তাঁর।

আলী বিন সুফিয়ানের প্রেরিত গোয়েন্দারা আনাড়ি কিংবা ভীতু নয়। তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা কায়রোতে পৌঁছানোর জন্য জীবন বাজি রাখা তাদের জন্য মামুলি ব্যাপার। একটা দীক্ষা তারা সবসময় মনে রাখে যে, অর্ধেক যুদ্ধ লড়াই শুরু হওয়ার আগেই গোয়েন্দারা জয় করে থাকে। তারা এও জানে, একজন গোয়েন্দার কর্তব্য অবহেলা কিংবা ভুল তথ্য গোটা বাহিনীকে শেষ করে দিতে পারে। আবার একজন মাত্র গুপ্তচর দুশমনকে অস্ত্র সমর্পণ করাতে বাধ্য করতে পারে।

ইসহাক তুর্কির উপর আলী বিন সুফিয়ানের পরিপূর্ণ আস্থা আছে। লোকটি যেমন যোগ্য, তেমনি সাহসী। তদুপরি পরিপক্ব ঈমানদার মুসলমান। আলীর এই আস্থা যথার্থ। ইসহাক তুর্কি দক্ষতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলো। সে সুলতান আইউবীকে অবহিত করতে আসছিলো যে, বল্ডউইনের ফিরিঙ্গি বাহিনী বৈরুতের আশপাশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইয্‌যুদ্দীনের ঝোঁক খৃস্টানদের প্রতি। কাজেই সুলতান যেনো বৈরুতের দিকে পা না বাড়ান। তদুপরি সুলতান যদি অগ্রযাত্রা করেনই, তার অনুকূলে ইসহাক ফিরিঙ্গি বাহিনীর বিস্তার ও অবস্থানের নকশা তৈরি করে আসছিলো। কিন্তু পথেই ইসহাক খৃস্টান গোয়েন্দাদের জালে আটকা পড়ে গেলো।

'বলো, সেই তথ্যটা কী, যা তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট নিয়ে যাচ্ছো?'– খৃস্টান গোয়েন্দা ইসহাককে জিজ্ঞেস করে। বললো– 'আমরাও মুসলমান। সুলতান আইউবীর সমর্থক ও অনুগত। তোমার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত আছে। খাদ্য-পানীয়ও ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।'

'আল্লাহ আমাদের সুলতানকে এরূপ সমর্থক-অনুগতদের থেকে নিরাপদ রাখুন'– ইসহাক বললো– 'আমি এই মেয়েটাকে বলেছিলাম, মধ্যরাতে পর আমাকে তুলে দিও, আমি রাত থাকতেই রওনা হয়ে যাবো। কিন্তু তোমরা আমাকে জাগালে না। রাত কেটে দিনেরও অর্ধেকটা চলে গেছে। সময় তো নষ্ট হয়েছেই, তদুপরি এখন রওনা হলে ঘোড়া অতোটা পথ অতিক্রম করতে পারবে না যতোটা রাতে পারতো।'

'তুমি অনেক ক্লান্ত ছিলে'– মেরিনা স্বস্নেহে বললো– 'এমন গভীর ঘুম ঘুমিয়েছিলে যে, আমি তোমাকে জাগিয়ে তোলা অবিচার হবে মনে করেছি। আমরা তোমার জন্য যে ঘোড়াটা প্রস্তুত করে রেখেছি, ওটা এতো ভালো যে, সময় যেটুকু নষ্ট হয়েছে তা পুষিয়ে দেবে।'

ইসহাক তুর্কি এখনো বুঝতে পারেনি, যাকে ওরা ক্লান্তির পর গভীর নিদ্রা বলছে, আসলে তা কোন ওষুধের ক্রিয়ার অচেতনতা। এতো দীর্ঘ সময় ঘুমানোর পরও তার শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। ইসহাক শারীরিকভাবে এখনো ভ্রমণে সমর্থ নয়। তবু এক্ষুনি রওনা হওয়ার জন্য ব্যাকুল সে।

ইসহাকের যখন চোখ খুলেছিলো, তখন সূর্য মাথার উপরে উঠে এসেছে। খৃস্টান দলনেতা ও মেরিনা তার চৈতন্য ফিরে আসার আগেই তার কাছে এসে বসেছিলো। ইসহাক চোখ খুললে তারা তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তারা এমন ধারায় কথা বলে যে, ইসহাক তুর্কির মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। সে তার সকল পরিকল্পনার কথা বলে যাচ্ছে। তবে ইসহাক সুলতান আইউবীর জন্য কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছে তা বলছে না।

খৃস্টান দলনেতা তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়। ইসহাককে কুপোকাত করার জন্য রেখে যায় মেরিনাকে। চিত্তহারী মেয়ে মেরিনা ইসহাককে উত্তেজিত করে তোলার লক্ষ্যে বললো– 'আমি তোমাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসি।' তাকে প্রেমের আহ্বানসহ আরো অনেক কথা বলতে থাকে মেরিনা।

'কায়রো পৌঁছে প্রেমালাপের জন্য সময় বের করে নেবো'– বললো ইসহাক– 'তুমি যদি আমাকে হৃদয় থেকেই কামনা করো, তাহলে আমাকে কর্তব্য পালনে সাহায্য করো।'

ইসহাক উঠে দাঁড়ায়। লম্বা পায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়। বলতে শুরু করে– 'আমাকে ঘোড়া দাও, এক্ষুনি দাও।'

'কিছু খেয়ে নাও'– মেরিনা ইসহাকের বাহু ধরে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিতে নিতে বললো– 'আমি তোমাকে না খাইয়ে যেতে দিতে পারি না।'

মেরিনা ইসহাককে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ ইসহাককে কোন কিছুই গলাতে পারছে না। তাঁবুতে নিয়ে মেরিনা ইসহাককে বসিয়ে দেয় এবং তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দেয়– 'খাবার তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো, সময় নেই। উনি এক্ষুনি চলে যাবেন।'

বারবারা খাবার নিয়ে এসে ইসহাকের সামনে রেখে পেছনে সরে দাঁড়ায়। মেরিনা ইসহাকের পার্শ্বে উপবিষ্ট। বারবারা মেরিনাকে পেছন করে দাঁড়ায়। ইসহাক খেতে শুরু করে। খাওয়ার মধ্যে ইসহাক বারবারার প্রতি তাকায়। বারবারা হাতে ক্ষুদ্র একটি ক্রুশ লুকিয়ে রেখেছিলো। অতি সতর্কতার সাথে সেটি ইসহাককে দেখায়। নিজের বুকে হাত রেখে মেরিনার প্রতি ইঙ্গিত করে। তারপর বাইরের দিকে ইশারা করে আঙ্গুল নাড়ায় এবং আঙ্গুলটি নিজের ঠোঁটের উপর রাখে। বারবারা তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

বারবারার ইশারা-ইঙ্গিতে ইসহাক বুঝে ফেলে এরা খৃস্টান এবং এদের আর কোন তথ্য দেয়া যাবে না। ব্যাপারটা অনুধাবন করে ইসহাক মনে মনে চমকে ওঠে বটে; কিন্তু অভিজ্ঞ গুপ্তচর বলে কিছুই প্রকাশ পেতে দেয়নি। তার সন্দেহ দৃঢ় সত্যে পরিণত হয়। সে বুঝতে পারে, সুলতান আইউবীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া তথ্য জানার এদের এতো আগ্রহ কেন। তার চেতনা আসে, সে তো ঘুমকাতর নয়। তবে কি তাকে বেহুঁশ করে রাখা হয়েছিলো। ঘুম থেকে জেগে সে বিস্ময়কর এক ঘ্রাণ অনুভব করেছিলো। তার আর সন্দেহ রইলো না তাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছিলো? কিন্তু একটি প্রশ্ন তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, দ্বিতীয় মেয়েটি তাকে ইশারা করে গেলো কেন? তবে কি মেয়েটি মুসলমান, এদের ফাঁদে আটকা পড়ে আছে?

মিষ্টিমধুর কথা, পাগলকরা মুচকি হাসি আর মনকাড়া ভাবভঙ্গিতে ইসহাককে তথ্য প্রকাশের জন্য কসরত চালিয়ে যাচ্ছে মেরিনা। ইসহাকের মাথাটাও কাজ করে যাচ্ছে দ্রুত– কীভাবে এদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবে।

ইসহাক মেরিনাকে জিজ্ঞেস করে– 'তোমাদের কাফেলায় কতোজন লোক আছে?' মেরিনা সংখ্যা বলে। ইসহাক আরো কিছু প্রশ্ন করে শেষে বললো– 'দাও, আমাকে ঘোড়া দাও।'

ইসহাক বাইরে চলে আসে। এদের সংখ্যা যাচাইয়ের চেষ্টা করে। কীভাবে এদের কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সে ফন্দি করতে থাকে। তার জন্য যে ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখার কথা বলা হয়েছিলো, বাইরে এসে সে কোন ঘোড়া দেখতে পায় না।

মেরিনা ইসহাকের পাশে এসে দাঁড়ায়।

'ঘোড়া কোথায়?' ইসহাক জিজ্ঞেস করে।

'আমি দেখছি।' বলেই মেরিনা চলে যায়।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে'– মেরিনা দলনেতাকে বললো– 'লোকটা পাথর, ঘোড়া ছাড়া কোন কথাই বলছে না। আমার কথার কোন পাত্তাই দিচ্ছে না।'

'তার কোন সন্দেহ জাগেনি তো?' খৃস্টান দলনেতা বললো।

'এ পর্যন্ত না'– মেরিনা বললো– 'তবে তার মুখ থেকে আসল তথ্য বের করা যাচ্ছে না।'

'তার মানে তোমরা ব্যর্থ!' খৃস্টান দলনেতা বললো।

দলনেতা জানে না, বারবারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে। সে প্রমাণ করে দিয়েছে, মেরিনা জাদুকর নয় যে, অসম্ভব কাজও করে দেখাবে। সুলতান আইউবীর এই গোয়েন্দাকে পলায়নের কাজে সহায়তা করার ইচ্ছা তার আছে। পারলে মজাটা জমতো ভালো। মেরিনার দম্ভ মাঠে মারা যেতো। কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

ইসহাক আবারও তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। মেরিনা ও তাদের নেতা দূরে একস্থানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ইসহাক দৌড়ে তাদের নিকট চলে যায়। জিজ্ঞেস করে– 'ঘোড়া কোথায়?'

'কোথাও নেই'– দলনেতা রাগান্বিত কণ্ঠে বললো– 'তোমার যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ।'

ইসহাক কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। তার সঙ্গে না আছে তরবারী, না খঞ্জর। ইসহাক তাদের আসল পরিচয় জেনে গেছে। তথাপি বললো– 'আমার অবাক লাগছে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তোমরা আমার পথ আগলে দাঁড়াচ্ছো কেন?'

'যদি লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পেতে চাও, তাহলে তাড়াতাড়ি বলো, তোমার সুলতানের জন্য কী বার্তা নিয়ে যাচ্ছিলে?' খৃস্টান দলনেতা বললো।

'শুধু এটুকু যে, আমাদের এক আমীর ইয্‌যুদ্দীন নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবাকে বিয়ে করেছেন।' ইসহাক উত্তর দেয়।

'এই সংবাদ বাসি হয়ে গেছে'– খৃস্টান দলনেতা বললো– 'তোমাদের সুলতান এ সংবাদ পেয়ে গেছেন দু'মাস আগে। এখন তিনি সিরিয়ায় যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আসল কথা বলো।'

'তোমরা কি আসল কথা বলে থাকো?' ইসহাক জিজ্ঞেস করে।

'আসল তথ্য, সঠিক তথ্য তোমাকে দিতেই হবে'— খৃস্টান দলনেতা বললো— 'আর তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তোমার সাথে অস্ত্র থাকলেও আমাদের লোকগুলোর মোকাবেলা করতে পারতে না। আমি তোমার বেঁচে থাকার এবং রাজপুত্রের ন্যায় বেঁচে থাকার বুদ্ধি দিতে পারি। আমার প্রস্তাব মেনে নাও। আমাদের সঙ্গে চলো। আমাদের জন্য সেই কাজ করো, যা সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য করেছো আর বিত্ত-বৈভবের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করো।'

খৃস্টান দলনেতা মেরিনার প্রতি ইঙ্গিত করে বললো— 'এর মতো মেয়েরা তোমার সেবার জন্য একপায়ে খাড়া থাকবে। কী দরকার এভাবে বনে-বাদারে মরুবনে ঘুরে মরবে!'

'আমি ক্রুশের জন্য কাজ করবো?'

'না করবে তো আমাদের কয়েদখানার অন্ধকার পাতাল কক্ষে বন্দি হয়ে থাকবে'— খৃস্টান দলনেতা বললো— 'সেটাই হবে তোমার জন্য জাহান্নাম। তুমি মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। আমরা তোমাকে এমন শাস্তি দেবো, যার কল্পনাও হবে তোমার জন্য ভয়ঙ্কর। আমাদের সঙ্গে চলো। ফিরে তো আর যেতে পারবে না।'

'তা তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে কীভাবে?'— ইসহাক বললো— 'আমি তোমাদের দলভুক্ত হওয়ার পর তোমরা আমাকে আমারই এলাকায় প্রেরণ করবে। তোমরা কীভাবে নিশ্চিত হবে, আমি নিজ এলাকায় থেকে যাবো না কিংবা তোমাদের ধোঁকা দেবো না?'

'আমাদের নিকট তার ব্যবস্থা আছে'— খৃস্টান দলনেতা বললো— 'তুমি নিজ অঞ্চলের কথা বলছো। আমরা ইচ্ছে করলে তোমাকে তোমার ঘরের গোপন ঠিকানা থেকেও বের করে আনতে পারবো। সেই বিদ্যা আমাদের আছে। তোমার ধারণা কী, তোমাদের দেশে আমাদের যতো গুপ্তচর আছে, তাদের মধ্যে তোমাদের দেশের কোন লোক কি নেই? দশজন গোয়েন্দার একটি দলে আমাদের লোক থাকে মাত্র দু'জন। বাকিরা তোমাদেরই ভাই। আমাদেরকে ধোঁকা দেবে এমন সাহস তাদের কারো নেই। এমন দুঃসাহস দেখানোর পরিণতি কী তা তারা জানে। কেউ এমন অপরাধ করলে আমরা শুধু তাকেই হত্যা করি না, প্রথমে তার স্ত্রী-সন্তানদের এক এক করে হত্যা করে লাশগুলো তার সামনে রাখি। তারপর তাকে হত্যা করি। আর যে আমাদের অনুগত থেকে কাজ করে, তার জন্য জগতটাকে স্বর্গ

বানিয়ে দেই। কেউ ধরা পড়ে গেলে তার পরিজনের সম্পূর্ণ দায়ভার আমরা বহন করে নেই।'

'আমাকে ভাবতে দাও'– ইসহাক বললো– 'এখান থেকে কবে রওনা হবে?'

'আজই'– খৃস্টান দলনেতা বললো– 'মধ্যরাতের পর। তুমি চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও। মনে রাখবে, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।'

'আমি জানি।' ইসহাক বললো।

'আর তোমাকে বলতে হবে, তুমি আইউবীর নিকট কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলে।' খৃস্টান দলনেতা বললো।

'বলবো'– ইসহাক জবাব দেয়– 'পরে বলবো। মথাটা আউলা-ঝাউলা হয়ে আছে। একটু স্থির হয়ে নিই।'

'যাও, এখন বিশ্রাম নাও।' খৃস্টান দলনেতা বললো।

ইসহাক তুর্কি তাঁবুর দিকে চলে যায়।

নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রোজি খাতুন এখন ইয্যুদ্দীনের স্ত্রী। মহিলার ব্যক্তিগত কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। নেই কোন জৈবিক চাহিদাও। তবু এই বিয়েতে তিনি আনন্দিত। আনন্দিত এ জন্য যে, স্ত্রী হওয়ার সুবাদে ইয্যুদ্দীনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন এবং হাল্বের বাহিনীকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সহযোগি হয়ে কাজ করাবেন। তার আশা ছিলো ইয্যুদ্দীন তাকে নিজের উপদেষ্টা নিযুক্ত করবেন।

কিন্তু বিবাহের প্রথম দিনই যখন রোজি খাতুন এ জাতীয় আলাপের অবতারণা করেন, দেখা গেলো তাতে ইয্যুদ্দীনের কোন আগ্রহ নেই। কেমন যেনো বিরক্তি ভাব তার মধ্যে। তিনি রাতে রোজি খাতুনের সঙ্গে এক শয্যায় ঘুমালেনও না। থাকলেন মহলের অন্য এক কক্ষে।

রোজি খাতুন প্রাথমিকভাবে ধরে নিলেন, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিধায় ঝামেলার কারণে মন-মানসিকতা ভালো নেই। দু'চারদিন গেলে হয়তো স্বাভাবিক হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় ঝক্কি-ঝামেলার প্রতি তার কোন অনুযোগ নেই। তিনি নিজেও তো রাষ্ট্রের ভাবনাই ভাবেন। নূরুদ্দীন জঙ্গীর জীবদ্দশায় তিনি বহু কাজ করেছেন। করেছেন জঙ্গীর মৃত্যুর পরও। দামেশ্কের যুবতী মেয়েদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে রীতিমতো একটি মহিলা বাহিনী গঠন করে ফেলেছিলেন।

রাত পোহাবার পর রোজি খাতুন কক্ষ থেকে বের হন। হাঁটতে হাঁটতে মহলের ভেতরেই এক স্থানে চলে যান। বিশাল প্রাসাদ। তিনি দূরে একটি বাগিচা দেখতে পান। তাতে পাঁচ-ছয়টি যুবতী হাসি-তামাশা করছে।

রোজি খাতুন এখনো তাদের থেকে বেশ দূরে। এক মধ্যবয়সী মহিলা ধেয়ে এসে তাঁকে বললো– 'আপনি আপনার কামরায় চলে যান।'

'কেন?'

'মুহতারাম আমীরের এটাই নির্দেশ'– মহিলা বললো– 'চলুন, আপনার জায়গায় আপনাকে পৌঁছিয়ে দেই। ওখানেও আপনি ঘোরাফেরা করতে পারবেন। মাননীয় আমীরের কড়া নির্দেশ, আপনাকে যেনো এখানে আসতে না দেই।'

'আমি যদি সেই নির্দেশ অমান্য করি, তাহলে কী হবে।' রোজি খাতুন পাল্টা প্রশ্ন করেন।

'আমাকে গোস্তাখী করার সুযোগ দেবেন না'– মহিলা অনুরোধের সুরে বললো– 'মনিবের আদেশ আমাকে মানতেই হবে।'

আরেক মধ্যবয়সী মহিলা এসে হাজির হয়। সে রোজি খাতুনের পাশে এসে দাঁড়ায়। রোজি খাতুনকে সঙ্গে করে তার কক্ষে নিয়ে যায়। মহিলা বলতে শুরু করে– 'আমি আপনার সেবিকা। সর্বক্ষণ আপনার কাছে থাকার নির্দেশ পেয়েছি। আরো নির্দেশ পেয়েছি, আপনাকে যেনো নির্ধারিত সীমানার বাইরে যেতে না দেই।'

রোজি খাতুন চমকে ওঠেন। সেবিকা বললো– 'আপনি ভয় পাবেন না। আমি জানি, আপনি কী স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে এসেছেন। আপনার প্রতিটি স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। আমাকে আপনার সহকর্মী মনে করুন। এই মহল খৃস্টানদের কড়া নজরদারির মধ্যে আছে। আপনার পুত্র তাদের হাতের খেলনা ছিলেন। বর্তমান আমীরও– যিনি এখন আপনার স্বামী– খৃস্টানদের মদদপুষ্ট ও অনুগত হয়েই থাকবেন। এখানকার বহু উজির ও উপদেষ্টা খৃস্টানদের কেনা দাসে পরিণত হয়েছে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর ব্যাপারে মহলের লোকদের অভিমত কী?'– রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন– 'এখানে তার কোন প্রভাব আছে কি?'

'এতোটুকু নেই, যতোটুকু আছে খৃস্টানদের'– সেবিকা গোপনীয়তা রক্ষা করে বললো– 'মহলে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা আছে। আমি নিজে সেই গ্রুপের সদস্যা। আমি আপনাকে ভালো করেই জানি। তাই নিজের

পরিচয়টা দিয়েছিলাম। তবে সব কথা এখনই বলবো না। আপনি ইয্যুদ্দীনের নিকট আপত্তি জানান। তিনি আপনাকে এই কক্ষের কয়েদী বানাবেন কেন।'

'তাতো করবোই।'

'তার উদ্দেশ্যটা আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে'— সেবিকা বললো— 'পরবর্তী পরিস্থিতিই প্রমাণ করবে, আমি মিথ্যা বলিনি। সত্য হলো, ইয্যুদ্দীনের আপনাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য হলো, তিনি আপনাকে কয়েদী বানাবেন। আপনাকে নিজের মতো করে কাজ করতে দেবেন না। সুলতান সালাহুদ্দিন আইউবীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক চিরদিনের জন্য নষ্ট করা দিতে এবং আপনাকে দামেশ্ক থেকে বের করে আনাই তার উদ্দেশ্য। দামেশ্কের মানুষ সুলতান আইউবীর সমর্থক ও অনুগত এ জন্য যে, আপনি ওখানে ছিলেন। এখন শত্রুরা দামেশ্কের জনগণকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। ফলে মুসলমানরা পুনরায় গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং খৃস্টানরা অনায়াসে আমাদের ভূখণ্ডগুলো দখল করে নেবে।'

'এই তথ্যগুলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট পৌঁছানো যায় না?' রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন।

'সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে'— সেবিকা উত্তর দেয়— 'আমাদের দলের কমান্ডার অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সাহসী এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তার নাম ইসহাক তুর্কি। আমি তাকে ভালো করে জানি। আপনার ছেলের মৃত্যুর পর খৃস্টানদের পরিকল্পনা জানতে খৃস্টানদের অঞ্চলে চলে গেছে। শীঘ্রই এসে পড়বে।'

'আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবো?' রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন।

'অবশ্যই।' সেবিকা জবাব দেয়।
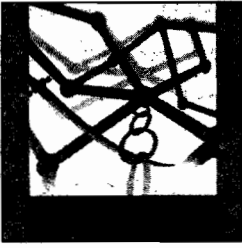
শরাব নয় শরবত

ইয়্যুদ্দীনের মহলের আভ্যন্তরীণ জগতের গোপন তথ্যাদি অবহিত করে রোজি খাতুনের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিয়েছে খাদেমা। রোজি খাতুন যেসব স্বপ্ন দেখে হাল্‌বের গভর্নর ইয়্যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেসব স্বপ্ন থেকে তিনি জাগ্রত হয়ে গেছেন।

রোজি খাতুন এক মহান নারী। ইসলামে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক বীর মুজাহিদা। মৃত স্বামী নূরুদ্দীন জঙ্গী এবং পাসেবানে ইসলাম সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় রোজি খাতুনও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং সালতানাতে ইসলামিয়ার ঐক্য সম্প্রসারণের জন্য জন্মেছিলেন। খাদেমা তাকে যেসব তথ্য অবহিত করেছে, সেসব যদি সত্য ও বাস্তব হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হচ্ছে– এই বীর নারীর স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং তার তরবারীটাকে ভোতা বানিয়ে তাঁকে কয়েদীতে পরিণত করা হয়েছে। তার যুবতী কন্যা শামসুন্নিসা এ মহলেই অবস্থান করছে। অথচ, এখনো মেয়ের সঙ্গে তার দেখা মেলেনি।

পিতা নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর সময় শামসুন্নিসার বয়স ছিলো আট-নয় বছর। তার বড় এবং একমাত্র ভাই আল-মালিকুস সালিহ'র এগারো। জঙ্গীর মৃত্যুর পর ক্ষমতালোভী চাটুকাররা তাঁর এই এগারো বছরের বালক পুত্রটাকে খলীফা নিযুক্ত করে পুতুল রাজায় পরিণত করে। সুলতান সালাহুদ্দীন এই ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে দেশ রক্ষার জন্য মিসর থেকে দামেশ্‌ক এসেছিলেন। তার আগমনের ধরনটা ছিলো একরকম সেনা অভিযানের মতো। জঙ্গীর বিধবা রোজি খাতুনের প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সহযোগিতায় দামেশ্‌কের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল-মালিকুস সালিহ বিপুলসংখ্যক সৈন্যসহ পালিয়ে হাল্‌ব চলে যান। বোন শামসুন্নিসাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। মা রোজি খাতুন দামেশ্‌কে থেকে যান এবং খৃস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদে রত থাকেন। শামসুন্নিসা পনের বছরে উপনীত হলে ভাই আল-মালিকুস

সালিহ রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। তিনি মাকে এক নজর দেখার আকাঙ্খা ব্যক্ত করলে শামসুন্নিসা দাসেশ্বকে মায়ের নিকট গিয়ে আর্জি পেশ করে, আপনার একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তিনি আপনার সাক্ষাৎ কামনা করছেন।

রোজি খাতুন স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন– 'তোমার ভাই যেদিন সুলতানের আসনে আসীন হয়েছিলো এবং সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করেছিলো, সেদিনই তার মৃত্যু হয়ে গেছে। শামসুন্নিসা ফিরে যায়। ততোক্ষণে ভাই আল-মালিকুস সালিহ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।

আজ রোজি খাতুন পুত্র যে মহলে মৃত্যুবরণ করেছিলো, তার স্থলাভিষিক্ত ইয্যুদ্দীনের স্ত্রী হয়ে সেই মহলে আগমন করেছেন। কন্যা শামসুন্নিসা– যে কিনা এই মহলেই অবস্থান করছে– তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেনি। রোজি খাতুন খাদেমাকে জিজ্ঞেস করেন– 'শামসুন্নিসা কোথায়? আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবো?'

'সে এখানেই আছে'– খাদেমা জবাব দেয়– 'মনিবকে জিজ্ঞেস করুন, তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন কিনা। যদি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়ে থাকে, তাহলে আমি গোপনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবো।'

'তুমি তোমার দলের যে কমান্ডারের কথা বলছো, তার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে পারবো কি?' রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন।

'ক'টা দিন যাক'– খাদেমা উত্তর দেয়– 'দেখি আপনার উপর কী কী বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। পরিস্থিতি অনুপাতে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আপনার বিয়েটা হঠাৎ হয়েছে এবং এতো দ্রুত যে, আমরা আগে জানতেই পারিনি। অন্যথায় এ বিয়ে হতে দিতাম না।'

'আচ্ছা, আমি কীভাবে বিশ্বাস করবো, তুমি আমার সমর্থক এবং আমার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছো না?' রোজি খাতুন সরল মনে জিজ্ঞেস করেন।

খাদেমার ঠোঁটে হাসি দেখা দেয়। রোজি খাতুনকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে বললো– 'আমি যদি কোন ধনাঢ্য নারী হতাম, কোন প্রাসাদের রাজকন্যা হতাম কিংবা আমার মর্যাদা যদি আপনার ন্যায় হতো, তাহলে আপনি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করতেন না। আপনি প্রতিটি মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে প্রতারণার শিকার হতেন। আমার অবস্থান তো এমন যে, আমার সত্যটাও মিথ্যা বলে মনে হবে। এখনো কি আপনার এই

অভিজ্ঞতা হয়নি, সততা, বিশ্বস্ততা ও চেতনা শুধু গরীবদেরই হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে? অনাগত ভবিষ্যৎই বলে দেবে আপনাকে কার উপর আস্থা রাখা উচিত– একজন গরীব সেবিকার উপর, নাকি হালবের রাজার উপর, যিনি আপনার স্বামীও বটে। আপনি আমাকে বিশ্বাস করার ঝুঁকি বরণ করে নিন আর দু'আ করুন, আল্লাহ যেনো আপনার ও আমাদের সাহায্য করেন।'

খাদেমা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। রোজি খাতুন চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেতে শুরু করেন। রাজকীয় এই কক্ষটা তার কাছে মনে হচ্ছে আস্ত একটা জাহান্নাম।

দু'-তিন দিন হয়ে গেলো রোজি খাতুন ইযযুদ্দীনের দেখা পাচ্ছেন না। কক্ষে খাবার-পানীয় ইত্যাদি সব এসে যাচ্ছে যথারীতি। তার কখন কী প্রয়োজন হয়, সমাধার জন্য সেবিকাগণ মহাব্যস্ত। যেনো তিনি এই মহলের রাণী। কিন্তু এই রাজকীয় আয়োজন তাঁকে মানসিকভাবে নিদারুণ পীড়া দিয়ে যাচ্ছে। তিনি একজন সুলতানের বিধবা। স্বামীর জীবদ্দশায় কখনো তিনি নিজেকে রাণী কিংবা রাজকন্যা ভাবেননি। তার প্রত্যয় ছিলো, তিনি পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হবেন, মাঠে-ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি যুদ্ধ করবেন এবং একদিন শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন।

হঠাৎ একদিন ইযযুদ্দীন তার কক্ষে এসে প্রবেশ করেন এবং ব্যস্ততার কারণে এতোদিন আসতে পারেননি বলে ওজরখাহী করেন।

'আপনি আসেননি বলে আমার কোন অভিযোগ নেই'– রোজি খাতুন বললেন– 'আমি এখানে মূলত বধূ হয়ে আসিনি। আপনি প্রতি মুহূর্তে আমার সঙ্গে থাকুন কিংবা প্রতিরাত আমার সাথে সময় অতিবাহিত করুন, এরূপ আকাঙ্খা আমার নেই। আমার দাম্পত্য জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় নিঃসঙ্গ কেটেছে। মরহুম নূরুদ্দীন জঙ্গী রণাঙ্গনে থাকতেন আর আমি তাঁর নয়– তাঁর লাশের অপেক্ষায় থাকতাম। যে সময়টা তিনি যুদ্ধের ময়দানে থাকতেন না, সে সময়টা রাজ্যের বিভিন্ন কাজ এবং ফৌজের প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকতেন। আমাকে দেয়ার মতো সময় তিনি তেমন একটা পেতেন না। কিন্তু সেখানে আমিও ব্যস্ত থাকতাম। সালতানাতের কিছু কিছু কাজের তত্ত্বাবধান ও শহীদ পরিবারের দেখাশোনা আমার উপর ন্যস্ত ছিলো। আমি মেয়েদেরকে

আহত যোদ্ধাদের ব্যান্ডেজ, তরবারী চালনা, তীরন্দাজি ও অশ্বচালনার প্রশিক্ষণ দিতাম। ওখানে আমি এক কক্ষে বন্দী ছিলাম না, যেমনটা এখানে আছি। এই বন্দিদশা আমি পছন্দ করি না।'

রোজি খাতুন খাদেমার নিকট থেকেই ইয্‌যুদ্দীনের মতলব জানতে পেরেছেন। তাই এই দ্বিতীয় স্বামীর মনভোলানো প্রেমনিবেদনে প্রবঞ্চিত হতে প্রস্তুত নন তিনি। একবার মাত্র এবং আজই তিনি নিজের উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে ফেলবেন মনস্থ করেন রোজি খাতুন। রোজি খাতুন ছোট্ট খুকি নয়– একজন পরিপক্ক অভিজ্ঞ নারী।

'কিন্তু আমাকে এই কক্ষে যেভাবে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এটা আমার পছন্দ নয়'– রোজি খাতুন বললেন– 'আমি আপনার হেরেমের দাসী-গোলাম নই। আপনি আমাকে এভাবে রাখতে পারেন না।'

'রোজি খাতুন!'– ইয্‌যুদ্দীন কক্ষে পায়চারি করতে করতে বললেন– 'নূরুদ্দীন জঙ্গীর সংসারে তুমি যে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছো, সেই ধারা এখানে তোমাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। তিনি তোমাকে যে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন, তা আমার পছন্দ নয়। আর কোন স্বামীই এই জীবনধারা মেনে নিতে পারে না। তুমি যদি বাইরে বেড়াতে যেতে চাও তো তোমার জন্য ঘোড়াগাড়ি প্রস্তুত আছে। যখন খুশি তুমি বেড়িয়ে আসতে পারো।'

'যার মহলের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি নেই, সে আবার বাইরে বেড়ানোর অনুমতি কী করে পেতে পারে?'– রোজি খাতুন প্রশ্ন করেন– 'আপনি কি সত্যিই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি মহলের ভেতর ঘোরাফেরা করতে পারবো না?'

'এই আদেশ আমি তোমার নিরাপত্তার জন্য দিয়েছি'– ইয্‌যুদ্দীন উত্তর দেন– 'তুমি তো জানো, হাল্‌ব ও দামেশ্‌কে কিরূপ গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। সুলতান আইউবী তোমার পুত্রকে পরাজিত করে তাকে আনুগত্যের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকজন অন্তর থেকে আইউবীর শত্রুতা ভুলতে পারেনি। মহলে এমন লোকও থাকতে পারে, যে তোমাকে এবং সুলতান আইউবীকে শত্রু মনে করে। সুলতান আইউবীর ফৌজের হাতে তাদের বাস্তুভিটা ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের যুবক ছেলেরা নিহত হয়েছে। তারা জানে, তুমি আইউবীর সমর্থক এবং তার দামেশ্‌ক দখলে সহায়তা

করেছো। তাদের কেউ তোমাকে খুন কিংবা অপহরণ করতে পারে।'

'তারা আপনাকেও হত্যা করতে পারে। কারণ, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর বন্ধু ও জোটভুক্ত শাসক'– রোজি খাতুন বললেন– 'তো যে লোকগুলো ইসলামী ঐক্যের বিরোধী তাদেরকে গ্রেফতার করা আবশ্যক নয় কি? আপনার নিকট কি এমন কোন গুপ্তচর নেই, যারা খুঁজে বের করে এদেরকে ধরিয়ে দিতে পারে?'

'আমি সকল ব্যবস্থাই করছি'– ইয্‌যুদ্দীন এমনভাবে কথাটা বললেন যেনো তার কাছে এ প্রশ্নের উপযুক্ত কোন জবাব নেই– 'আমি তোমার জীবনটা ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাই না।'

'এই ঝুঁকি কি শুধু মহলের ভেতরে?'– রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন– 'আপনি আমাকে ঘোড়াগাড়িতে চড়ে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি প্রদান করেছেন। বাইরেও তো কেউ আমাকে খুন কিংবা গুম করতে পারবে।'

ইয্‌যুদ্দীন উত্তর দিতে চাইলে রোজি খাতুন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'আমি আপনাকে শুধু এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করেছি যে, নূরুদ্দীন জঙ্গী যে কাজ অসমাপ্ত রেখে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন; আমি, সালাহুদ্দীন আইউবী আর আপনি মিলে কাজটা সমাপ্ত করবো। তার জন্য এখনো যদি আপনার পোষ্যদের মধ্যে আমাদের মিশন বিরোধী কেউ থেকে থাকে, তাদের নির্মূল করা এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই ভূখণ্ড থেকে খৃস্টানদের উৎখাত করা জরুরি।'

'তোমার কি সন্দেহ আছে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর দলভুক্ত নই?' ইয্‌যুদ্দীন বললেন।

'আপনি কি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবেন, আমার পুত্র এই মহলের উপর খৃস্টানদের যে প্রভাব জন্ম দিয়ে গেছে, সব নির্মূল হয়ে গেছে?'– রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন– 'আপনার সকল আমীর ও সালার কি বাগদাদের খেলাফতের অনুগত?'

'এখানে তুমি আমার স্ত্রী হয়ে এসেছো– দূত হয়ে নয়।' ইয্‌যুদ্দীন খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন।

'আমি এখানে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, তা আপনাকে ব্যক্ত করেছি'– রোজি খাতুন বললেন– 'আমি আমার পেটে আপনার সন্তান ধারণ করতে আর শুধু স্ত্রী হয়ে এই কক্ষে আবদ্ধ থাকতে আসিনি। আমি

মহলের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে এবং হাল্‌ব খৃস্টানদের অপচ্ছায়া থেকে নিরাপদ আছি কিনা জানতে চাই। যদি না থাকে, তাহলে নগরকে নিরাপদ বানাতে হবে। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

'আমি তোমাকে আরেকবার বলছি'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'আমার কাজে তুমি কোন বাঁধার সৃষ্টি করো না। তুমি আমার স্ত্রী। স্ত্রীর মর্যাদা নিয়েই থাকো। যদি মুক্ত হতে চেষ্টা করো, তাহলে বাইরে গিয়ে ঘুরে বেড়ানোর যে অনুমতি আমি তোমাকে দিয়েছি, সেটাও প্রত্যাহার করে নেবো।'

'আমি যদি আপনার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করি, তাহলে?'

'তাহলে তুমি এই কক্ষে বন্দী হয়ে থাকবে'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'তালাক পাবে না। আমি তোমাকে তালাক দেবো না।' বলেই ইয্‌যুদ্দীন বেরিয়ে যান।

'আপনি ভুল করেছেন'– খাদেমা রোজি খাতুনকে বললো। এতোক্ষণ পেছন দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে ইয্‌যুদ্দীন ও রোজি খাতুনের কথোপকথন শুনছিলো খাদেমা। ইয্‌যুদ্দীন বেরিয়ে যাওয়ার পর খাদেমা পেছন দরজায় ভেতরে ঢুকে পড়ে।

খাদেমা বললো– 'আপনি যদি হটকারিতা দেখান, তাহলে লোকটা সত্যি সত্যিই আপনাকে এমন এক কারাগারে নিক্ষেপ করবে, যা হবে স্বাধীনতা; কিন্তু কয়েদ থেকে নিকৃষ্ট। আপনি মনিবের মনোভাব নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন। এখন আর তার সঙ্গে এ ধারায় কথা বলবেন না। তার সামনে হাসি-খুশি থাকবেন এবং বাহ্যত অনুভূতিহীন হয়ে যাবেন। আপনি যে ইচ্ছা ও স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন, আমরা তা পূরণ করবো। মনিব আপনাকে বাইরে বের হয়ে ঘোড়াগাড়িতে চলে বেড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন শুনে আমার আনন্দ লাগছে। আমি আপনাকে আমাদের কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবো। আর ইসহাক তুর্কি যদি এসে পড়ে, তার সঙ্গেও সাক্ষাতের সুযোগ করে দেবো।'

কে যেনো আস্তে করে দরজাটা ঠেলা দেয়। উভয়ে চাতক নয়নে দরজার দিকে তাকায়। আগন্তুক রোজি খাতুনের কন্যা শামসুন্নিসা। মেয়েটা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। ঠোঁটে মুচকি হাসি। কিন্তু চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। ঠোঁটের হাসি ভেসে যাচ্ছে চোখের পানিতে। রোজি খাতুন উঠে এগিয়ে এসে মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন। মা-মেয়ে দু'জনই কাঁদছেন।

হেঁচকি শোনা যাচ্ছে উভয়ের। খাদেমা বাইরে বেরিয়ে যায়। বেশ সময় ধরে দু'জনে আল-মালিকুস সারিহ'র কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন।

'তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে?' রোজি খাতুন বললেন।

'চাচাজান (ইয্যুদ্দীন) আমাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেননি।'

'কী কারণে সাক্ষাৎ করতে দেননি, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'করেছিলাম'– শামসুন্নিসা উত্তর দেয়– 'তিনি স্পষ্ট কোন উত্তর দেননি। এইমাত্র বললেন, যাও মায়ের সঙ্গে দেখা করো। বলেছেন, তিনি অনেক ব্যস্ত থাকেন, তাই আমাকে বেশি বেশি সময় দিতে বলেছেন।

'একথা কি বলেননি যে, মায়ের উপর দৃষ্টি রাখো আর আমাকে রিপোর্ট করো, তার কাছে কারা আসে এবং কী কী কথা হয়?' রোজি খাতুন বললেন।

'বলেছেন'– শামসুন্নিসা সরল মনে উত্তর দেয়– 'তিনি এমন কিছু কথাও বলেছেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। আমি তাকে বলেছি, ঠিক আছে বলবো। তিনি বলেছেন, তোমার মা খুব জেদি, সন্দেহপ্রবণ এবং ঝগড়াটে মনে হচ্ছে। তাকে বলবে, আমি খুব ব্যস্ত ও পেরেশান থাকি।'

'শোনো মেয়ে'– রোজি খাতুন বললেন– 'তুমি বড় হয়েছো। সরল-সিধা মন ত্যাগ করতে হবে। আমি বলছি না এখনই তোমার বিয়ে হওয়া দরকার। মুজাহিদদের মেয়েরা হাতে রক্তের মেহেদী ব্যবহার করে। জীবন্ত জাতির মেয়েদের পালকি কমই বহন করা হয়। যুদ্ধের ময়দান থেকে তাদের লাশ বহন করা হয়ে থাকে। তোমার দুর্ভাগ্য হলো, তুমি তোমার ভাই এবং তার উপদেষ্টাদের ছায়ায় লালিত হয়ে বড় হয়েছো। এরা সবাই গাদ্দার। তোমার ভাইও গাদ্দার ছিলো। তুমি তোমার ভাইয়ের বাহিনীকে তোমার পিতার বাহিনী এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখেছো। তোমার ভাই– আমি যাকে পুত্র বলতে লজ্জাবোধ করতাম– ক্রুসেডারদের বন্ধু ছিলো। তাদের বন্ধু, যারা তোমার ধর্মের শত্রু। তোমার পিতা সারাটা জীবন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।'

'ভাইয়া বলতেন, খৃস্টানরা খুব ভালো মানুষ'– শামসুন্নিসা বললো– 'তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে কথা বলতেন।'

রোজি খাতুন কন্যা শামসুন্নিসাকে খৃস্টানদের চক্রান্ত-পরিকল্পনার কথা অবহিত করে বললেন– 'ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুতায় তারা

এতো কট্টর যে, তাদের বন্ধুত্বের মধ্যেও শত্রুতা থাকে।' রোজি খাতুন বলে যাচ্ছেন আর শামসুন্নিসার চোখ খুলে যাচ্ছে। মায়ের মুখনিসৃত প্রতিটি শব্দ ও বাক্য তার মনের পর্দা খুলে দিচ্ছে। মায়ের মমতামিশ্রিত কথাগুলো মেয়ের মনে গেথে যাচ্ছে।

'মুসলমানের কোন বন্ধু নেই'– রোজি খাতুন বললেন– 'জগতের প্রতিটি বেঈমান জাতি মুসলমানের শত্রু। আর তাদের শত্রুতার সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর পন্থা বন্ধুত্ব। খৃস্টানরা হাল্‌ব, মসুল, হাররানের আমীরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে আমাদের জাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। তোমার ভাই তাদের হাতের পুতুল ছিলো। উম্মতের ঐক্য বিনষ্ট করে জাতিকে বিভক্ত করা ছিলো তার মহা-অপরাধ। কেননা, এই বিভক্তি জাতির এক সদস্য দিয়ে অপর সদস্যকে খুন করায়। কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে কাফেরদের মোকাবেলায় সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকো। আমরা ছিলামও তাই। কিন্তু কাফেররা বিলাসিতার উপকরণ আর নারীদের ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের সেই দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। শয়তানের কাজে যাদুর ক্রিয়া থাকে। নারী, মদ, স্বর্ণমুদ্রা ও ক্ষমতার লোভ মানুষকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে রাখে। আমাদের বিপক্ষে শয়তানের এ কাজটা খৃস্টানরা করছে।'

'এসব আমি এই মহলে নিজ চোখে দেখেছি'– শামসুন্নিসা বললো– 'আমি তখন ছোট ছিলাম। কিছুই বুঝতাম না। ভাইয়া যখন আমাকে এজাজ দুর্গ ভিক্ষা চাওয়ার জন্য সুলতান আইউবীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তখন আমি হেসে-খেলে এখানকার সালারদের সঙ্গে সুলতানের নিকট গিয়েছিলাম। কেউ আমাকে বলেনি, এসব কী ঘটছে। আমার জানা ছিলো না, এটা গৃহযুদ্ধ, যা মূলত খৃস্টানদের কারসাজি। আমি কিছুই বুঝতাম না। আমার কিছু জানা ছিলো না মা! বলুন মা বলুন।'

'মনোযোগ দিয়ে শোনো'– রোজি খাতুনের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে– 'এই মহলে এখনো শয়তানের রাজত্ব চলছে। আমি এখন বুঝতে পারছি, ইয়ুদ্দীন বিয়ে করে আমাকে স্ত্রী নয়– কয়েদী বানিয়েছে। অথচ আমি এই বিয়েতে শুধু এ জন্যই রাজি হয়েছিলাম যে, আমরা সুলতান আইউবীর বিরোধী যুদ্ধের সকল সম্ভাবনাকে দূর করে জাতির মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করবো এবং খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বো। কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমি ধোঁকায়

পড়েছি, যেটি কোন সাধারণ ধোঁকা নয়। তথাপি আমি আমার প্রত্যয়-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবোই। আর এ কাজে তোমার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।'

'বলুন আম্মা, আমাকে কী করতে হবে'– শামসুন্নিসা বললো– 'আপনি এই প্রথমবার ধোঁকা খেয়েছেন আর আমি এই প্রথমবারের মতো বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হলাম। আমি ধোঁকা আর প্রতারণার মধ্যেই এতোদিন বড় হয়েছি। বলুন, আমার এখন করণীয় কী?'

'গুপ্তচরবৃত্তি।' রোজি খাতুন মেয়েকে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দিতে শুরু করেন।

শামসুন্নিসা যখন মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে, তখন ছিলো বেপরোয়া ও উদাসীন মেয়ে। আর যখন বের হলো, তখন সে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী এক মুজাহিদ নারী। তার ব্যক্তিসত্তা ও ভাবনার জগতে এসেছে বিরাট বিপ্লব।

'আপনাকে কে বললো, আমার মা ঝগড়াটে ও সন্দেহপ্রবণ'– শামসুন্নিসা ইয়্যুদ্দীনকে বললো– 'আপনি তো জানেন তার জীবনটা কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তো আপনাকেও আমার পিতা নূরুদ্দীন জঙ্গীর ন্যায় বিখ্যাত যোদ্ধা ও মুজাহিদে ইসলাম বানাতে চাচ্ছেন।'

'তোমার মা আমার কাজে হস্তক্ষেপ করতে চায়'– ইয়্যুদ্দীন বললেন– 'তার সন্দেহ, আমরা খৃস্টানদের বন্ধু।'

'আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করতে আমি তাকে বারণ করেছি'– শামসুন্নিসা বললো– 'আপনি খৃস্টানদের সুহৃদ এই সন্দেহও তার থেকে দূর করে দিয়েছি। আপনি তাকে ভুল বুঝবেন না। আর তার উপর অপ্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করবেন না।'

'আমি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিনি'– ইয়্যুদ্দীন বললেন– 'ঘোড়াগাড়ি সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকে, তোমরা যখন খুশি ভ্রমণ করতে পারো।'

ইয়্যুদ্দীন শামসুন্নিসার রিপোর্ট সত্য বলে মেনে নেয়। কথোপকথন হচ্ছে ইয়্যুদ্দীনের দফতরে। আলাপ শেষে শামসুন্নিসা বেরিয়ে এসে দেখে, আমের ইবনে ওসমান দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার বয়স এখনো ত্রিশের নীচে। সুঠাম আকর্ষণীয় এক যুবক। তীরন্দাজ ও তরবারী চালনায় তার জুড়ি নেই। মেধাও খুব প্রখর। আল-মালিকুস সালিহ'র

বিশেষ রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার ছিলো। বাসগৃহ মহলেরই ভেতরে। অল্প ক'দিন হলো শামসুন্নিসাকে ভালো লাগতে শুরু করেছে তার। সহজ-সরল রূপসী মেয়ে শামসুন্নিসা। পিতার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে কেউ কোনদিন তাকে ধারণা দিতে হয়নি। মহলের একজন বিশ্বস্ত মেয়ে হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিলো। ভাইয়ের মৃত্যুর পর সরল মেয়ে মনে করে ইয্‌যুদ্দীন তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সুযোগে আমের ইবনে ওসমানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হতো।

এখন শামসুন্নিসা ষোল বছরের যুবতী। সে যুগের মেয়েরা উচ্চতা ও আকার-গঠনে বয়সের চেয়ে বড় মনে হতো এবং অনেকে এই বয়সেই দু'একটি সন্তানের মা হয়ে যেতো। শামসুন্নিসা শাসক পরিবারের কন্যা। অর্থাৎ রাজকন্যা। আল্লাহ তাকে যে রূপ দান করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় মনে হতো তাকে। তার এই রূপসাগরে সাঁতার কাটতে শুরু করেছে আমের ইবনে ওসমান। তাদের মাঝে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। তবে এই প্রেম ছিলো পবিত্র। যার তীব্রতা দু'জনকে গভীরভাবে একে অপরের অনুরক্ত বানিয়ে রেখেছিলো। পরস্পর বিয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে তারা। তবে সমস্যা হচ্ছে, আমের ইবনে ওসমান শামসুন্নিসার বংশের একজন নিম্ন পর্যায়ের চাকর। তাকে স্ত্রীরূপে লাভ করার স্বপ্ন তার পক্ষে ছিলো কল্পনা মাত্র। তথাপি শামসুন্নিসাকে পাওয়ার আশায় বাবা-মার পছন্দ করা মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে।

শামসুন্নিসা যখন ইয্‌যুদ্দীনের দফতর থেকে বের হয়, তখন আমের ইবনে ওসমান বাইরে দণ্ডায়মান। শামসুন্নিসা তাকে দেখে একটা মুচকি হাসি দিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে ইশারা করে চলে যায়। আমের তার ইঙ্গিতের মর্ম ভালোভাবে বুঝে। সে মাথ দুলিয়ে জবাব দেয়– যাও, আসছি।

জায়গাটা গাছপালা, লতাপাতায় সুশোভিত। উপরটা রাতের আঁধারের চাদরে ঢাকা। মহলের জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ ছেড়ে আমের ইবনে ওসমান ও শামসুন্নিসা এখানে উপবিষ্ট। যৌবনদীপ্ত উন্মাতাল ভালেবাসার মাদকতায় আচ্ছন্ন দু'জন।

'আমি আজ মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি'– শামসুন্নিসা বললো– 'এখন থেকে তাঁর সঙ্গে থাকবো।'

'তোমার মা-ও তো রাজ পরিবারের মেয়ে'– আমের বললো– 'তিনি তোমাকে রাজপুত্র ছাড়া কারো সঙ্গে বিয়ে দেবেন না নিশ্চয়ই।'

'না'– শামসুন্নিসা বললো– 'মা রাজ পরিবারের মেয়ে বটে: কিন্তু তিনি সেই তাঁবুকে বেশি পছন্দ করেন, যেটি রণাঙ্গনের একেবারে সন্নিকটে স্থাপিত হয়। আমাকে তিনি সৈনিক বানাতে চান।'

'আমি কি আশা করতে পারি, তুমি তাঁর সঙ্গে আমার ব্যাপারে কথা বলবে এবং তিনি বিষয়টা মেনে নেবেন?' আমের জিজ্ঞেস করে।

'আমার উপর তিনি যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, আমি যদি তা পালন করতে সক্ষম হই, তাহলে তিনি অবশ্যই আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন'– শামসুন্নিসা উত্তর দেয়– 'তাঁর এই বাসনা পূরণে তোমাকেও দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

'কেন, তিনি আমার নাম নিয়ে কিছু বলেছেন কি?' আমের জিজ্ঞাসা করে।

'না'– শামসুন্নিসা উত্তর দেয়– 'আমাকে তিনি তার উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, যার বাস্তবায়নে তার আমাকে প্রয়োজন। আর আমার প্রয়োজন তোমাকে। কিন্তু তার আগে শপথ নিতে হবে, আমাকে সাহায্য করো আর না করো, আমাদের তৎপরতার কথা গোপন রাখবে।'

'যদি শপথ না নেই, তাহলে?' আমের মুচকি হেসে শামসুন্নিসাকে টেনে কাছে এনে বসায়।

শামসুন্নিসা দূরে সরে যায়। প্রেম-পিপাসায় মাতাল আমের ইবনে ওসমান। শামসুন্নিসা বললো– 'আমি আগেও ওয়াদা করেছি এবং আজো প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি, আমার যদি বিয়ে হয় তোমার সঙ্গেই হবে। কিন্তু তার আগে আম্মা আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেটি সম্পাদন করতে হবে।'

আমের ইবনে ওসমান এই ভেবে বিস্মিত হয় যে, শামসুন্নিসাকে ইতিপূর্বে কখনো এতো কর্তব্যপরায়ণ ও আবেগপ্রবণ দেখা যায়নি। সে মুখে বিস্ময়ভাব টেনে বললো– 'তোমার হৃদয়ে আমাকে ভালোবাসার এই কি নমুনা যে, তুমি আমার থেকে শপথ নেয়া প্রয়োজন মনে করছো?'

'কাজটা এমনই যে, শপথ নেয়া জরুরি'– শামসুন্নিসা উত্তর দেয়– 'আমি তো আম্মার আদেশ পালনার্থে জীবন কুরবান করতেও প্রস্তুতি আছি। তখন বোধ হয় আমার সঙ্গ দেয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।'

'তোমার ভালোবাসার খাতিরে আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।'

'না'– শামসুন্নিসা বললো– 'ভালোবাসার খাতিরে নয়, জীবন দিতে হবে ইসলামের মর্যাদার খাতিরে। তবে সেই ইসলাম নয়, যে ইসলাম আমরা এই মহলে দেখতে পাচ্ছি। আমি সেই ইসলামের কথা বলছি, যার খাতিরে আমার পিতা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং সুলতান আইউবীও তারই জন্য লড়াই করছেন।'

'আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, এ কাজে আমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, জীবন বাজি রেখেও তা পালন করবো'– আমের ইবনে ওসমান শামসুন্নিসার ডান হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে বললো– 'আমি যদি এই শপথ ভঙ্গ করি, তাহলে আমাকে জীবনে মেরে ফেলো এবং আমার লাশটা কুকুর-শিয়ালকে খেতে দিও। এবার বলো, আমাকে কী করতে হবে?'

'গোয়েন্দাগিরি'– শামসুন্নিসা বললো– 'সুলতান আইউবী মিসরে আছেন। তিনি এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত যে, তিনি আমার ভাই আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ না করার যে চুক্তি করেছিলেন, তার মৃত্যুর পরও তা বহাল আছে। কিন্তু তুমি হয়তো অবগত আছো, এই চুক্তি থাকা সত্ত্বেও হালবের শাসন ক্ষমতা ক্রুসেডারদের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সুলতান আইউবী ইয্‌যুদ্দীনকে বন্ধু মনে করলেও আমার মা অন্য আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।'

'মনিবের সাথে তোমার মায়ের বিয়ের পর এখন তো কোন শঙ্কা থাকার কথা নয়।' আমের বললো।

'আসল বিপদ তো সেখান থেকেই শুরু'– শামসুন্নিসা বললো– 'এই বিবাহ মূলত বন্দী জীবন, আমার মাকে যার শিকলে বাঁধা হয়েছে। ইয্‌যুদ্দীন বিবাহটা এই উদ্দেশ্যে করেছেন, যাতে দামেশ্‌কবাসীকে সঠিক পথ দেখানোর মতো কেউ না থাকে। আমাদেরকে এই মহলের সকল গোপন তথ্য সংগ্রহ করে কায়রো পৌঁছাতে হবে। এও জানতে হবে, খৃস্টানদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা কী? তারা কি পুনরায় আমাদের বাহিনীকে গৃহযুদ্ধের আগুনে পোড়াতে চায়, নাকি অন্য কোন সামরিক পদক্ষেপ নিতে চায়। তুমি এমন এক অবস্থানে আছো, যেখান থেকে অনেক কিছুই দেখতে পাও। কারণ, তুমি ইয্‌যুদ্দীনের খাস রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি'– আমের বললো– 'তুমি ঠিকই বলেছো, আমি এমন এক অবস্থানে আছি, যেখান থেকে অনেক কিছু

দেখি। শোনে শামসী! আমি এযাবত যা কিছু দেখে আসছি, বিষয়গুলো কখনোই গভীরভাবে চিন্তা করিনি, যার ফলে মুজাহিদ থেকে চাকরে পরিণত হয়েছি। সৈনিক যখন মুজাহিদ থেকে বেতনভোগী কর্মচারিতে পরিণত হয়, তখন এমনই ঘটে। আমাদের মহলে এখন তাই ঘটছে। সৈনিক যখন চাকরি নেয়, তখন সে শত্রুর রক্ত ঝারানোর পরিবর্তে চাটুকারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, যাতে মনিব তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। খুন আর তোষামোদে সেই পার্থক্য, যে পার্থক্য জয় আর পরাজয়ের মাঝে। আমাকে কখনো কেউ বলেনি, একজন সৈনিকের কর্তব্য শুধু বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করাই নয়, ভেতরের সমস্যার মোকাবেলা করাও তার দায়িত্ব। কেউ আমাকে বলেনি, সৈনিকের এটাও কর্তব্য যে, দেশ ও জাতির জন্য যদি শাসকের পক্ষ থেকে সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে তার বুকটা তীরের আঘাতে ঝাঝরা করে দুর্গের বাইরে ছুড়ে ফেলতে হবে। তুমি আমাকে দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছো। বলো, কাউকে খুন কতে হবে নাকি ভেতরের গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করলেই চলবে?'

'দুটোই করতে হবে'– শামসুন্নিসা বললো– 'তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি কোন গাদ্দারকে খতম করতে হয় পরোয়া করবে না।'

'শোনো শামসী'– আমের ইবনে ওসমান বললো– 'এখন আমি সরকারি কর্মচারি হিসেবে নয় একজন মুজাহিদ হিসেবে কথা বলবো। হাল্‌বের শাসকমণ্ডলী এবং কতিপয় সালারের উপর আস্থা রাখা যায় না। ইয্‌যুদ্দীন যদি নিষ্ঠাবান এবং সত্যমনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বন্ধু হতেন, তবুও তিনি হাল্‌বের বাহিনীকে মিসরের সহযোগি বানাতে পারবেন না। তার প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপদেষ্টা ও উজির-মন্ত্রীবর্গের ঈমান খৃস্টানরা ক্রয় করে নিয়েছে। তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তারা ইয্‌যুদ্দীনকে এমনভাবে পেরেশান করতে শুরু করেছে যে, কারণে-অকারণে তারা কোষাগারের অর্থে হাত দিতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার দ্রুত শূন্য হয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা, এটি একটি ষড়যন্ত্র। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোষাগার শূন্য করে ইয্‌যুদ্দীনকে বাধ্য করা যেনো তিনি খৃস্টানদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আর ইয্‌যুদ্দীনও যে যা চাইছেন, দিয়ে দিচ্ছেন।'

'তার অর্থ হচ্ছে, ইয্‌যুদ্দীন দুর্বল শাসক।' শামসুন্নিসা বললো।

'তাঁর দুর্বলতা হলো, তিনি ক্ষমতার মসনদ ছাড়তে চাচ্ছেন না'–

আমের ইবনে ওসমান বললো– 'আমি তার যেসব বক্তব্য শুনেছি তাতে প্রমাণিত হয়, ক্ষমতা অটুট রাখতে তিনি খৃস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছেন। আমি তার এবং তার উপদেষ্টাদের কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুনবো আর তোমাকে জানাতে থাকবো।'

'এও মাথায় রাখতে হবে যে, এখানে খৃস্টানদের গুপ্তচর তৎপর রয়েছে'– শামসুন্নিসা বললো– 'আর আমাদের গোয়েন্দারাও কাজ করছে। তোমার সাথে হয়তো তাদের সাক্ষাৎও ঘটবে।' শামসুন্নিসা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে– 'তোমার সুদানী পরীটা কি হালে আছে, খবর-টবর কি রাখে?'

'রাখে'– আমের জবাব দেয়– 'পরশু তার সাথে দেখা হলে সে কেঁদে ফেললো। বললো একটিবারের জন্য হলেও তার কক্ষে যেনো যাই। শোনো শামসী! মেয়েটাকে আমার ভয় করছে। তার জালে আটকা পড়লে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হবে না। আমি তাকে এ জন্য ভয় করছি না যে, মেয়েটা রূপসী। ভয় হলো, মেয়েটা হাল্‌বের গভর্নর ইয়্যুদ্দীনের হেরেমের অধিপতি। তার নাম আনুশি। মহলের লোকেরা তাকে 'সুদানী পরী' বলে ডাকে। ইয়্যুদ্দীন কিংবা তার কোন আমীর-উজির যদি জেনে ফেলে আমাকে সে ভালোবাসে, তাহলে মাশুল দিতে হবে আমাকে। আমার ভয়, আমি তার কথায় রাজি না হলে সে হয়তো মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে জেল খাটাবে।'

'সে বোধ হয় তোমার-আমার ভালোবাসার কথা জানে না, না?' শামসুন্নিসা জিজ্ঞেস করে।

'যেদিন জানতে পারবে, সেই দিনটা তোমার-আমার জীবনের শেষ দিন হবে'– আমের জবাব দেয়– 'তোমাকে ক্ষমা করা হলেও, আমি ক্ষমা পাবো না।'

'আনুশি মূলত খৃস্টানদের প্রেরিত উপহার। মেয়েটি হাল্‌বে এসে পৌঁছার পরপরই আল-মালিকুস সালিহ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মারা যান। ইয়্যুদ্দীন এসে হাল্‌বের শাসন ক্ষমতা হাতে নিতেই খৃস্টানরা আনুশিকে তার খেদমতে পেশ করে। সেই সঙ্গে ইয়্যুদ্দীন রোজি খাতুনকেও বিয়ে করে ঘরে তোলেন। সে যুগের নিয়ম ছিলো, বিবাহিত স্ত্রী ও হেরেমের মেয়েরা আলাদা থাকতো। ইহুদী-খৃস্টানরা তাদের এই রীতিকে পাকাপোক্ত করার জন্য মেয়ে উপহার দিতো। তারা এভাবে

উপহারের নামে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী চর প্রেরণ করতে থাকে।'

আনুশি তেমনি এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়ে। সে ইয্‌যুদ্দীনের ভোজসভায় মদ পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করছে। নিজেও মদপান করে। সে হাল্‌বের এমন দু'জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে নিজের প্রতারণার ফাঁদে আটক করেছিলো, যাদের হাতে ছিলো হাল্‌বের অস্তিত্ব। মেয়েটি ইয্‌যুদ্দীনকে কব্জা করে নিয়েছিলো। আমের ইবনে ওসমান ইয্‌যুদ্দীনের কাছে থাকতো। কেননা, সে ছিলো তার ব্যক্তিগত রক্ষী। তার দৃষ্টি ছিলো ঈগলের ন্যায় প্রখর ও দূরদর্শী। আনুশি দেখলো, লোকটি যেমন সুদর্শন, তেমনি স্মার্ট।

সে আমেরকে ভালোবেসে ফেলে। আমেরের সঙ্গে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করে। কিন্তু আমের তাতে সাড়া দেয়নি। কারণ, তার জানা ছিলো, হেরেমের হীরাটার সঙ্গে যদি কেউ কথা বলতেও দেখে, তাহলে তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। কিন্তু আনুশি তার পিছু ছাড়লো না।

'আমি এই মহলের একজন কর্মচারি মাত্র'– আমের একদিন মেয়েটিকে বললো– 'তোমার অন্তরে যদি আমার সত্যিকার ভালোবাসা থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দয়া করো, আমার থেকে দূরে থাকো।'

'তোমার প্রতি চোখ তুলে তাকাবার সাহস কেউ পাবে না'– আনুশি বললো– 'একটিবারের জন্য আমার কক্ষে আসো।'

ঐ সময় আমের ও শামসুন্নিসার গোপন অভিসার চলছিলো।

সে সময়কার ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'ইয্‌যুদ্দীন অনুভব করেন, মসুল ও সিরিয়ার শাসকদের নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবেন না। তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে প্রচণ্ড ভয় করতেন। তার অধীন আমীর-উজীরগণ তার নিকট যখন-তখন কারণে-অকারণে এতো বেশি অর্থ দাবি করতে শুরু করে, যা দিতে তিনি ব্যর্থ হন। কেননা, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ততো সম্পদ ছিলো না। আয়ের উৎসও ছিলো সীমিত।'

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ আরো লিখেছেন–

'ইয্‌যুদ্দীনের ভয় ছিলো, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অবশ্যই হাল্‌ব দখল করে নেবেন। তিনি আইউবীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করা থেকে

বিরত থাকতেন। তিনি তার এক সুযোগ্য ও দুঃসাহসী সালার মুজাফফর উদ্দীন কাকবুরীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। এই পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত ছিলো সাত স্তর মাটির নীচে লুকানো এক গোপন রহস্য। মসুলের গভর্নর ছিলেন ইয্‌যুদ্দীনের ভাই ইমাদুদ্দীন, যিনি ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ঘোর বিরোধী। ইয্‌যুদ্দীন মসুলের শাসনক্ষমতা হাতে নেন আর ইমাদুদ্দীন হাল্‌ব এসে হাল্‌বের গভর্নর হয়ে যান। ক্ষমতার এই হাতবদল ছিলো উভয় নগরীর বাসিন্দাদের জন্য একটি রহস্যজনক ঘটনা।'

কতিপয় ঐতিহাসিক এই ক্ষমতার রদবদল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। একেকজন একেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে সময়কার কাহিনীকারদের লেখনী থেকে কিছু গোপন বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইয্‌যুদ্দীন যখন মসুলের দুর্গে গমন করেন, তখন রোজি খাতুন ও কন্যা শামসুন্নিসা তার সঙ্গে ছিলেন। তার ব্যক্তিগত রক্ষী বাহিনীও ছিলো, যার কমান্ডার ছিলো আমের ইবনে ওসমান। বিশাল এক বহর ছিলো। বহরে কয়েকটি উটের পাল্কি ছিলো, যেগুলো চারদিক থেকে পর্দাঘেরা ছিলো। রোজি খাতুন ও শামসুন্নিসার উট ছিলো সকলের সামনে। রোজি খাতুনের খাদেমাও সঙ্গে ছিলো। রাতে এক স্থানে অবস্থান করতে হয়েছিলো।

মসুল পৌঁছতে তাড়া ছিলো ইয্‌যুদ্দীনের। সে কারণে কাফেলার জন্য একজন দলনেতা নিযুক্ত করে নিজে অবস্থান না করে কয়েকজন রক্ষী ও দু'তিনজন উপদেষ্টাসহ সফর অব্যাহত রাখেন ইয্‌যুদ্দীন। আমের ইবনে ওসমানকে কাফেলার সঙ্গে রেখে দেয়া হয়। সূর্য অস্ত যাওয়ামাত্র তাঁবু স্থাপন করা হলো। রোজি খাতুনের তাঁবু সেই তাঁবুগুলো থেকে অনেক দূরে স্থাপন করা হলো, যেগুলোতে রাতে হেরেমের মেয়েরা অবস্থান করবে। ইয্‌যুদ্দীন রোজি খাতুন ও শামসুন্নিসাকে হেরেমের তাঁবু থেকে দূরে রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে যান। অবস্থানের জায়গাটা ছিলো সবুজ-শ্যামল বনানীতে সুশোভিত।

রাত। আমের ইবনে ওসমান ঘুরে ঘুরে ছাউনি এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। ভয়ের কোন কারণ ছিলো না। সে সময় কোথাও যুদ্ধ ছিলো না। সুলতান আইউবী মিসরে আছেন। খৃস্টানরা দূরে এক জায়গায় বসে সুলতান আইউবীর পরবর্তী রণ-পরিকল্পনা মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তবু অবস্থানস্থল ও পশুপালের

আশপাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমেরের কর্তব্য। সে হেরেমের তাঁবুগুলো থেকে সামান্য দূরে ঘোরাফেরা করছে। সঙ্গে কেউ নেই। তাঁবু থেকে আরো কিছুটা দূরে চলে যাওয়ার পর সম্মুখে একটি ছায়া দেখতে পায়। ছায়াটার নিকট গিয়ে ঘোড়া থামায়।

'অন্ধকারে এতোদূর থেকে আমি তোমাকে চিনে ফেললাম, আর তুমি কিনা নিকটে এসেও চিনতে পারলে না।' কণ্ঠটা আনুশির।

আমের ইবনে ওসমান কণ্ঠ চিনে বললো– 'এখনো অনেক কাজ করতে হবে। এতো বিস্তৃত তাঁবু অঞ্চল আর এতোগুলো পশুর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না আনুশি।'

আনুশি আমেরের ঘোড়ার সামনে এসে লাগাম ধরে রেখেছিলো। বললো– 'ঘোড়া থেকে নেমে এসো আমের। যে লোকটাকে তোমার ভয় ছিলো, সে মসুল চলে গেছে। এবার নেমে এসো।'

আমের ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। আনুশি তার বাহু ধরে টেনে নিয়ে একটি গাছের আড়ালে গিয়ে বসে। আমের অনুগত পশুটির ন্যায় বসে পড়ে।

'আমের!'– আপ্লুত কণ্ঠে বললো আনুশি– 'আমাকে চরিত্রহীনা ও খারাপ মেয়ে মনে করে তুমি আমার থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছো। আমি জানি, আমার আসল পরিচয় সম্পর্কে তুমি অবহিত। তুমি নিজেকে সাধু ও পবিত্র মনে করছো। যৌবন আর আকর্ষণীয় দেহটার জন্য তোমার বেজায় গর্ব। কিন্তু ভেবে দেখেনি কখনো, এই দেহখানা যে কোন মুহূর্তে লাশে পরিণত হতে পারে। এটা যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ। একদল লোক যুদ্ধের মাঠে প্রাণ নিচ্ছে ও প্রাণ দিচ্ছে। আরেক শ্রেণীর জন্য অনুরূপ ঘটনা ঘটছে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদে– গোপনে। তোমার পরিণতিও এমনটি হতে পারে। নিজের পুরোম্বিত রূপ আর দেহের আকর্ষণটাকে স্থায়ী ভেবো না।'

'তুমি কি আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছো?' আমের বললো।

'না'– আনুশি জবাব দেয়– 'আমি তোমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছি, তুমি যদি মনে করে থাকো আমি তোমার রূপ-যৌবনের জন্য পাগল, তাহলে এ ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। আমার নিজের শরীরটাও ভোগের একটা উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিন্তু আমি দেহ আস্বাদনের প্রতি সম্পূর্ণ অনীহ। মানুষ যতো শক্ত পাথরে পরিণত হোক, হৃদয়টাকে যতো শক্ত পাথর মনে করুক না কেন, হৃদয় কখনো পাথর হয় না।

মানুষের আত্মা মুর্ছা যেতে পারে– মরে না। ভালোবাসা [illegible]য় ও আত্মাকে জীবিত রাখে– যার সম্পর্ক দেহের সঙ্গে নয়। তুমি আমাকে আরো গভীর চোখে নিরীক্ষা করো। আমার ও তার যাদুময়তা দেখো। আমি নিজে পাপ করি এবং অপরকে পাপের প্রতি উৎসাহিত করি। মানুষ আমাকে রাজকন্যা নয়– পরী বলে ডাকে। তোমাদের রাজা ও আমীরগণ আমার পায়ের নীচে তাদের ঈমান ও মাথা রাখতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু আমি এমন একটি পিপাসায় কাতর ছিলাম, যা কখনো অনুভব করতে পারিনি। তোমাকে দেখলাম, ভালো লাগলো। প্রথমবার যখন আমি তোমার কাছে এলাম,তখন আমার উদ্দেশ্য পবিত্র ছিলো না। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে এবং পরে এমনভাবে তাড়িয়ে দিলে যে, আমি বুঝে ফেললাম সেই পিপাসাটা আসলে কী, যেটি আমাকে অস্থির করে রেখেছে। আমি তোমাকে হৃদয়ের গভীর থেকে কামনা করতে শুরু করলাম। এটা তোমার ব্যক্তিত্বের নয়– চরিত্রের ক্রিয়া ছিলো। আর ক্রিয়াটা এমন যে, আমার হৃদয়ে সেই লোকদের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি করে, যারা আমাকে বিলাসিতার খেলনা মনে করতো এবং নিজেদের ঈমান ও জাতীয় মর্যাদাকে আমার হাত থেকে নেয়া মদের পেয়ালায় ডুবিয়ে দিতো।'

আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলে যাচ্ছে আনুশি। চুপচাপ শুনতে থাকে আমের ইবনে ওসমান। কিন্তু মনে তার ভয়, দৃশ্যটা কেউ দেখে ফেললে রেহাই পাওয়া কঠিন হবে। আরো ভয়, শামসুন্নিসা যদি তার সন্ধানে এদিকে এসে পড়ে, তবে তো ভালোবাসাটা খুন হয়ে যাবে। আনমনে শুধু শুনেই যাচ্ছে আনুশির কথা। রূপসী কন্যা আনুশির এমন আবেগময় কথাগুলো তার হৃদয়ে কোনই রেখাপাত করছে না।

'তুমি কি ভয় পাচ্ছো আমের! নাকি তোমার অন্তরটা মরে গেছে?'– আনুশি আমেরের গালে হাতের পরশ বুলিয়ে বললো– 'আমার হৃদয়টা যদি মরে গিয়ে না থাকে, তাহলে আমি মানতেই পারছি না তোমার অন্তর মরে গেছে।'

আনুশি তার মাথাটা আমেরের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে ধরে। তার রেশম কোমল বিক্ষিপ্ত চুলগুলো আমেরের তরুণ গণ্ডদেশ ছুয়ে যেতে শুরু করে। চরিত্র যেমনই হোক, যুবক তো! আমেরের দেহটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। কেমন যেনো একটা তোলপাড়া শুরু হয়ে গেছে তার হৃদয় জগতে। আমের আনুশির চাপা হাসির শব্দ শুনতে পায়। মেয়েটি

হাসতে হাসতে বললো– 'হৃদয়টা জীবিত আছে। ধুক ধুক করছে। আমি তোমার থেকে কিছুই চাই না। তুমি আমার কাছে চাও। হীরা, জহরত, মণিমুক্তা, স্বর্ণমুদ্রা– যা খুশি চাও দেবো।'

'আমার কিছুই প্রয়োজন নেই সুদানী পরী।' আমের বললো।

'আমাকে আনুশি বলো'– মেয়েটি বললো– 'আমাকে যারা সুদানী পরী ডাকে, তাদের অন্তরে ভালোবাসা নেই, তারা পাপিষ্ঠ। তুমি তাদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে, পবিত্র। আমার থেকে ধন-ভাণ্ডার নিয়ে নাও। বিনিময়ে তুমি আমাকে ভালোবাসা দাও।'

আনুশি নিজের চিবুকটা আমেরের চিবুকের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। আমের চমকে ওঠে পেছনে সরে যায়। এখন তার অবস্থাটা পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখিটির মতো। ছটফট করতে শুরু করে দেয় আমের।

'আমার মনে হয়, তোমার অন্তরে অন্য কারো ভালোবাসা আছে'– আনুশি বললো– 'আমার যাদুতে কখনো কেউ এভাবে ছটফট করে না। তুমি বলে, কোন্ শক্তি তোমাকে আমার প্রতি ভালোবাসার বাঁধার সৃষ্টি করছে।'

আনুশি দাঁত কড়মড় করে বললো– 'তুমি এটুকুও বুঝছো না যে, একটা গুনাহগার মেয়ে তোমার থেকে পবিত্র ভালোবাসা প্রার্থনা করছে। হতে পারে সে পাপ থেকে তাওবা করে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আশ্চর্য পুরুষ বটে তুমি। শুনে রাখো হতভাগা, তুমি এমন একটি মেয়েকে তাড়িয়ে দিচ্ছো, দু'চারটি দেশের সিংহাসন উল্টে দেয়ার ক্ষমতা যার আছে। তুমি এমন একটি মেয়েকে রুষ্ট করছো, যে ইচ্ছা করলে ভাইকে ভাইয়ের হাতে খুন করাতে পারে। আমার সম্মুখে তোমার একটা পোকার চেয়ে বেশী মর্যাদা নেই।'

'তাহলে আমাকে পিষে ফেলো'– বললো আমের– 'আমি তোমার যোগ্য নই।'

আমের উঠে দাঁড়ায়।

'আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না আমের'– আনুশি আমেরের উভয় হাত নিজের হাতে নিয়ে বললো– 'তুমি শুধু আমার পাশে বসে থাকো।'

আমের কথা না বাড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে।

আমের ইবনে ওসমানের ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটছে। আমেরের মাথাটা অবনত। নাকে আনুশির চুলের ঘ্রাণ আর গালে মেয়েটির হাতের কোমল ছোঁয়া এখনো অনুভব করছে। ভাবে, মেয়েটি যদি অন্ধকারে

নির্জনে তাকে ধরে বসে, তাহলে শামসুন্নিসার সাথে কৃত শপথ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তার কাছে আর ঠাঁই মিলবে না। আমের ভাবনার মোড় শামসুন্নিসার দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তার মনে পড়ে যায়, সন্ধ্যার তাঁবু স্থাপনের সময় স্বল্প সময়ের জন্য সে শামসুন্নিসার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। দু'জনে সাক্ষাতের সময় ও স্থান ঠিক করে এসেছিলো। সে ওদিকেই যাচ্ছিলো; কিন্তু পথে আনুশি পথরোধ করে দাঁড়ায়।

ঘোড়ার পিঠে বসে পেছনের দিকে তাকায় আমের। অন্ধকারে আনুশিকে আর দেখা যাচ্ছে না। পথের মোড় ঘুরে আমের সেই জায়গায় এসে পৌঁছে, যেখানে শামসুন্নিসার আসার কথা ছিলো। আমের যেভাবে আনুশির ছায়া দেখেছিলো, তেমনি শামসুন্নিসার ছায়াও দেখতে পায়। ছায়াটা ঘোড়ার দিকে এগিয়ে আসে। আমের ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে।

'এত্তোক্ষণ কোথায় ছিলে?'– শামসুন্নিসা প্রশ্ন করে– 'অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করছি।'

'কী করেছি, কোথায় থাকতে পারি, তুমি তো সব জানো'– আমের মিথ্যা বলে– 'এদিকেই তো আসছিলাম। পথে এক স্থানে থামতে হলো। তাতেই দেরি হয়ে গেলো।'

'নিজেদের লোকদের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে'– শামসুন্নিসা বললো– 'তারা প্রত্যেকে সতর্ক। তাদের প্রতি কারো সন্দেহ জাগবে না।'

শামসুন্নিসা সেই লোকদের কথা বলছে, যারা হালবে সুলতান আইউবী ও রোজি খাতুনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছে। যারা মহলে কর্মচারি ছিলো, এই বহরে তারা একই পদে দায়িত্ব পালন করছে। রোজি খাতুনের খাদেমা শামসুন্নিসা ও আমের ইবনে ওসমানকে তাদের চিনিয়ে দিয়েছে।

'এসো, এখানে কিছুক্ষণ বসি।' শামসুন্নিসা আমেরের কোমর জড়িয়ে ধরে বললো।

দু'জনে দু'জনার হয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে আমের ইবনে ওসমান ও শামসুন্নিসা। শামসুন্নিসা এক পা অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। নিজের নাকটা আমেরের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে শুকতে শুকতে তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বলে ওঠে– 'তুমি কোথায় ছিলে? কার কাছে ছিলে?'

'আমি পশগুলো দেখাশোনা করে আসছিলাম।' আমের উত্তর দেয়।

'পশুরা সুগন্ধি ব্যবহার করছে কবে থেকে'– শামসুন্নিসা চাপা অথচ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'তোমাকে তো কোনদিন সুগন্ধি ব্যবহার করতে দেখিনি!'

আমের চুপসে যায়। তার মুখে কোন উত্তর নেই। শামসুন্নিসা কেইসটা ঠিকই ধরেছে। বলতে থাকে– 'রূপসী ডাইনীটা তোমাকে পেয়ে বসেছে। তুমি ফাঁদে আটকে গেছো।'

'এখনো আটকাতে পারেনি'– আমের বললো– 'পথে হঠাৎ দেখা হয় আনুশির সাথে। বিষয়টা তোমাকে জানাতে চাচ্ছিলাম না। সন্দেহের কোন কারণ নেই। আমি এতোটা আনাড়ি নই। আমার বক্ষে যে ঘ্রাণ পেয়েছো, সে আনুশির তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বুকের ভেতরটা শুকে দেখার চেষ্টা করো।' আমেরের কণ্ঠে ভীতির হাল্কা একটা কম্পন অনুভব করে শামসুন্নিসা। আমের বলতে থাকে– 'আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন শামসী। আমি কোন আমীর-শাসক কিংবা সালার নই। আমি একজন সাধারণ কর্মচারি মাত্র। আনুশি আমাকে অতি সহজে প্রতিশোধের নিশানা বানাতে পারে।'

'মনে হচ্ছে, মেয়েটা আজ তোমাকে বেশি পেরেশান করেছে।' শামসুন্নিসা বললো।

'খুব বেশী'– আমের জবাব দেয়– 'মেয়েটা আজ নিজে থেকে বলেছে, সে পাপিষ্ঠা এবং চরিত্রহীনা। বেহায়াপনা ছড়ানো এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধানোর জন্যই সে এসেছে। আমার থেকে সে পবিত্র ভালোবাসার বিনীত আবেদন জানিয়ে বলেছে, তার বিনিময়ে আমি যা চাই তাই সে দেবে। আমি বড় কষ্টে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এসেছি। শামসী! মেয়েটা যদি তার সমুদয় সম্পদও আমার সামনে হাজির করে, তবুও আমি তোমাকে ধোঁকা দিতে পারবো না।'

'তারপরও তাকে ধোঁকা দাও'– শামসুন্নিসা বললো– 'তাকে সেই ভালোবাসা দাও, যা সে কামনা করছে। বিনিময়ে সেই তথ্য নাও, যা আমাদের প্রয়োজন। এখানে তাকে কী উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে, তা তোমাকে বলে দিয়েছে। তুমি অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। তোমার মহলের গোপন তথ্য প্রয়োজন একথা বলে কাজ আদায় করবে, নাকি কিছু না জানিয়ে কৌশলে তথ্য বের করবে, তা তুমিই ভালো বুঝো।'

'আমি বিষয়টা ভেবেছি'– আমের বললো– 'কিন্তু ভয় পাচ্ছি এ জন্য যে, একদিন হয়তো তুমি আমাকে ভুল বুঝবে।'

'তোমার-আমার ভালোবাসা আমি আল্লাহর উপর সোপর্দ করেছি'– শামসুন্নিসা বললো– 'আম্মার নির্দেশমূলক কথাগুলো আমার আত্মায় গেঁথে আছে। আমার ভালোবাসার মৃত্যু হতে পারে না। হৃদয়ের ভালোবাসাকে আমি সেই মহান লক্ষ্য অর্জনে কুরবান করতে চাই, যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়েছে। আল্লাহর নামে শপথ নেয়ার যদি আমি স্মরণ রাখি, তাহলে কোন ভুল বুঝাবুঝির জন্ম নিতে পারবে না।' শামসুন্নিসা প্রশ্ন করে– 'মেয়েটি কি জানতে পেরেছে তোমার-আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়?'

'তাতো সে বলেনি'– আমের উত্তর দেয়– 'বোধ হয় নিশ্চিত জানে না।'

'একটা কাজের কথা বলি'– শামসুন্নিসা বললো– 'আমরা হাল্‌ব থেকে রওনা হওয়ার কিছু আগে কায়রো থেকে একজন লোক এসেছিলো। সে জানতে চাচ্ছিলো, ইয্‌যুদ্দীনের উদ্দেশ্য এবং খৃস্টানদের পরিকল্পনা কী। আমরা তাকে সঠিক কোন উত্তর দিতে পারিনি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাড়াতাড়ি কায়রো থেকে ফৌজ নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। লোকটি বলেছে, আইউবীর এই তাড়াহুড়ার কারণ হলো, খৃস্টান বাহিনী মসুল, হালব্‌ ও দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর কায়রো থেকে ফৌজ নিয়ে এখানে সময় মতো পৌঁছানো সম্ভব হবে না। সমস্যা হলো, সুলতান যদি বাহিনী নিয়ে এসে পড়েন আর খৃস্টানদের কৌশল অন্যকিছু হয়, তাহলে সুলতানকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের অতি দ্রুত মুসলমান আমীর ও খৃস্টানদের সম্বন্ধে জানতে হবে।'

'আমি শুনেছি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দারা কিনা আকাশ থেকে তারকাও ছিঁড়ে আনতে পারে'– আমের ইবনে ওসমান বললো– 'খৃস্টান অঞ্চলগুলোতে কি তাঁর কোন লোক নেই?'

'আম্মা আমাকে বলেছেন, ইসহাক তুর্কি নামে অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন গোয়েন্দা আছে'– শামসুন্নিসা উত্তর দেয়– 'তিনি বৈরুত গেছেন। সঠিক সংবাদ তো তিনি নিয়েই আসবেন। কিন্তু কায়রো থেকে তার কোন সংবাদ আসেনি। দেখো আমের! সোনাবাহিনী তৎপরতা চালালে কিছু একটা আন্দাজ করা যায়। এখানে তো তেমন কোন তৎপরতা দেখছি না। যা কিছু গোপন তথ্য আছে, সব ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনের পেটে। আর এসব তথ্য মহলের ভেতর থেকে উদ্ধার করা

যেতে পারে। আর সেই সংবাদ তুমি একমাত্র আনুশির কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে পারো।'

'কিন্তু সে যে বিনিময় দাবি করছে, তা তো আমি দিতে পারবো না।' আমের বললো।

'এই মূল্য তোমাকে দিতেই হবে'– শামসুন্নিসা বললো– 'আমি আমার ভাইয়ের পাপের কাফফারা আদায় করতে চাই। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের কাছে ভালোবাসা ও কামনা-বাসনার কোন মূল্য নেই। আমাদেরকে সেই শহীদদের ঋণ শোধ করতে হবে, যারা ইসলামের জন্য স্ত্রীদের বিধবা করে গেছেন।'

ইসহাক তুর্কি এখন বৈরুতে। এখানে খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনের ফিরিঙ্গি বাহিনীর বিশাল সেনাক্যাম্প। বল্ডউইন এক পরাজয়বরণ করেছিলেন সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিলের হাতে। তার পরপরই সুলতান আইউবীর বাহিনীকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে নিজেই সুলতান আইউবীর ফাঁদে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হন এবং বন্দি হতে হতে অল্পের জন্য রক্ষা পান। উভয় বারই তার বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে পেছনে সরে যায়।

এখন দিন-রাত সমানে কাজ করছেন বল্ডউইন। রাতে ঘুমান না। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনায় মহাব্যস্ত। তিনি আল-মালিকুস সালিহকে অনুগত বানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তার কোন উপকার না করেই আস-সালিহ মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন ইয্যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের ফন্দি আঁটছেন বল্ডউইন। কায়রোতে তার গোয়েন্দারা সুলতান আইউবীর পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত।

বৈরুতে গিয়ে ইসহাক তুর্কি প্রথমে বল্ডউইনের হাইকমান্ড পর্যন্ত পৌঁছোনোর বুদ্ধি ঠিক করে নেয়। নিজেকে মুসলিম অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টান বলে পরিচয় দেয়। এভাবে সে তাদের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হয়। ইসহাক তুরস্কের নাগরিক। গায়ের রং ফর্সা। সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান যুবক। অশ্ব চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, তীরন্দাজি ও তরবারী চালনায় বিশেষ পারদর্শী। দীর্ঘ বাহুতে রেজায় শক্তি। মস্তিষ্কটা প্রখর ও সূক্ষ্মদর্শী। অপরের মন জয় করে প্রভাব বিস্তার ও অনুরক্ত বানানোর কলাকৌশল তার জানা। প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ রূপ ধারণ করায়

ওস্তাদ। সঙ্গীদের বলতো, তার আসল শক্তি হলো তার ঈমান ও চরিত্র।

বৈরুতে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। দেশের নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সমর মেলা বসানো হয়েছে। মেলায় সৈন্যদের কৃতিত্ব প্রদর্শন, তরবারী ইত্যাদি অস্ত্র চালনার প্রতিযোগিতা চলছে।

ইসহাক তুর্কি এরকম এক মেলায় হাজির হন। খৃষ্টানদের একটি প্রাচীন খেলা চলছে। দু'জন অশ্বারোহী লম্বা বর্শা হাতে বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা বর্শার সাহায্যে একে অপরকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। প্রথমবার কেউ কাউকে ফেলতে না পারলে পুনরায় সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আরোহীরা বর্ম পরিহিত।

প্রতিযোগিতা চলছে। একের পর এক গ্রুপ আসছে। পরাজিত আরোহী ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে। বিজয়ী হুংকার দিয়ে বলছে– আর কি কেউ আছে লড়াই করার? কেউ আসলো না। ইসহাকের গায়ে মরু পোশাক। সে মাঠে নেমে যায়। মোকাবেলাকারী অশ্বারোহী সৈনিক বর্ম পরিহিত। ইসহাককে সাধারণ পোশাকে ময়দানে নামতে দেখে দর্শকরা টিটকারি মারতে থাকে। মেলায় খৃস্টান সেনাপতি ও অন্যান্য কমান্ডাররা উপস্থিত। তারাও ইসহাককে দেখে অবজ্ঞার হাসি হাসে। একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিতকারী অশ্বারোহী শেষবারের মতো হুংকার ছেড়ে ঘোড়াকে এদিক-ওদিক হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, যেনো শিকার খুঁজছে। ঘোড়সওয়ার খৃস্টান বাহিনীর ইউনিট কমান্ডার। ঠাট্টার ছলে সে ঘোড়াটা ইসহাক তুর্কির দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং নিকটে এসে বর্শাটা তার গায়ে নিক্ষেপ করে। ইসহাক বর্শার আঘাত প্রতিহত করে। দর্শনার্থীরা আবারও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। রব উঠে– পাগল, পাগল। ওকে মেরে ফেলো।

অশ্বারোহী কমান্ডার ঘোড়াটা পেছন দিকে মোড় ঘুরায়। তার সঙ্গী কমান্ডারদের একজন বললো– 'বর্শায় গেঁথে পাগলটাকে এদিকে নিয়ে এসো। অন্য একজন বললো– 'লোকটা বর্শা প্রতিরোধ করে তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছে।'

অশ্বারোহী ঘোড়া হাঁকায়। ইসহাক নিরস্ত্র। ঘোড়াটা নিজের দিকে আসতে দেখে গায়ের চোগাটা খুলে বর্শার আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অশ্বারোহী সামান্য নত হয়। বর্শাটা হাতে তুলে নেয়। নিকটে এসে ইসহাকের উপর আঘাত হানে। ইসহাক কিছুদূর

পর্যন্ত ঘোড়ার সঙ্গে এমনভাবে দৌড়াতে থাকে, যেনো বর্শা তার দেহে গেঁথে গেছে। দর্শকরা উল্লাস করতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই নীরবতা থেমে যায়। সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখতে পায়, ইসহাক দৌড়ের মধ্যে অশ্বারোহী কমান্ডারের ঘোড়ার পেছনে বসে পড়েছে। বর্শা তার গায়ে বিদ্ধ হয়নি। সে বরং বর্শাটা ধরে রেখেছে। আরোহীও ধরে রেখেছে বর্শার এক মাথা। সে ঘোড়ার মোড় ঘুরায়। ঘোড়া এক চক্কর ছুটতে শুরু করে। ইসহাক তার থেকে বর্শাটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

ইসহাক বর্শাটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে যায়। বর্শাটা চারদিক ঘুরিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে– 'আমাকে একটা ঘোড়া দাও। সাহস থাকে তো আমার মোকাবেলা করো।'

অশ্বারোহী কমান্ডার ঘোড়া থেকে নেমে ইসহাকের কাছে চলে আসে। এখন তার হাতে কোন অস্ত্র নেই। উভয় বাহু সম্প্রসারিত করে রেখেছে। ইসহাক বর্শাটা মাটিতে গেড়ে দেয়। খৃস্টান অশ্বারোহী তাকে গলায় জড়িয়ে ধরে। ইসহাক বললো– 'আমি মোকাবেলা করবো, আমাকে ঘোড়া দাও।'

ইসহাককে একটি ঘোড়া আর একটি বর্শা দেয়া হলো। সে কমান্ডারের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়। দর্শনার্থীরা অপলক চোখে অনিঃশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিশ্চিত ছিলো, হতভাগ্য লোকটি বর্শার আঘাতে শোচনীয়ভাবে মারা পড়বে।

উভয় ঘোড়া খানিক দূরত্বে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। ইঙ্গিত পেয়ে ঘোড়া ছুটতে শুরু করে। কমান্ডার তার বর্শাটা ইসহাকের পেট বরাবর তাক করে রেখেছিলো। চলন্ত ঘোড়া থেকে আঘাত হানে সে। ইসহাক সামান্য মোড় ঘুরিয়ে কমান্ডারের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। সেই সঙ্গে তার বর্শাটা গিয়ে কমান্ডারের পেটে গেঁথে যায়। কমান্ডার ঘোড়ার অপরদিকে পড়ে যায়। কমান্ডার ওদিককার পা রেকাব থেকে সরাতে ভুলে গিয়েছিলো। তাই পড়তে গিয়ে পা রেকাবে আটকে যায়। ঘোড়া কমান্ডারকে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে শুরু করে।

প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিযোগিকে দর্শনার্থীদের সাহায্য করার অনুমতি নেই। কোন প্রতিযোগিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিলেও নয়।

ঘোড়া কমান্ডারকে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইসহাক পেছন ফিরে

দেখতে পেয়ে ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ঘোড়া হাঁকায়। কমান্ডারের ঘোড়ার পার্শ্বে গিয়ে এক লাফে তাতে চড়ে বসে। লাগাম টেনে ধরে ঘোড়ার গতি থামিয়ে দেয়। কমান্ডার বর্ম পরিহিত। দেহটা অক্ষত আছে। অন্যথায় এতোক্ষণ চামড়া ছিলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতো।

কমান্ডার ইসহাককে বাহুতে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কে? তোমার পরিচয় কী?'

ইসহাক উত্তর দেয়– 'আমি মুসলমানদের অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টান। এখন তো আর নিজেকে সাধারণ খৃস্টান দাবি করতে পারছি না।'

ইসহাক কৃতিত্বটা দেখিয়েছে অসাধারণ। এমন অশ্বচালক, বর্শাবাজ হয়তো কোন সুদক্ষ সৈনিক কিংবা কোন উচ্চ বংশের যোগ্য সন্তান। ইসহাক কমান্ডারকে জানায়, মুসলমানরা তাকে জোরপূর্বক ফৌজে ভর্তি করাতে চেয়েছিলো। তাই সে পালিয়ে এসেছে।

কমান্ডার ইসহাককে সঙ্গে নিয়ে যায়। কমান্ডার বল্ডউইন বাহিনীর একজন নাইট। নাইট হওয়ার কারণেই তার আপাদমস্তক বর্ম দ্বারা আবৃত। সামরিক যোগ্যতা ও দুঃসাহিসকতার কারণে খৃস্টানদের নাইটরা আজো বিখ্যাত। তাদেরকে এতো মর্যাদা দেয়া হতো যে, সম্রাটগণ তাদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলতেন।

ইসহাক তুর্কি বর্ম ছাড়াই খালি গায়ে এই বর্ম পরিহিত নাইটকে ধরাশায়ী করে এবং তাকে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। রতনে রতন চেনে। বল্ডউইনের এই নাইট ইসহাককে চিনে ফেলে। বুঝে ফেলে লোকটার দাম কতো। সঙ্গে করে নিজ গৃহে নিয়ে ইসহাককে মদ খেতে দেয়।

ইসলামে মদ হারাম। মুসলমান মদপান করে না। ইসহাক তুর্কি মুসলিম গোয়েন্দা। ছদ্মবেশে ভিন্ন পরিচয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে এরকম সমস্যায় পড়তে হয় আইউবীর গোয়েন্দাদের। খৃস্টান পরিচয়ে খৃস্টানদের মাঝে ঢুকে পড়ার পর তাদের সামনে মদ আসে। তাদের বিব্রত হতে হয়। বাধ্য হয়ে হারাম খেতে হয়। মদ না খেলে তাদেরকে সন্দেহে পড়তে হয়, খৃস্টান হলে মদ খাবে না কেন?

এই মুহূর্তে ইসহাক তুর্কি তেমনি এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন। সামনে মদের পেয়ালা। ইসহাক পরিপক্ক ঈমানদার মুসলমান। সে মদপান করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো– 'আপনি আমার শক্তি দেখেছেন। এই

শক্তি অর্জন করতে গেলে মদপান থেকে বিরত থাকতে হয়। এটা মদপান না করার সুফল। আমার ওস্তাদ বলেছেন, তোমার পেটে যদি মদ ঢুকে, তাহলে তোমার ঘোড়াটা অনুভব করবে তার পিঠে একজন দুর্বল লোক সওয়ার হয়েছে। ফলে ঘোড়া তোমার নির্দেশ মান্য করবে না।'

ইসহাক গলায় ঝুলানো তাগাটা টেনে বের করে। শার্টের ভেতর থেকে ছোট একটা ক্রুশ বেরিয়ে আসে। বললো– 'আমি নিজের শক্তিটা ক্রুশের সুরক্ষার জন্য ব্যয় করার লক্ষ্যে ক্রুশ হাতে শপথ করেছিলাম, মদপান আর চরিত্রহীন কাজ থেকে বিরত থাকবো। আমি শপথটা ভঙ্গ করতে পারি না।'

'তুমি কোথায় থাকো'– নাইট জিজ্ঞেস করে– 'পরিজন সঙ্গে আছে কি?'

'না'– ইসহাক উত্তর দেয়– 'আমি আমার পরিবার-পরিজনকে বলে এসেছি, নিরাপদ কোন ঠিকানা পেলে তাদেরকে নিয়ে আসবো।'

'ঠিকানা পেয়ে গেছো'– নাইট বললো– 'আমি তোমার মূল্য বুঝি। আজ থেকে তুমি আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব পালন করবে। আমার মতো প্রত্যেক কমান্ডারের সঙ্গে দু'চারজন করে রক্ষী থাকে। তুমি হলে আমার একজনই যথেষ্ট। আমি তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

সময়টা যুদ্ধের। ইসহাকের ন্যায় শক্তিশালী সাহসী লোকদের খুব দাম। বল্ডউইনের নাইট সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ইসহাকের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। তার জন্য আরবীয় ঘোড়া ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা হয়। মাসিক ভাতাও নির্ধারিত হয়।

আল্লাহ ইসহাককে প্রখর মেধা দান করেছেন। সেই মেধাকে কাজে লাগাতে শুরু করে সে। দু'দিনেই ইসহাক খৃস্টান নাইটের বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

'আমার একটি মাত্র আকাঙ্খা'– ইসহাক নাইটকে বললো– 'মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের ন্যায় খানায়ে কাবাও আমাদের দখল করে নেয়া দরকার। তাহলে ইসলাম অল্প দিনেই মৃত্যুবরণ করবে। সারা পৃথিবীতে না হলেও কমপক্ষে আরব বিশ্বের উপর ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার।'

'তুমি স্বপ্ন দেখছো বন্ধু'– নাইট বললো– 'মুসলমানদের এতো তাড়াতাড়ি পরাস্ত করা সহজ নয়। আমরা যদি মুসলমানদের কাবা গৃহ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করি, তাহলে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান

ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। সকল মুসলমানের মোকাবেলা করে জয়লাভ করা তো দূরের কথা, এক সালাহুদ্দীন আইউবীকেও তো এখন পর্যন্ত পরাজিত করতে পারলাম না।'

'আপনি তাহলে হীনম্মন্যতায় ভুগছেন'– ইসহাক বললো– 'মুসলমানদের ঐক্য ভেঙ্গে গেছে। সালাহুদ্দীন আইউবী সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছেন। মুসলমানরাই এখন তার শত্রু। হাল্‌ব ও মসুলের নতুন শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীন-ইমামুদ্দীন কি আপনার সমর্থক সহযোগি নন? তারা কি আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। আপনাদের গোয়েন্দারা মুসলমানদের ফোকলা করে দিয়েছে। আমি আপনাকে সেখানকার বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি।'

ইসহাকের বক্তব্যে নাইটের চোখ ছানাবড়া। ইসহাক নাইটকে এমন সব পরার্শ দেয় যে, একজন সেনাপতির পক্ষেই এ ধরনের পরামর্শ দেয়া সম্ভব। নাইটের চোখ খুলে যায়।

'তুমি তো আমাকে অবাক করে দেয়ার মতো কথা বলছো'– নাইট বললো– 'আমরা তো এমন পরিকল্পনাই প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কিনা তোমার আকাঙ্খা ও প্রত্যয়ের অনুকূল।'

'আপনাকে আমি আরেকটি পরামর্শ দিতে চাই'– ইসহাক বললো– 'আপনারা সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় কমান্ডো বাহিনী গঠন করুন। একটা বাহিনী আমার হাতে তুলে দিন। আমি মুসলিম ভূখণ্ড এবং তাদের স্পর্শকাতর শিরাগুলো সম্পর্কে অবগত আছি। আমি তাদের হাড়ির খবর পর্যন্ত জানি। রসদ প্রভৃতির ডিপো কোথায় থাকে, সব খবর আমার কাছে আছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাদের কোন ভাণ্ডার থাকতে দেবো না।'

'তা-ই হবে'– নাইট বললো– 'আমি তোমাকে সুযোগ করে দেবো।'

❖ ❖ ❖

'আমি তোমাকে শামসুন্নিসার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।' আনুশি আমের ইবনে ওসমানকে বললো।

তারা এখন মসুলে। ভালোবাসার ডালি নিয়ে এগিয়ে এসেছে আমের। আনুশি মধ্য রাতের পর তার কক্ষে চলে আসে। বললো– 'শামসুন্নিসা কি আমার চেয়ে বেশি রূপসী?'

'ওর নামও উচ্চারণ করো না'– আমের বিরক্তির সুরে বললো– 'ও রাজকন্যা। তাকে আমি তোমার চেয়েও বেশী ভয় করতাম। তোমাকেও

আমি রাজকন্যা মনে করতাম। কিন্তু তুমি আমার ভয় দূর করে দিয়েছো। তারপরও মাঝে-মধ্যে ভয় এসে যায় তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করো কিনা। তাছাড়া তোমার-আমার সম্পর্কটা জানাজানি হলে কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে, সে জন্যও ভয় হচ্ছে।'

'কেউ যদি তোমার এক বিন্দু ক্ষতি করে, তাহলে আমার ইঙ্গিতে প্রাসাদের প্রতিটি ইট খসে পড়বে'– বলেই আনুশি আমেরকে কাছে টেনে নিয়ে বললো– 'কেউ তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে এ আশঙ্কা যথার্থ। আমার অস্তিত্ব একটা চিত্তাকর্ষক প্রতারণা। কিন্তু তুমি আমাকে মানুষরূপে দেখো। আমাকে আমার ইবাদত করতে দাও।'

আবেগ চেপে বসে আনুশির উপর। তার মাথার চুলে বিলি কাটছে আমের ইবনে ওসমানের আঙ্গুলগুলো। রাত কেটে যাচ্ছে। আনুশির কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গিতে মাদকতা। আমেরের জন্য এটা একটা কঠিন পরীক্ষা। সে একজন অবিবাহিত যুবক। একাধিকবার আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপথগামী হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। প্রতিবারই আল্লাহকে স্মরণ রেখে প্রার্থনা করেছে– হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দাও, আমার চরিত্রকে পবিত্র রাখো।'

রাত আর বেশি বাকি নেই। আনুশি আমেরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। এভাবে আরো তিন-চার রাতে দু'জনের গোপনে কথাবার্তা চলে। আনুশি আমেরের অস্তিত্বে একাকার হয়ে যায়। সে দেখেছে, আমেরের মধ্যে একটা ভালো মানুষী আছে। কিন্তু তার সত্ত্বায় যে কম্পন সৃষ্টি হতে চলেছে, আনুশি তা টের পায়নি।

'মুসলিম শাসকদের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে'– এক রাতে আমের আনুশিকে বললো– 'আমি খৃস্টান সম্রাটদের দেখিনি। আমাদের রাজাদের চেয়ে ভালো তো হবে নিশ্চয়ই।' আমের গোপন কথা বের করতে বললো– 'আচ্ছা, এটা কি সম্ভব যে, খৃস্টানরা এসে এই অঞ্চলটা দখল করে ফেলবে?'

আনুশি অত্যন্ত চালাক মেয়ে। শৈশব থেকেই ওস্তাদি শিখে আসছে। তার রূপ-যৌবন দুর্ভেদ্য দুর্গের শক্ত প্রাচীর ভাঙ্গার ক্ষমতা রাখে। প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাহদের গোলাম বানিয়ে রাখার মতো যোগ্যতা তার আছে। কিন্তু সে মানবিক দুর্বলতা এবং স্বভাবজাত চাহিদা ও দাবি থেকে মুক্ত নয়। একজন মানুষ স্বভাব-চরিত্রে হিংস্র পশুতে পরিণত হোক

না কেন, সৃষ্টিগত স্বভাবের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারে না। আনুশি আমের ইবনে ওসমানকে তার পিপাসার কথা ব্যক্ত করেছিলো। সত্য প্রেমের পিপাসা আর আমেরের অস্তিত্ব তাকে অক্টোপাসের ন্যায় জড়িয়ে রেখেছে। মদের নেশা তার জানা ছিলো। কিন্তু প্রেমের নেশা সম্পর্কে ছিলো অনবহিত। এই নেশা যখন তাকে পেয়ে বসলো এবং দুর্বল মুহূর্তটায় আমের খৃস্টান শাসকদের পক্ষে কথা বললো, তখন মেয়েটির প্রশিক্ষণ-দীক্ষা বেকার হয়ে পড়লো। সে আমেরের সঙ্গে এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করে, যা কোন গুপ্তচর সাধারণত প্রকাশ করে না।

আমেরের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে সে। এ মুহূর্তে যদি আনুশির খৃস্টান গুরু, ইয়যুদ্দীন কিংবা অন্য কোন কর্মকর্তা তাকে এই অবস্থায় দেখতে পায়, তাহলে তারা বিশ্বাসই করবে না, এই সেই মেয়ে, যাকে তারা সুদানী পরী বলে ডাকেন। নিষ্পাপ মেয়ের মতো লাজুক হয়ে বসে আছে আনুশি। তার একবিন্দু অনুভূতি হৈ নেয়, এই মুহূর্তে এখানে বসে সে সালতানাতে ইসলামিয়ার মূলোৎপাটনের পরিবর্তে ক্রুশকেই বরং ফোকলা করে ফেলছে। আমের আনুশিকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করছে।

আজ যখন আনুশি আমেরের কক্ষ থেকে বের হয়, তখন রাতের শেষ প্রহর। আমেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে গেছে আনুশি।

অনেক দিন কেটে গেছে। ইসহাক তুর্কি এখন বৈরুতে খৃস্টান নাইটের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীই নয়– অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। খৃস্টান নাইটের এমন কোন গোপন তথ্য নেই, যা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা ইসহাক তুর্কি জানে না। ইসহাক একটা বিষয় অনুভব করে, তার এই কমান্ডার ক্রুশের জন্য এতোটা আন্তরিক নয়– যতোটা আন্তরিক পরবর্তী যুদ্ধে জয়লাভ করে সম্রাট বল্ডউইন থেকে আরবের কোন একটা ভূখণ্ড পুরস্কার হিসেবে অর্জন করার। একটি ভূখণ্ডের স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন চেপে বসেছে তার মাথায়। ওস্তাদ আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণ মোতাবেক ইসহাক তুর্কি তার মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলতে শুরু করে। যেভাবে আনুশির ন্যায় একটি ভয়ঙ্কর মেয়ে মানবীয় দুর্বলতা ও চাহিদার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছিলো, তেমনি খৃস্টানদের এই নাইটও আপন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে গিয়ে এবং কামনা-

বাসনার কাছে পরাজিত হয়ে ভাবনার প্রযোজনীয়তা হারিয়ে ফেলেছে যে, অচেনা লোকটিকে সে নিজের অন্তরঙ্গ বানিয়ে নিলো। সে শুধু তারই নয়– তার সম্রাট ও তার ক্রুশের পরাজয়ের বার্তাবাহক।

একদিন নাইট ইসহাক তুর্কিকে বৈরুত থেকে দূরে একস্থানে নিয়ে যায়। ইসহাক জানে, নাইটের সেনা ইউনিট রাতে বেশ তড়িঘড়ি রওনা হয়ে গেছে। সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানের জন্য বন্টন করার লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে। দেহরক্ষী হিসেবে ইসহাক তার সঙ্গে আছে। বাহিনীর অবস্থান স্থলে পৌঁছে ইসহাক দেখতে পেলো, তাঁবু স্থাপন করা হয়নি। বাহিনীতে অশ্বারোহীও আছে, পদাতিকও আছে। নাইট তার অধীন কমান্ডারদের ডেকে কয়েকটি জায়গার নাম উল্লেখ করে উক্ত স্থানগুলোতে তাঁবু স্থাপন করতে এবং প্রস্তুত অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দেয়। ইসহাক পাশে দাঁড়িয়ে সব পর্যবেক্ষণ করে।

'হতে পারে তোমাদেরকে এক মাস পর্যন্ত এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে'– নাইট তার অধীন কমান্ডারদের বললো– 'কিন্তু বিরক্ত হতে পারবে না। গতকাল কায়রো থেকে আসা এক গোয়েন্দা সংবাদ জানিয়েছে, সালাহুদ্দীন আইউবী বৈরুত অবরোধ করে নগরীটা দখল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমাদের আশা ছিলো, তিনি এখনো দামেশকের দিক থেকেই আসবেন এবং সর্বপ্রথম তার মুসলিম আমীরদেরকে –যাদের মধ্যে হালব, মসুল এবং হাররানের আমীরগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– সঙ্গে নেবেন। তারপর আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন। কিন্তু এখন নির্ভরযোগ্য তথ্য পেলাম, তিনি সর্বাগ্রে আমাদের হৃদপিণ্ডের উপর আঘাত হানবেন এবং তারপর তার যেসব আমীরকে আমরা আমাদের বন্ধু বানিয়ে রেখেছি, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন। আমরা যদি এ সংবাদ না পেতাম, তাহলে আমরা বৈরুতের অভ্যন্তরে তার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়তাম। তোমরা অনেকে হয়তো জানো না, সালাহুদ্দীন আইউবী অবরোধে অভিজ্ঞ। কোন ভূখণ্ড তার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। ক্রুশের আশির্বাদে আমরা সময় থাকতে ইঙ্গিত পেয়ে যাই।'

ইসহাক শুনছে। শরীরটা ঘেমে ওঠছে তার। মনে রাগ আসে, সালাহুদ্দীন আইউবীর আভ্যন্তরীণ জগতেও খৃস্টানদের চর আছে! এতো ভেতরের খবর শত্রুর হাতে চলে আসলে চলবে কী করে? তার মনে

পড়ে যায়, তার মুসলমান ভাইদের ঈমান বিক্রি করতে সময় লাগে না। সুলতান আইউবীর ব্যক্তিগত বলয়ে কোন খৃস্টান ঢুকতে পারে না। এটা কোন ঈমান নিলামকারী মুসলমানেরই কাজ। ইসহাক তুর্কি তীব্রভাবে অনুভব করে, তাকে এই মুহূর্তে কায়রো পৌঁছে আলী বিন সুফিয়ানকে বলতে হবে, সুলতান সত্যিই যদি বৈরুতের উপর সেনা অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে যেনো তিনি সরাসরি বৈরুত না যান।

সময় মতো সংবাদটা পাওয়ায় আমাদের লাভ হয়েছে। যেভাবে আমাদের এই বাহিনীকে ওঁৎ পেতে থাকার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে, তেমনি আরো কয়েকটি ইউনিটকে– যাদের মধ্যে অশ্বারোহী সৈনিকের সংখ্যাই বেশি– বৈরুতের আশপাশে এবং দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা হয়েছে। যে বাহিনীটি বৈরুতে প্রস্তুত আছে, তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকে স্বাগত জানাবে। আইউবী অতর্কিত আক্রমণ করে বৈরুত দখল করে নিতে চাইবেন। তিনি যখন অবরোধ সংকীর্ণ করবেন, তখন আমরা পেছন থেকে তার উপর আক্রমণ চালাবো। তারপর তিনি বৈরুতের অভ্যন্তরে আমাদের বাহিনীর এবং বাইরের বাহিনীগুলোর গ্যাড়াকলে আটকে যাবেন।'

'জনাব!'– এক প্রবীণ কমান্ডার বললো– 'জানতে পেরেছেন কি তিনি কোন্ দিক থেকে আসবেন?'

এখনো তা জানতে পারিনি'– নাইট উত্তর দেয়– 'মনে হচ্ছে তিনি আমাদের অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে আসার ঝুঁকি বরণ করবেন। সম্রাট বল্ডউইন নির্দেশ জারি করেছেন, পথে যেনো তাকে না ঘাটানো হয়। আমরা তাকে আমাদের ভেতরে এবং বৈরুত পর্যন্ত পৌঁছতে দেবো। এখানে আমরা তার বাহিনীকে রসদ থেকে বঞ্চিত করে মারবো।'

'আপনি তো জানেন, বৈরুত সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত'– প্রবীণ কমান্ডার বললো– 'তিনি তো তার নৌশক্তিও ব্যবহার করতে পারেন।'

'তিনি নৌশক্তি ব্যবহার করবেন'– নাইট বললো– 'তার বিপুলসংখ্য সৈন্য সমুদ্র জাহাজে করে আসছে। আমরা তারও ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমরা সমুদ্রে তার মোকাবেলা করবো না। তার বাহিনীকে কূলে অবতরণ করার সুযোগ দেবো। এভাবে আমরা তার জাহাজগুলোকে ধ্বংস কিংবা তাদেরকে পালানোর সুযোগ না দিয়ে জাহাজগুলোকে দখল

করবো। আমার বন্ধুগণ! তোমরা তো জানো, সেনাবাহিনীর এসব গোপন তথ্য বলা যায় না। কেননা, মুসলমানদের অঞ্চলে যেমন আমাদের গুপ্তচর আছে, তেমনি আমাদের অঞ্চলেও মুসলমান চর তৎপর রয়েছে। আমাদের সৈনিকদের মুখনিঃসৃত যে কোন কথা সালাহুদ্দীন আইউবীর কানে পৌঁছে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবে কোন কোন সময় অন্তত কমান্ডারদের জানা থাকা দরকার, অনাগত পরিস্থিতি কিরূপ হবে এবং তার পটভূমি কী হবে। সাবধান থাকবে, সৈনিকরা যেনো জানতে না পারে, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর কোন সংবাদ পেয়েছি। অন্যথায় আইউবী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলবেন।'

'মুসলমান আমীরদের মনোভাব কি আপনার জানা আছে?'– অপর এক কমান্ডার জিজ্ঞেস করে– 'এমনও তো হতে পারে,তারাও আমাদের উপর আক্রমণ করবে।'

'তাদের পক্ষ থেকে আমাদের কোন আশঙ্কা নেই'– নাইট বললো– 'হাল্‌বের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীন মসুলে এসে পড়েছেন আর আমীর চলে গেছেন হালবে। ক্ষমতার এই হাতবদল আমাদের কারসাজিতে হয়েছে। ওখানকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। এতোটুকু আশা করা যায় যে, তাদের কেউ না কেউ সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করবে কিংবা তাকে রসদ সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। মোটকথা, এটা নিশ্চিত, আইউবী তার মুসলমান আমীরদের থেকে কোন সাহায্য পাবেন না।'

রাতে ইসহাক তুর্কি নাইটের সঙ্গে সুলতান আইউবীর সম্ভাব্য আক্রমণ এবং বৈরুত অবরোধ সম্পর্কে মতবিনিময় করে এবং সন্তোষ প্রকাশ করে বলে– 'এবার আমি আমার বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ পাবো। সে আরো কিছু জরুরি তথ্য জেনে নেয়। তার সামনে এখন কাজ, তাকে ওখান থেকে পালিয়ে কায়রো পৌঁছতে হবে। সে ভাবে, হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলে নাইট সন্দেহ করে বসবে, আমি গোয়েন্দা ছিলাম এবং তাদের সবকিছু দেখে-শুনে চলে গেছি। ফলে সে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলবে। তাই ইসহাক নাইটকে বলে, ছুটি নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। অজুহাত তার আছে। ঠিক করে, বলবে, পরিবার-পরিজনকে মুসলমানদের অঞ্চলে রেখে এসেছি, আপনি তা

জানেন। এখন যেহেতু আমি মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে গেছি, তাই এদেরকে উদ্ধার করে আনতে চাই। অন্যথায় মুসলমানরা তাদেরকে উত্যক্ত করতে থাকবে।

অজুহাত উপস্থাপন করে ইসহাক নাইটকে বলে– 'এক-আধ মাস পর তো আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বোই। তারপর কে জানে কতোদিন আমাদের যুদ্ধের মাঠে থাকতে হয়। পরিবারের লোকদেরকে এখনই নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে, আমি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলাম আর ওদিকে তাদের কোন সহায় রইলো না।'

অজুহাতটা যৌক্তিক। নাইট তাকে যে ঘোড়াটি দিয়েছিলো, সেটি দেখিয়েই বললো– 'তুমি এখনই রওনা হয়ে যাও। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো।'

ইসহাক তুর্কির তাড়া খৃস্টান নাইটের চেয়ে বেশি। কারণ, তাকে দ্রুত কায়রো পৌঁছুতে হবে। তবে তার আগে তাকে হাল্‌ব ও মসুল যাওয়া আবশ্যক। কেননা, ওখানকার শাসকদের সম্পর্কে তার কানে কিছু কথা এসেছে। সে জানে না, সুলতান আইউবী যখন অভিযান পরিচালনা করবেন, তখন মসুলের শাসনকর্তা ও সেনা অধিনায়কদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে। হাল্‌বে তার সহকর্মী কারা আছে এবং কোথায় আছে, তার জানা আছে। কিন্তু সে নাইটের মুখ থেকে শুনেছে, ইয্‌যুদ্দীন মসুল এবং ইমাদুদ্দীন হাল্‌বে চলে গেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, রোজি খাতুনও এখন মসুলে অবস্থান করে থাকবেন। তা-ই যদি হয়, তাহলে তার খাদেমাও তার সঙ্গে থাকবে। মহলের ভেতরের যোগাযোগ এই খাদেমার মাধ্যমেই হতে পারে।

ইসহাক তুর্কি সে রাতেই রওনা হয়ে যায়। ঘোড়াটা উন্নত জাতের। ইসহাক দক্ষ অশ্বারোহী। মাসের দূরত্ব কয়েক দিনে অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা তার আছে। ইসহাক পথ চলতে থাকে আর আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকে, যেনো তার কায়রো পৌঁছার আগে সুলতান আইউবী রওনা না হন। ছুটতে ছুটতে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লেও ইসহাক থামছে না। ধীরে ধীরে ঘোড়ার গতি কমতে শুরু করে। ইসহাক নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে সামনের দিকে ঝুঁকে পেটটা যিনের সঙ্গে লাগিয়ে চলন্ত ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে।

শেষ রাতে ইসহাকের চোখ খোলে। হন্তদন্ত হয়ে আকাশের দিকে

তাকায়। তার পথ প্রদর্শনকারী তারকাটা জ্বল জ্বল করছে। ঘোড়া সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে। ভোরের আলোতে ইসহাক এক স্থানে ঘোড়াটাকে পানি পান করায় এবং ঘাস খাওয়ায়। নিজেও খানিকটা বিশ্রাম নেয়। তারপর আবার চলতে শুরু করে।

এ দিনটিও কেটে গেলো। রাতও অতিক্রান্ত হলো। খৃষ্টান নাইটের প্রদত্ত ঘোড়াটা ইসহাককে খুব কাজ দিচ্ছে। সূর্য অস্ত যেতে এখনো বেশ দেরি। মসুলের মিনারের চূড়াটা দেখতে পাচ্ছে ইসহাক। ইসহাক এই নগরী সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছে। দু'সঙ্গী গোয়েন্দার ঠিকানাও তার কাছে আছে। তবে তারা কোন তথ্য দিতে পারবে কিনা তার জানা নেই। এমনও হতে পারে, তারা তাকে হাল্‌বের পথ দেখিয়ে দেবে।

❖ ❖ ❖

ইয্‌যুদ্দীন নিশ্চিন্ত হয়েছেন, রোজি খাতুন তার প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি রোজি খাতুনের কোন কর্মকাণ্ডে আর হস্তক্ষেপ করেন না। রোজি খাতুন এ কথাও জিজ্ঞেস করলেন না যে, সে ইমামুদ্দীনের সঙ্গে ক্ষমতা রদবদল কেন করলেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি ইয্‌যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা পূরণ হয়নি। তথাপি তিনি এই ভেবে সান্ত্বনা পান যে, তিনি এই রহস্যময় জগতটার অভ্যন্তরে ঢুকতে পেরেছেন এবং সুলতান আইউবী এখানে যে গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে রেখেছেন, তাকে আরো কার্যকর করতে পারছেন। তিনি শামসুন্নিসাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং মেয়েটি বিভ্রান্ত জীবনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে মুজাহিদ নারীতে পরিণত হয়েছে। সে ইয্‌যুদ্দীনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আমের ইবনে ওসমানকে সংবাদদাতা ও গুপ্তচর বানায়। আর নিজের প্রেমাস্পদ হওয়া সত্ত্বেও গুপ্তচরবৃত্তির স্বার্থে তাকে এমন একটি চতুর ও রূপসী মেয়ের পেছনে নিয়োজিত করে, যে তাকে আজীবনের জন্য ছিনিয়ে নিতে সক্ষম।

আমের ইবনে ওসমান আনুশি থেকে যেসব তথ্য উদঘাটন করছে, তা সব শামসুন্নিসার মাধ্যমে রোজি খাতুনের নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। এ এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যা কায়রোতে পৌঁছিয়ে দেয়া একান্ত জরুরি। হাল্‌ব থেকে সুলতান আইউবীর যে গোয়েন্দা এসেছিলো, তাদের কমান্ডারকে কায়রো যাওয়ার জন্য একজন লোক ঠিক করে রাখতে বলা হলো। সে বলেছিলো, ইসহাক তুর্কি বৈরুত থেকে এসে

পড়বে। ওখানকার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত রিপোর্ট অসম্পূর্ণ থাকবে। সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে বারবার বলছেন খৃষ্টানদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহ করো।

আনুশি আমের ইবনে ওসমানকে যেসব তথ্য দিয়েছে, সবই ছিলো সত্য। মেয়েটি ইয্যুদ্দীন ও তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলো যে, তারা তার উপস্থিতিতে যারপরনাই স্পর্শকাতর কথাবার্তা বলতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। লোকগুলোর প্রতি আনুশির কোনো হৃদ্যতা ছিলো না। সে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতো। শুধুমাত্র নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার জানা ছিলো, যে যুবকটিকে সে মনে-প্রাণে ভালোবাসে, সেই আমের ইবনে ওসমানও নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আনুশির প্রেমের ফাঁক গলিয়ে অনেক অজানা তথ্য বের করতে সক্ষম হয় আমের।

ইয্যুদ্দীন রোজি খাতুনের ভ্রমণ বিহারের জন্য ঘোটঘযান দিয়ে রেখেছেন। এক সন্ধ্যায় রোজি খাতুন শামসুন্নিসাকে সঙ্গে করে বাইরে বেড়াতে যান। নগরীর সন্নিকটে একটি সবুজ বাগিচা। ভেতরে মনোরম একটি কূপ। জায়গাটা এতো সুন্দরও মন ভোলানো যে, রাজ পরিবারের সদস্যরা ব্যতীত অন্য কেউ এখানে আসতে পারে না। রোজি খাতুনের সঙ্গে খাদেমাও আছে। রক্ষী হিসেবে সঙ্গে এসেছে আমের ইবনে ওসমান। আমের ইয্যুদ্দীনের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে, রোজি খাতুন যখন বাইরে বেড়াতে যাবেন, সে তার সঙ্গে থাকবে।

গন্তব্যে পৌঁছে গাড়িটা দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। রোজি খাতুন ও শামসুন্নিসা কূপের দিকে চলে যায়। আমের ইবনে ওসমানও সঙ্গে আছে। আসলে এটা তাদের শুধু ভ্রমণ নয়, ভ্রমণের বাহানায় রোজি খাতুনের আমের থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা বটে।

ইসহাক তুর্কি মসুলে তার এক সহকর্মীর নিকট পৌঁছে গেছে। সঙ্গী তাকে জানায়, রোজি খাতুনও তাদের দলে যোগ দিয়েছেন। বরং বলা যায়, তিনি তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন। উভয়ের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন ও তথ্য আদান-প্রদান হয়। ইত্যবসরে তাদের আরেক সঙ্গী এসে পড়ে। সে ইসহাককে জানায়, রোজি খাতুনের খাদেমাকে এ মুহূর্তে অমুক কূপের নিকট পাওয়া যাবে। ভালো হবে, তুমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করো। ইসহাক সঙ্গীদের তার ব্যস্ততার কথা জানায়। সম্ভব হলে রাতেই

আবার সে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়া হয়ে যাবে।

কূপের কিনারায় বসে আমের ইবনে ওসমান রোজি খাতুন ও শামসুন্নিসাকে বলছে, আনুশির কথা অনুযায়ী সে নিশ্চিত হয়েছে, খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে ইয্যুদ্দীন সুলতান আইউবীকে বন্ধুত্বের ধোঁকায় ফেলে প্রতারণা করবেন। সুলতান আইউবী যদি রসদ দিতে বলেন, তিনি সময়মতো রসদ সরবরাহ করবেন না। সুলতান যদি সৈন্য তলব করেন, তাহলে এই অজুহাতে ব্যর্থতা প্রকাশ করবেন যে, ইমাদুদ্দীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নেই। সে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ চালাতে পারে। তাই আমাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনাকে আমি সৈন্য দিতে অপারগ। ইমাদুদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গিও একই রকম। ব্যাপারগুলো সুলতান আইউবী অবহিত হওয়া দরকার। কারণ, তিনি তো দু'শাসককেই তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ মনে করছেন।

খাদেমা এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছে। ভ্রমণস্থলের নিকট থেকে কারো গানের শব্দ তার কানে আসে। কে যেনো গাইছে– 'পথভোলা পথিক হে! তারকাটা দেখে নে'। খাদেমা কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে যায়। এই গান তো তাদের গোয়েন্দাদের গোপন সংকেত। তারা একজন অপরজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে এই গান গাইতে থাকে। খাদেমা ঝোপের আড়ালে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সে ইসহাক তুর্কিকে চিনে ফেলে। তাকে দাঁড় করায়। ইসহাক বললো– 'আমার সময় নেই, তুমি পায়চারি করতে থাকো।' বলেই রোজি খাতুনের নিকট চলে যায়।

সূর্য ডুবে গেছে। ভ্রমণ স্থলের উপর আঁধার নেমে আসছে। ইসহাক তুর্কি এমন এক জায়গায় রোজি খাতুন, শামুসন্নিসা ও আমেরের সঙ্গে বসে আছে, যেখানে তাদের দেখার সাধ্য কারো নেই।

রোজি খাতুন ইসহাক তুর্কির কাছে হাল্‌ব ও মসুলের যাবতীয় গোপন রহস্য ও প্রতারণার চিত্র তুলে ধরে। তিনি ইসহাককে বললেন– 'তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবে, আমি নূরুদ্দীন জঙ্গীর আসনটা ইয্যুদ্দীনকে দিয়েছিলাম। হৃদয়ে পাথর বেঁধে আমি ইয্যুদ্দীনকে এজন্য গ্রহণ করেছিলাম যে, তাকে জঙ্গীর যথাযথ উত্তরাধিকার বানাবো এবং তিনি জঙ্গীর ন্যায় তোমার ডান হাত হয়ে কাজ করবেন। কিন্তু বিয়ের পর তার আসল রূপ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। এই বিয়ে করে আমি

জীবনে একটি মারাত্মক ভুল করেছি। বিয়ের বাহানায় আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এখন দামেশ্‌কের মর্যাদা তোমার হাতে। বৈরুতে তোমাকে কীভাবে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি চলছে, তা তুমি ইসহাকের নিকট থেকে জেনে নেবে। তোমার বৈরুত অবরোধের পরিকল্পনার সংবাদ বৈরুত পৌঁছে গেছে। এমতাবস্থায় কী করতে হবে তুমিই ভালো বুঝো। ভেবে দেখো, সরাসরি বৈরুতই যাবে, নাকি পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলবে। তথ্যটা বৈরুতে কে পৌঁছালো, এ প্রশ্নের উত্তর আলী বিন সুফিয়ান দিতে পারবে। আমাদের জাতির মধ্যে ঈমান বিক্রি একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরবের আমীরদের বিলাসিতার এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে তারা খানায়ে কা'বাকেও বিক্রির চেষ্টা করবে। বিলাসিতা আর ক্ষমতার মোহ এই দুই মিলে আমাদের রাজ্যগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে এবং জাতিগুলোর নাম-চিহ্ন মুছে ফেলছে। তুমি ইয্‌যুদ্দীন ও ইমামুদ্দীনের উপর আস্থা রাখবে না। এরা তোমাকে সাহায্য নয় বরং ধোঁকা দেবে। আমার পরামর্শ হলো, বৈরুতের পরিবর্তে হালব ও মসুল অবরোধ করে আগে ঈমান নিলামকারী শাসকদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করো এবং এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করো। এটা ইসলামের অনেক বড় খেদমত হবে। ইতিহাসের উপর একবার চোখ বুলাও সালাহুদ্দীন! আমাদের রাজা-বাদশাগণ আজীবন দেশ-জাতি-রাষ্ট্রকে বিক্রিই করেছে। দেশ-জাতির লাজ রক্ষা করেছে ইসলামের সৈনিকরা। সৈনিক ছাড়া কেউ শত্রু দেখে না। আর শত্রুর হাতে জীবন দেয় শুধু সৈনিক। সে কারণে দেশ ও জাতির মূল্য-মর্যাদা শুধু সৈনিকরাই বুঝে। যে সময় এই বিলাসী শাসকরা শত্রুর প্রেরিত মদ, সুন্দরী নারী আর বিত্তের নেশায় মাতাল পড়ে থাকে, তখন আল্লাহ্‌র সৈনিকগণ মরু বিয়াবান, পাহাড়-জঙ্গল আর নদী-সমুদ্রে জীবন অতিবাহিত করে। ভাই সালাহুদ্দীন! তোমার জীবনটাও তেমনি মরু বিয়াবানে, পাহাড়-জঙ্গলে লড়াইরত অবস্থায় অতিবাহিত হচ্ছে। আমার প্রথম স্বামী নূরুদ্দীন জঙ্গীও সারা জীবন ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন। কিন্তু তুমি যখন ঈমান বিক্রিকারী শাসকদের বিরুদ্ধে বুকটান করে দাঁড়াও, তখন তারা তোমাকে জাতির ঘাতক ও গাদ্দার আখ্যা দেয়। আমাদেরকে এসব ফতোয়ার পরোয়া করা চলবে না। এ সব ইহুদী-খৃস্টানদের ফতোয়া, যা আমাদের ভাইয়েরা

তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত করছে। তুমি আসো– ঝড়ের ন্যায় আসো। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন। আমি তোমার জন্য ভূমি সমতল করছি। এখানকার প্রতিটি শিশু, বৃদ্ধ ও নারী তোমার সঙ্গে থাকবে। বাকি সংবাদ ইসহাকের নিকট থেকে জেনে নিও।'

ইসহাক তুর্কিকে প্রাপ্ত সকল তথ্য অবহিত করা হলো। সে উঠে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যদিয়ে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ে। এ সময় তার অনুভব হতে লাগলো, কার যেনো পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ইসহাক এদিক-ওদিক তাকায়। তার সন্দেহ জাগে, খানিক দূরে ছায়ার মতো একটা কি যেনো চলে গেছে এবং ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিষয়টার প্রতি মনোযোগ দেয় না ইসহাক। মাথায় তার ভাবনা, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে কায়রো পৌঁছতে হবে। এমন যেনো না হয়, তার পৌঁছার আগেই সুলতান আইউবী রওনা হয়ে গেছেন। এখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলে অত্যন্ত আনন্দিত সে। ইসহাক তার সঙ্গীদের নিকট যায়। খুব তাড়াতাড়ি করে চারটা খেয়ে রওনা হয়ে যায়। সামনে তার আরো কাজ আছে। হালব গিয়ে কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ইসহাক হালব পৌঁছে যায়। কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কমান্ডার ইসহাককে অতিশয় উন্নত জাতের একটি তাগড়া ঘোড়া প্রদান করে। পানির ছোট একটি মশক ও খাদ্যভর্তি থলে ঘোড়ার সাথে বেঁধে দেয়। ইসহাক কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

যে রাতে ইসহাক ভ্রমণস্থলে রোজি খাতুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলো, সে রাতে মন ভালো না থাকার অজুহাতে আনুশি ইয্যুদ্দীন ও সাঙ্গপাঙ্গদের আসরে যায়নি। মেয়েটি অসুস্থ ভেবে ইয্যুদ্দীন ডাক্তার তলব করেন। ডাক্তার দেখে ওষুধ দেন। কিন্তু আনুশি ওষুধ খেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো– 'বিরক্ত করো না, আমাকে একটু শান্তিতে একা থাকতে দাও।'

রাত জাগরণ ও অধিক মদ্যপানের কারণে তার এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ইয্যুদ্দীন ও ডাক্তার চলে যায়। আনুশি কক্ষের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে কক্ষে ভেতরে পায়চারি করতে থাকে। মনটা তার বেজায় অস্থির। বার কয়েক জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকায় আবার

পায়চারি করতে শুরু করে।

আনুশি তার অলঙ্কারের বাক্সটা খোলে। একটি আংটি বের করে। আংটির নগিনার জায়গাটা ডিবার মতো। অত্যন্ত সুন্দর ও ভারী একটি আংটি। আনুশি আংটির ডিবাটা খুলে। তার মধ্যে সাদা পাউডার ভর্তি। সে পাউডারগুলোর প্রতি খানিক তাকিয়ে ডিবাটা বন্ধ করে আংটিটা আঙ্গুলে পরিধান করে। এবার তাকে কিছুটা শান্ত মনে হলো, যেনো অস্থিরতা দূর করার চেষ্টা করছে।

রাত অর্ধেক কেটে গেছে। আনুশির সেবিকা তার কক্ষের কাছাকাছি অপর এক কক্ষে ঘুমিয়েছিলো। তাকে বলে দিয়েছিলো, আজ রাতে আর তাকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু মধ্যরাতের পর আনুশি সেবিকার কক্ষে গিয়ে তাকে জাগিয়ে বললো, আমের ইবনে ওসমানকে ডেকে আনো।

সেবিকা আনুশি–আমরের প্রেমের ঘটনা জানতো। সে উঠে গিয়ে আমেরকে ডেকে আনে। আনুশি সেবিকাকে বললো– 'তুমি কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো।'

'আমের!'– আনুশি এমন এক ভঙ্গিতে বললো, যেনো তার সঙ্গে আমেরের পরিচয় নেই– 'আজ ভ্রমণস্থলে তোমাদের সঙ্গে যে লোকটা বসা ছিলো, সে কে?'

'কেউ নয়'– আমের অজ্ঞতা প্রকাশ করে উত্তর দেয়– 'আমার নিকট কেউ আসেনি তো। আমি তো বেগমের সঙ্গে রক্ষী হিসেবে যাই এবং তার থেকে দূরে থাকি।'

'আমের!'– আনুশি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত কণ্ঠে বললো– 'আমার সাত স্তর মাটির নীচের গোপন খবরও জানা আছে। তোমাকে আমি হৃদয়ের গভীর থেকে কামনা করি। কিন্তু তুমি আমাকে বোকা ভেবো না। তুমি, রোজি খাতুন, শামসুন্নিসা ও তার খাদেমা একসঙ্গে বসেছিলে আর একজন অপরিচিত লোক তোমাদের মাঝে বসা ছিলো। অতি গোপনীয় কথপোকথন হচ্ছিলো। প্রমাণ চাইলে তাও দিতে পারি। তোমরা কানে কানে কথা বলছিলে। শেষে অপরিচিত লোকটা সেখান থেকে চলে যায়। আমি তখন ফিরে আসি।'

ইসহাক তুর্কি সেখান থেকে ওঠে চলে যাওয়ার সময় কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলো। খানিক দূরে একটি ছায়াও দেখেছিলো। আসলে সে ছিলো আনুশি। মেয়েটি চুপি চুপি রোজি খাতুন, শামসুন্নিসা

ও আমের ইবনে ওসমানের পিছু নিয়েছিলো।

আমের ইবনে ওসমান উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। আমতা আমতা করে কিছু বলার চেষ্টা করে, যার কোন অর্থ দাঁড়ায় না। আনুশি দক্ষ গোয়েন্দা। তার সন্দেহটা ভিত্তিহীন নয়। বললো– 'শামসুন্নিসা যদি একা হতো তাহলে মনে করতাম, রাজকন্যা তোমাকে দখল করে রেখেছে। কিন্তু বিষয়টা ছিলো ভিন্ন। আচ্ছা বলো তো, তুমি আমাকে গোপন বিষয়াদি কেন জিজ্ঞেস করো?'

'এমনিই'– আমের মুচকি হেসে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে– 'এমনিতেই জিজ্ঞেস করি। ওসব রাজকীয় ব্যাপারের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক থাকতে পারে। মনে কৌতূহল জাগে, আমরা রাজা-বাদশাহদের কী ভাবি, আর আসলে তারা কী।'

'আমের!'– আনুশি অত্যধিক ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– 'তুমি জানো না আমি কে। আমার এক ইশারায় এই নগরীর প্রতিটি ইট খসে পড়তে বাধ্য। আমার পিপাসু আবেগ আমাকে ধোঁকা দিলো। আমি তোমার প্রেমের নেশায় নিজের কর্তব্য ভুলে গেলাম আর তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছো। তারপরও আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি দুর্বলতা কাজ করছে। তার প্রমাণ, তুমি এখানে নিরাপদে অবস্থান করছো। আমি চাইলে তোমাকে সেই কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা রাখতে পারতাম, যেখানে নির্যাতনের পর গাদ্দার ও গোয়েন্দাদের ফেলে রাখা হয়। তোমাকে আমি সেই জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছি। শুধু এটুকু স্বীকার করো, আমার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ঐ অচেনা লোকটাকে দিয়েছো এবং সংবাদ নিয়ে লোকটা কায়রো চলে গেছে। তুমি আমার নিষ্ঠা আর ভালোবাসার প্রমাণ দেখো, আমি তোমাদের দেখে ফেলার পরও লোকটাকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছি। আমি ইচ্ছা করলে তাকে গ্রেফতার করাতে পারতাম। কিন্তু তোমার ভালোবাসা আমাকে এ কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে।'

আনুশির চোখে অশ্রু এসে যায়– 'যে আমি নিজেই চিত্তাকর্ষক প্রতারণা, সেই আমি ধোঁকায় পড়ে গেলাম। তুমি জিতে গেছো আমের, তুমি জিতে গেছো। ভালোবাসার কাছে আমি পরাজিত। বলো, সত্য বলো আমের!'

'হ্যাঁ, আনুশি'– আমের বললো– 'তুমি তোমার কর্তব্য পালন

করেছো, আর আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আমাকে তুমি কয়েকখানায় বন্দী করে রাখো।'

আনুশির গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়াতে থাকে। হঠাৎ সে অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'ব্যস, এতোটুকুই জানবার প্রয়োজন ছিলো, যা তুমি স্বীকার করেছো। আমি তোমাকে বন্দী করাতে পারবো না। এখন আমিও এই পিঞ্জিরা থেকে মুক্ত হতে চাই। তুমি মদপান করো না। আমাদের সম্রাটগণ যে শরবত পান করেন, আমি তোমাকে সেই শরবত পান করাবো।'

আনুশি বসা থেকে ওঠে টেবিলটার নিকট গিয়ে দাঁড়ায়। টেবিলের উপর একটি সোরাহি রাখা আছে। তার পিঠটা আমেরের পিঠের দিকে। আনুশি দু'টি পেয়ালা নিয়ে নখের সাহায্যে আংটিতে স্থাপন করা ডিবাটা খোলে। ডিবার কিছু পাউডার এক পেয়ালায়, কিছু অপর পেয়ালায় ঢেলে দেয়। বিষয়টা আমের দেখতে পায়নি। আনুশি উভয় পেয়ালায় সোরাহি থেকে শরবত ঢেলে একটি আমেরের হাতে তুলে দেয়, অপরটি নিজের হাতে রাখে।

'শুকে দেখো'– আনুশি বললো– 'এগুলো শরাব নয় শরবত। এ আমার প্রিয় পানীয়। নাও পান করো।'

আনুশি নিজের পেয়ালাটা ঠোঁটে লাগায়। আমেরও পান করতে শুরু করে। ঢক ঢক করে পান করে উভয়ে পেয়ালা শূন্য করে ফেলে। আনুশি আমেরের হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমেরের গলাটা নিজের বাহুতে জড়িয়ে ধরে বললো– 'এখন আমরা স্বাধীন।'

আনুশি হঠাৎ লাফিয়ে আমের থেকে আলাদা হয়ে বলে ওঠে– 'তুমি তন্দ্রা অনুভব করছো?'

'হ্যাঁ'– আমের উত্তর দেয়– 'তোমার ডাক পেয়ে আমি ঘুম থেকে উঠে এসেছি। নিদ্রা আমাকে অস্থির করে তুলছে।'

'এখন আমরা উভয়ে এমন গভীর ঘুম ঘুমাবো যে, কেউ আমাদের জাগাতে পারবে না'– আনুশি আচ্ছন্ন কণ্ঠে বললো– 'আমি তোমার চেয়ে বেশি ক্লান্ত। পাপের বোঝা আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে।

মেয়েটির মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়তে শুরু করে। সে আত্মসংবরণ করে বললো– 'বেশি কথা বলার সময় নেই আমের। তুমি আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। এখন আমরা পরকালে একসঙ্গে উত্থিত হবো। আমি আমার কর্তব্য আদায় করেছি। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন

করেছো। এই শরাবে আমি সেই বিষ মিশিয়েছি, যে বিষ দিয়ে আমাদেরকে বিদেশ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। বস্তুটা প্রয়োজনের সময়কার জন্য দেয়া হয়। এই বিষপানে কোন তিক্ততা অনুভব হয় না। অত্যন্ত মিষ্টি আবেশের মধ্যে মানুষ চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। আমি এই জন্য জীবিত থাকতে চাই না, যদি জীবিত থাকি, তাহলে তোমাকে শাস্তি দিতে হবে। তোমাকে এ কারণে জীবিত থাকতে দেইনি, যেনো অন্য কোন মেয়ে বলতে না পারে আমেরের সঙ্গে আমার ভালোবাসা আছে।'

আমের ইবনে ওসমান শুয়ে পড়েছে। যেনো সে আনুশির বক্তব্য শুনতেই পাচ্ছে না। তার চোখ দুটো বুজে আসছে। আনুশির মাথাটা দুলছে। সে নড়বড়ে পায়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। সেবিকা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভেতরে ডেকে এনে বললো– 'আমরা দু'জনে বিষপান করেছি। তুমি সকলকে বলে দেবে, আমরা স্বেচ্ছায় বিষপান করেছি। অন্য কেউ পান করায়নি। কোন খৃস্টানের দেখা পেলে বলবে, তাদের সুদানী পরী তার কর্তব্য পালন করে চিরবিদায় নিয়েছে।'

আনুশির কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসছে। পড়তে পড়তে আমেরের নিকট চলে যায়। সেবিকা দৌড়ে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দু'জন লোক কক্ষে প্রবেশ করে। তারা দেখতে পায়, আমের ইবনে ওসমান পালঙ্কের উপর পড়ে আছে আর আনুশি তার গা ঘেঁষে এমনভাবে শুয়ে আছে যে, তার মাথা আমেরের বুকের উপর আর একহাত মাথার উপর। এক হাতের আঙ্গুলগুলো আমেরের চুলের ভেতর ঢুকে আছে, যেনো মেয়েটি আমেরের মাথায় বিলি কাটছে। দু'জনই মৃত।

ইসহাক তুর্কি এখন মসুল থেকে বেরিয়ে গেছে। অপরিচিত লোকটা সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর হতে পারে সন্দেহ করেও আনুশি তাকে ধাওয়া করেনি, গ্রেফতার করাবার চেষ্টা করেনি। ভালোবাসার প্রতারণার মধ্যে যে সামান্য সময়টা আমেরের সঙ্গে অতিবাহিত করেছে, এ সময়টুকুতে সে আত্মিক প্রশান্তি পেয়েছিলো। সেই ভালোবাসার বিনিময় হিসেবে মেয়েটি ইসহাককে নিরাপদে চলে যেতে দিয়েছে।

কায়রো পৌঁছতে আরো দিন কয়েকের পথ বাকি থাকতেই সাপটা ইসহাকের ঘোড়াটাকে দংশন করে। অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে কায়রো যাচ্ছিলো ইসহাক, যার সঙ্গে ইসলামের মর্যাদা ও সুলতান

আইউবীর অস্তিত্বের সম্পর্ক। ইসহাক এক মর্দে মুজাহিদ। জীবনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এই বিস্তৃত নির্দয় মরুদ্যান অতিক্রম করে সেই তথ্য নিয়ে কায়রো পৌঁছুতে চাচ্ছিলো। কিন্তু সাপ ঘোড়াটাকে দংশন করায় ইসহাক মরুর নির্মম আচরণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। যখন জ্ঞান ফিরে, সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ইসহাক তখন খৃস্টানদের তাঁবুতে পড়ে আছে। ইসহাক চোখ খুলে দেখতে পায়, দু'টি মেয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্তারিত কাহিনী আপনারা পেছনে পড়ে এসেছেন।

ইসহাক তুর্কি অচৈতন্য অবস্থায় বিড় বিড় করতে থাকে। অজ্ঞাতসারে তার উচ্চারিত শব্দগুলো থেকে খৃস্টান দলটি বুঝে ফেলে লোকটি মুসলমান গোয়েন্দা এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে কায়রো যাচ্ছে। দুই মেয়ে মেরিনা ও বারবারার মধ্যে মন কষাকষি ছিলো। তারা উভয়ই কমান্ডারকে পেতে চাচ্ছিলো। কিন্তু কমান্ডার বারবারাকে প্রেমের ধোঁকা দিয়ে মেরিনার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। বারবারা প্রতিশোধ ...ার লক্ষ্যে ইসহাককে বলে দেয়, তুমি খৃস্টান গোয়েন্দাদের জালে এসে পড়েছো। ইসহাক তাদের এই জালে এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, সে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়, আমি সুলতান সালাহুদ্দীনের গোয়েন্দা এবং হাল্‌ব থেকে এসেছি। খৃস্টানদের দলনেতা তাকে জিজ্ঞেস করে, কী সংবাদ নিয়ে যাচ্ছিলে? ইসহাক বললো, নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রোজি খাতুন ইয্‌যুদ্দীনকে বিয়ে করেছেন। দলনেতা বললো, এ খবর বাসি হয়ে গেছে। তোমাদের সুলতান এখন সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

খৃস্টান দলনেতা জানতে চায়, বলো, তুমি কী কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলে। বৈরুতে তোমাদের মুসলমান গোয়েন্দারা কারা এবং তাদের আস্তানা কোথায়। যদি না বলো, তাহলে খৃস্টান অঞ্চলে নিয়ে তোমাকে কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখা হবে। ইসহাক এই ভেবে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছিলো যে, পালানোর একটা সুযোগ বের করে নিতে হবে। খৃস্টান দলনেতা তাকে খৃস্টানদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করার প্রস্তাব করলে ইসহাক তাতেও সম্মত হয়ে যায়। কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলে এই প্রশ্নের উত্তরে ইসহাক আসল তথ্য ফাঁস না করে তাদের বুঝ দেয়ার চেষ্টা করে। সিরিয়ার মুসলিম আমীদের সম্পর্কে কিছু কথা বললেও বৈরুতের বিষয়টা সম্পূর্ণ চেপে যায় ইসহাক।

খৃস্টান দলটির সদস্য সংখ্যা আট। তারা কায়রোতে দায়িত্ব পালন

করে বৈরুত ফিরে যাচ্ছে। দলনেতা ইসহাককে বললো, আমরা রাতে রওনা হবো। তারা বৈরুত যাচ্ছে এবং তাকেও ধৃত হয়ে বৈরুত যেতে হবে শুনে ইসহাকের পিলে চমকে ওঠে। ওখানে গেলে নাইটের সঙ্গেও তার দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইসহাকের জন্য এটা আসল সমস্যা নয়– আসল সমস্যা হচ্ছে সুলতান আইউবীকে বল্ডউইনের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজন ছিলো এবং তাকে সতর্ক করার আবশ্যক ছিলো, যেনো তিনি বৈরুত অভিযান মুলতবী রাখেন। এ দায়িত্ব পালন করতে পারলে ইসহাকের জীবন দিতেও পরোয়া ছিলো না। কিন্তু এখন তো সে শত্রুর হাতে বন্দি এবং নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে।

কাফেলা রাতে রওনা হয়। হাত দুটো পিঠমোড়া করে বেঁধে ইসহাককে একটা উটের পিঠে বসিয়ে দেয়া হয়। এই উটের উপর মালামালও বোঝাই করা। সুলতান আইউবীর এই গোয়েন্দা বৈরুত থেকে কায়রো রওনা হয়েছিলো। কিন্তু কায়রো না পৌঁছেই মাঝপথ থেকে এখন পুনরায় বৈরুত যেতে হচ্ছে। দূরত্ব অনেক দীর্ঘ। কাফেলা এগিয়ে চলছে। ইসহাক তুর্কি পালানোর পথ খুঁজে ফিরছে।

'আমি আর একটা দিনও অপেক্ষা করতে পারি না'– সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের বললেন– 'ফৌজ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। ফৌজকে এভাবে বেশি দিন রাখা উচিত নয়। অন্যথায় সৈনিকদের স্নায়ু ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়বে। আর এই অবস্থাটা যুদ্ধের জন্য ক্ষতিকর হয়। তাছাড়া আমি খৃস্টানদেরকে প্রস্তুত অবস্থায় ঝাপটে ধরতে চাই। অতীতে আমরা যখনই যুদ্ধ করেছি, নিজেদের অঞ্চলে করেছি। আর এই ভেবে আনন্দিত হয়েছি যে, আমরা দুশমনকে পিছু হটিয়ে দিয়েছি। দুশমন আমাদেরই ভূখণ্ডে আক্রমণ করলো আবার পিছপা হয়ে আমাদেরই মাটিতে অবস্থান নিয়ে থাকলো। এখন আমার প্রতিটি পদক্ষেপ আক্রমণাত্মক ও হিংস্র হবে। ফিরিঙ্গি বাহিনী বৈরুতে অবস্থান করছে। তাদের ব্যাপারে আমি কোন সংবাদ পাইনি। বল্ডইউন যদি তৎপরতা চালাতো, তাহলে আমি সংবাদ পেতাম। আমার অনুমান হচ্ছে, সে আর অন্যান্য খৃস্টানরা মুসলমান আমীরদেরকে তাদের সমর্থক ও আমাদের শত্রু বানানোর কাজে ব্যস্ত। তারা আমাদেরকে আরেকবার গৃহযুদ্ধে জড়াতে চায়। তারা গোপন তৎপরতায় ব্যস্ত রয়েছে। আমরা

বৈরুত অবরোধ করবো। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডটি আমাদের দখলে এসে যাবে।'

সালরদের এই বৈঠকে সুলতান আইউবীর নৌ-বাহিনী প্রধানও উপস্থিত আছেন। এক মিসরী কাহিনীকার মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ তার নাম হুসামুদ্দীন লুলু লিখেছেন। তিনি নৌ-যুদ্ধের বিশেষজ্ঞ এবং অতিশয় যোগ্য নৌ-বাহিনী প্রধান হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। বৈরুত যেহেতু রোম উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিলো, তাই সুলতান আইউবী ঘেরাও পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সমুদ্রের দিক থেকেও বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

'যে ইউনিটগুলোর নৌযানে যাওয়ার এবং তীরে অবতরণ করার কথা, তারা ইসকান্দারিয়া পৌঁছে গেছে। হুসামুদ্দীনকে যাবতীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'নৌপথে গমনকারী বাহিনী খুব তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। সে জন্য এই বাহিনী কিছুদিন পর রওনা হবে। নৌ-বাহিনী তীরে অবতরণ করবে। দ্রুতগামী দূত এসে আমাদেরকে তাদের অবতরণের সংবাদ জানাবে। নগরীর উপর তাদের আক্রমণ হবে ঝড়গতিতে। ফিরিঙ্গিরা যদি অস্ত্র সমর্পণ না করে, তাহলে আপনাদের সকলের জন্য অনুমতি আছে নগরীটা ধ্বংস করে দিন। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্নদের গায়ে হাত তুলবেন না। তাদেরকে আশ্রয়ে নিয়ে নেবেন। সৈনিকদেরকে হত্যা নয়– বন্দী করবেন। কোন অবস্থাতেই লুটতরাজ করা যাবে না। আপনাদের জন্য অনুমতি থাকবে, যে কেউ আমার নীতি-নির্দেশনা অমান্য করবে, পদমর্যাদায় সে যতোই উচ্চ হোক না কেন, তাকে হত্যা করে ফেলবেন। স্থলপথে গমনকারী বাহিনীর অগ্রযাত্রা শান্তির ধারায় নয়– যুদ্ধের গতিতে হবে। বিরতি হবে তাঁবু ছাড়া। বিরতির সময় মালামাল খোলা ও নামানো যাবে না। সকলে পানি পাবে সীমিত পরিমাণে। খাদ্য রান্না হবে না। খেজুর ইত্যাদি শুকনো খাবার সঙ্গে যাচ্ছে। পশুগুলোকে পর্যাপ্ত খাবার দেয়া হবে।'

সুলতান আইউবী চওড়া একখণ্ড কাপড়ের উপর কায়রো থেকে বৈরুত পর্যন্ত ভূখণ্ডের মানচিত্র আঁকিয়ে রেখেছিলেন। এখন সেটিকে দেয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে অগ্রযাত্রার পথের উপর আঙ্গুল রেখে বললেন– 'এটি হবে আমাদের অগ্রযাত্রার রাস্তা।'

বৈঠকের নীরবতা আরো অধিক গভীর হয়ে যায়। সুলতান আইউবী সকলের চেহারার প্রতি তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন– 'আপনারা নীরব কেন? বলছেন না কেন, আমরা তাহলে শত্রুর অঞ্চলের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করছি?... আমার বন্ধুগণ! আমরা সাবধানতার নীতির ভিত্তিতে যুদ্ধ করছি। যাত্রা শুরু করার আগে আমরা পার্শ্বের নিরাপত্তা ও পিছু হটার পথ দেখে আসছি। তার ফল হচ্ছে, খৃস্টানরা আমাদের ফিলিস্তীন দখল করে আছে এবং দামেশ্‌ক-বাগদাদ দখল করে মক্কা-মদীনা অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা এঁটে রেখেছে। যিয়াদের পুত্র তারেক যদি মিসরের উপকূলে বসে থাকতেন, তাহলে ইউরোপ পর্যন্ত ইসলামের পতাকা কোনদিন পৌঁছতো না। কাসেমের পুত্র মুহাম্মদ এতো বিপজ্জনক ও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভারত পৌঁছেছিলেন। খৃস্টানরা বহু দূর থেকে আমাদের ভূখণ্ডে এসেছিলো। ইসলামের সমুন্নতি যদি কাম্য হয়, তাহলে আমাদেরকে আগুনের মধ্যদিয়েও অতিক্রম করতে হবে। আর যদি রাজ্য শাসন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আসুন মিসর-সিরিয়াকে ভাগ করে নিয়ে আমরা প্রত্যেকে রাজা হয়ে যাই। তারপর আপন আপন রাজত্বকে অটুট রাখার জন্য নিজেদের দ্বীন ও ঈমান বন্ধক রেখে ইহুদী-খৃস্টানদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করি।'

'মহামান্য সুলতান!'– এক সালার দাঁড়িয়ে বললো– 'আমরা আপনার আদেশ-নির্দেশনার অপেক্ষায় অপেক্ষমান। দুশমনের অঞ্চলের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে বলে আমরা একজনও ভীত নই। আপনি বলুন এই পথ অতিক্রমে আমাদের বিন্যাস কী হবে? বাহিনী কি যার যার হেফাজত নিজে করবে?'

'না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি সেই দিক-নির্দেশনার দিকেই আসছিলাম। প্রতিটি ইউনিট অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে। ডানে-বাঁয়ে, আগে-পিছে কী ঘটছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। রসদ একসঙ্গে যাচ্ছে না। রসদগুলো কয়েকভাবে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে, যাতে শত্রুরা এগুলো ধ্বংস করতে না পারে। গেরিলা বাহিনী পুরো বাহিনীর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করবে। গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার সায়েম মিসরী এখানে উপস্থিত আছে। তাকে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি তার গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও মহড়া সম্পন্ন করে ফেলেছেন। অন্য সকলে বৈরুতের উপর দৃষ্টি রাখবে।'

সব রকম দিক-নির্দেশনা প্রদান করে সুলতান আইউবী বললেন– 'রওনা আজ রাতের প্রথম প্রহরে হবে। সবচেয়ে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে– এখন এই কক্ষে আমরা যে ক'জন আছি, তার অতিরিক্ত একজনও যেনো না জানে আমাদের গন্তব্য কী। সৈনিক-কমান্ডাররাও যেনো জানতে না পারে আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

সুলতান আইউবীর কল্পনায়ও নেই যে, বৈরুতে তাকে স্বাগত জানানোর আয়োজন সম্পন্ন করে রাখা হয়েছে এবং ফিরিঙ্গিদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ঝাপটে ধরা তাঁর সম্ভব হবে না।

রাতের প্রথম প্রহর। বাহিনী রওনা হচ্ছে। সুলতান আইউবী তাঁর হাই-কমান্ডের সালারদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি ইউনিটের সালাম গ্রহণ করছেন এবং দু'আ দিচ্ছেন। তাঁর পার্শ্বে তাঁর এক পুত্রের ওস্তাদ আতালীক দণ্ডায়মান। সুলতান আইউবী ওস্তাদ ও আলেমদের বেশ মর্যাদা দিতেন। মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, বাহিনীর শেষ ইউনিটটি অতিক্রম করে যাওয়ার পর সুলতান আইউবী রওনা হতে উদ্যত হন। এমন সময় পুত্রের ওস্তাদ আতালীক একটি আরবী পংক্তি আবৃত্তি করেন, যার অর্থ হচ্ছে– আজ নজদের আরার ফুলের সুগন্ধি উপভোগ করে নাও। সন্ধ্যার পর এই ফুল পাওয়া যায় না।

মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, সে সময় পর্যন্ত সুলতান আইউবীর মেজাজ উৎফুল্ল ছিলো। কিন্তু পংক্তিটা কানে আসার পর তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। তার চেহারার দ্যোতি উবে যায়। বিদায়কাল এই পংক্তিটা তার কাছে অশুভ বলে মনে হলো। তিনি বাহিনীর পেছনে পেছনে রওনা হয়ে যান। পথে সালারদের বললেন– 'আমার আশা ছিলো বিদায়কালে লোকটা আমাকে দুআ দেবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে এমন একটা পংক্তি শোনালেন, যেটি আমার হৃদয়ের উপর ভার সৃষ্টি করে দিয়েছে।

ঘটেছেও তাই। এই রওনার পর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আর মিসর ফিরে আসতে পারেননি। পরবর্তী বাকি জীবন তার আরব ভূখণ্ডের যুদ্ধের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। মিসরবাসী আরার ফুল আর কখনো দেখতে পায়নি।

সুলতান আইউবী ১১৮২ সালের মে মাসে মিসর থেকে রওনা হয়েছিলেন।

খৃস্টান গোয়েন্দা ও নাশকতা কর্মীদের কাফেলা ইসহাককে নিয়ে

এগিয়ে চলছে। ইসহাক তাদের কয়েদী। এখন তার হাত-পা বন্ধনমুক্ত। ইতিপূর্বে দু'দিন দু'রাত খাওয়ার সময় ছাড়া সারাক্ষণ তার হাত-পা বাঁধা থাকতো। ইসহাক দলনেতাকে বললো, আমি পালাবো না। বস্তুত তার পালাবার সুযোগও নেই আর পালিয়ে যাবেওবা কোথায়। বড়জোর দু'ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে পারবে। তারপর নির্দয় মরুভূমি তাকে এমন অবেচতন করে নিঃশেষ করে ফেলবে, যেমনটি অজ্ঞান অবস্থায় সে ধরা পড়েছিলো। দলনেতা সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করে ইসহাকের বাঁধন খুলে দিয়ে সকলকে বলে রাখে, এর প্রতি নজর রাখবে। ইসহাক কথাবার্তা ও হাবভাবে তাদের আস্থা অর্জন করে নয়। সে সুলতান আইউবী এবং অন্যান্য মুসলিম শাসকদের গালমন্দ করতে শুরু করে। ইসহাক খৃস্টান দলনেতাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, আমি আপনাদের গোয়েন্দা হয়ে যাবো। কিন্তু দলনেতা যখনই তাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলে, তখন সে সঠিক উত্তরদানে বিরত থাকছে।

দুই খৃস্টান মেয়ের শত্রুতা যথারীতি চলছে। মেরিনা তার নেতার প্রিয়পাত্রী হয়ে আছে। আর বারবারা এমনভাবে বিতাড়িত হয়ে আছে যে, দলনেতা যখনই তার সঙ্গে কথা বলছে, বলছে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার সাথে। রাগে-ক্ষোভে ফুঁসে আছে বারবারা। ইসহাক যে তথ্য নিয়ে কায়রো যাচ্ছিলো, মেরিনা তার পক্ষ থেকে সেসব বের করে নেয়ার তালে ব্যস্ত। এই রূপসী মেয়েটি রাতের পর রাত ইসহাকের পাশে বসে তাকে উত্তেজিত করার সব রকম প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু ইসহাক যেনো পাথরের মূর্তি। বারবারার ঐকান্তিক কামনা ইসহাক বারবারাকে কোন তথ্য না দিক।

দলনেতার পরের অবস্থান মার্টিন নামক এক ব্যক্তির। এই লোকটি বারবারার প্রেমের প্রিয়াসী। কিন্তু বারবারা তাকে কোন সুযোগ দিচ্ছিলো না। মার্টিন তাকে হুমকিও প্রদান করেছিলো, এ শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে। এই হুমকি তাকে দলনেতাও দিয়েছিলো। মেয়েটি পূর্ব থেকেই নিরাশ। এবার সে ভয়ও পেতে শুরু করেছে।

মেরিনার অবজ্ঞামূলক কথাবার্তায় বারবারার রক্ত চড়ে যায়। একদিন মেরিনা তাকে বললো– 'বারবারা! তুমি এ কাজের যোগ্য নও। তোমার খুলিতে মগজই নেই। তোমাকে নাচ-গানের আর বেশ্যালয়েই বেশ মানায়। আমি মরু অঞ্চলে এসেও একটি মুসলমান গোয়েন্দাকে ধরে

ফেলেছি। এটি আমার শিকার। তুমি তার কাছে ঘেঁষবে না। বৈরুতে গিয়ে আমি এই কৃতিত্বের পুরস্কার লাভ করবো।'

বারবারা জ্বলে ওঠে। আজ ক্ষোভের জোয়ারে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। মার্টিন তো তার পেছনে ঘুর ঘুরই করছে। বারবারা রাতে তার নিকট গিয়ে বললো, আমি মেরিনা থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই। সে আশঙ্কাও প্রকাশ করে, বৈরুত পৌঁছার পর মেরিনা যে কোন কৌশলে তাকে শাস্তি দেয়াবে। মার্টিনের সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে। মার্টিনকে মেয়েটির এমন একটি দুর্বল পরিস্থিতিরই প্রয়োজন ছিলো। সুযোগটা হাতে এসে যায় তার। সে বারবারাকে সর্বাত্মক সাহায্য দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। বিনিময় দাবি করে শুধু এটুকু যে, তুমি আমার হয়ে যাবে। বারবারা অভদ্র মেয়ে নয়। মার্টিন তার নিকট যা দাবি করেছে, তা দেয়া মেয়েটির পক্ষে কোন ব্যাপার নয়। সে সম্মত হয়ে যায়। বারবারা পাপের মাঝে প্রতিপালিত এবং পাপের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি নষ্টা মেয়ে। মার্টিন তৎক্ষণাৎ একটা পরিকল্পনা ঠিক করে নেয় এবং বারবারাকে অবহিত করে। পরিকল্পনাটা আগামী রাতে বাস্তবায়ন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখে।

পরবর্তী রাত। আজ যে স্থানটায় অবস্থান গ্রহণ করা হলো, এটি মরুভূমির এক ভয়ঙ্কর এলাকা। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্ময়কর ও অভিনব আকৃতির অসংখ্য টিলা দাঁড়িয়ে আছে। কোনটি দেখতে স্তম্ভ ও মিনারের ন্যায়। কোনটি আঁকাবাঁকা দেয়ালের মতো। কোনটি যেনো আস্ত একটা প্রাণী। টিলাগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। পানি ও গাছ-গাছালির চিহ্নও নেই। রাতের বেলা টিলাগুলোকে মনে হচ্ছে যেনো কতগুলো দানব দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসার পর কাফেলা এই ভূখণ্ডে এসে যাত্রাবিরতি নেয়। মার্টিন অন্ধকারে নিজের ঘোড়াটা নিজ তাঁবুর সঙ্গে বেঁধে যিনটা খুলে কাছেই এক স্থানে রেখে দেয়।

ইসহাকের তাঁবুটা মার্টিনের তাঁবুর কাছে স্থাপন করা হয়েছে। দলনেতা এখন ইসহাক সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। রাতে উট-ঘোড়ার আশপাশে রক্ষীরা ঘুমায়। ইসহাক ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাবে এমন আশঙ্কা নেই। ঘোড়ার পিঠে যিন কষে পালাতে গেলে কেউ না কেউ টের পাবেই। কাফেলার সদস্যরা সকলেই ক্লান্ত। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে ইসহাকও। মধ্যরাতে গায়ে কারো আলতো পরশ অনুভব করে জেগে ওঠে ইসহাক। ফিসফিস কণ্ঠ শুনতে পায়-

'ওঠো, পাশের তাঁবুর সঙ্গে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই যিন পড়ে আছে। দেরি করো না, পালাও।'

'কে তুমি?'

'বারবারা'– মেয়েটি উত্তর দেয়– 'তোমার প্রতি আমার এই সহানুভূতি কেন সে প্রশ্ন করো না। আমিই তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, আমরা খৃষ্টান গোয়েন্দা। তুমি সময় নষ্ট করো না। সকলে ঘুমিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ওঠো। যে তাঁবুর সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা আছে, তার ডানদিকে যাবে। সামনে পথ পরিষ্কার। আমি আমার তাঁবুতে চলে যাচ্ছি।'

বারবারা নিজ তাঁবুতে চলে যায়। ধনুক ও তূনীরটা হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। বারবারা সেই পথের এক ধারে বসে যায়, সে পথে ইসহাককে পালাতে বলেছিলো।

ইসহাক দ্রুততার সাথে যিন বেঁধে ঘোড়াটা খুলে পা টিপে টিপে এগুতে শুরু করে। বালুর কারণে ঘোড়ার পায়ের কোন শব্দ হচ্ছে না। কাফেলার সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ইসহাক তাঁবু এলাকা থেকে বেশ দূরে গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয় এবং কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে এবার জোরে ঘোড়া হাঁকায়। হঠাৎ মরুর শীতল রাতের নীরবতা ভেদ করে একটা শাঁ শব্দ কানে ঢুকে ইসহাকের। সেই সঙ্গে একটা তীর এসে গেঁথে যায় তার পিঠে। পরক্ষণে এসে বিদ্ধ হয় আরেকটা তীর। সঙ্গে নারী কণ্ঠের চীৎকার– 'পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে, ওঠো, জাগো, বন্দি পালিয়ে গেছে।'

সবাই ধড়মড় করে জেগে ওঠে। বারবারা চীৎকার করে বেড়াচ্ছে- 'বন্দি পালিয়ে গেছে।' তার হাতে ধনুক। তাড়াতাড়ি করে ঘোড়া ছুটানো হয়। বেশি দূর যেতে হলো না। ইসহাক দু'টি তীর পিঠে নিয়ে পড়ে আছে। ঘোড়াটা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তীর নিকট থেকে ছোঁড়া হয়েছে। দেহের গভীরে গেঁথে আছে তীর দু'টি। তবে এখনো হুঁশ আছে ইসহাকের। তাকে তুলে নেয়া হলো। দলনেতা তাকে জিজ্ঞেস করে– 'পলায়নে কি তোমাকে কেউ সহায়তা করেছিলো?' ইসহাক বললো– 'না, আমি ঘোড়া আর যিন দেখতে পেলাম। সকলে ঘুমিয়ে ছিলো। আমি পালিয়ে এলাম।' এটুকু বলার পরই ইসহাক চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। আর তার জ্ঞান ফিরে আসেনি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা ইসহাক তুর্কী শহীদ হয়ে যায়।

'আমি লোকটাকে ঘোড়ায় আরোহণ করতে ও পালাতে দেখি'– বারবারা

বললো– 'ঘটনাক্রমে আমার তাঁবুতে ধনুক ও তূনীর ছিলো। আমি তূনীর-ধনুক তুলে নিয়ে তার পিছনে ছুটে গেলাম। পরপর দু'টি তীর ছুঁড়লাম। তীরটি ছুটেই গেঁথে যায়। অন্যথায় লোকটা পালিয়ে গিয়েছিলো।'

'আজই এমন কী ঘটলো যে, তোমার তাঁবুতে তীর-ধনুক ছিলো?' মেরিনা বারবারাকে জিজ্ঞেস করে।

'আর মার্টিন! এই ঘোড়াটা তোমার ছিলো'– দলনেতা বললো– 'এটা কোথায় ছিলো? এর যিন কোথায় ছিলো?'

'ঘোড়াটা বন্দির তাঁবুর নিকট বাঁধা ছিলো।' এক রক্ষী উত্তর দেয়।

'তোমরা আমার এ কৃতিত্বটা মাটি করে দেয়ার চেষ্টা করছো।' বারবারা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'লোকটা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে কায়রো যাচ্ছিলো। আমি তাকে প্রতিহত করেছি। তাকে নয়– আমি বরং আমাদের স্বার্থ পরিপন্থী একটি গোপন তথ্য কায়রো পৌছানো ঠেকিয়েছি।'

ঘটনাটা মূলত একটা নাটক। মেরিনার শত্রুতা উদ্ধারের লক্ষ্যে বারবারার পক্ষে প্রস্তুত করে দেয়া মার্টিনের ষড়যন্ত্র। মার্টিন এভাবেই উপকার করে বারবারাকে পেতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাদের দলনেতা একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। সে বারবারা ও মার্টিনের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– 'মার্টিন! এ পেশায় আমি তোমার অনেক আগে এসেছি। বৈরুতে পৌছানোর আগে আগে যথার্থ একটা উত্তর ঠিক করে ফেলো।"

ঘটনাটা লোকগুলোর ব্যক্তিগত শত্রুতার ও বন্ধুত্বের রাজনীতি। যার শিকার হতে হলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন মূল্যবান গুপ্তচরকে।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে সুলতান আইউবীর বাহিনী। অর্ধেক পথ অতিক্রম করে তারা এখন যে অঞ্চলে এসে উপনীত হয়েছে, সেটি খৃস্টান কবলিত এলাকা। বাহিনীর সকল সৈন্যের আকৃতি-গঠন এখন একই রকম। ধূলি-বালির স্তর জমে জমে এখন আর কাউকে চেনা যাচ্ছে না।

এখন মে মাস। মরুভূমি পোড়ানো লোহার ন্যায় উত্তপ্ত। সকলের মুখ-মাথা কাপড়ে আবৃত। অনুমতি ছাড়া পানি পান করতে পারছে না কেউ। বাহিনীর কোন বিন্যাস নেই। উট-ঘোড়ার আরোহীরা পদাতিকদের পালাক্রমে সওয়ার করিয়ে পথ চলছে। আকাশটা জ্বলছে। আর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' মুখরিত ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কয়েকজন সৈনিক মিলে সম্মিলিত কণ্ঠে আবেগময় গান গাইছে আর

তার তালে তালে সুর লহরীতে মুগ্ধ হয়ে ফৌজ এগিয়ে চলছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ফৌজের মধ্যস্থলে অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি নিজের জন্য পানি পান নিষিদ্ধ করে রেখেছেন। হঠাৎ তিনি ঘোড়ার গতি পরিবর্তন করে অন্য একদিকে ছুটে যান। তাঁর হাইকমান্ডের সালার ও অপরাপর আমলাগণ– যাদের মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন দূতও ছিলো– তার পেছনে চলে যান। সম্মুখেই সেই জায়গা, যেখানে ইসহাক তুর্কি শহীদ হয়েছিলো। ভয়ানক আকৃতির কতগুলো টিলা। সুলতান আইউবী টিলাগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে যান এবং গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার সারেমকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'দোস্ত! এখান থেকেই তোমার কাজ শুরু হচ্ছে। ইউনিটগুলোকে ছড়িয়ে দাও। প্রতিটি বাহিনী অন্য অপর বাহিনী থেকে দূরে থাকবে। প্রথম বাহিনীটিকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও।'

'আর বাকি ফৌজ এভাবেই চলতে থাকবে'– সারেম মিসরীর চলে যাওয়ার পর সুলতান আইউবী অন্যদের বললেন– 'যে কোন পরিস্থিতিতে ফৌজ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে। আমরা শত্রুর অঞ্চলে এসে পড়েছি।'

জরুরী দিক-নির্দেশনা প্রদান করে সুলতান আইউবী ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাতে শুরু করেন। হঠাৎ এক ধারে তিনি এমন কিছু চিহ্ন দেখতে পান, যাতে প্রমাণিত হয় এখানে কোন পথিক অবস্থান নিয়েছিলো। সেখানেই একটি লাশ পড়ে আছে দেখা গেলো, যার অধিকাংশ বালিতে ঢেকে আছে। সুলতান আইউবী দাঁড়িয়ে যান। লাশটা অক্ষত নেই। হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে শুধু। একজন কঙ্কলটা সোজা করে দেখায়। পিঠে দু'টি তীর গেঁথে আছে। চেহারার গোশত শুকিয়ে গেছে।

'বাদ দাও এসব'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কোন কাফেলার কেউ নিহত হয়েছে মনে হয়। মরুভূমিতে এসে মানুষ পাগল হয়ে যায়।'

সুলতান আইউবী জানেন না, এই কঙ্কাল তাঁরই একজন মূল্যবান গোয়েন্দা ইসহাক তুর্কির, যে বলতে যাচ্ছিলো, আপনি বৈরুত যাবেন না। ওখানে খৃস্টানরা যেভাবে তাদের সৈন্যদের ছড়িয়ে রেখেছে, তার নকশা বক্ষে এঁকে মিসর যাচ্ছিলো ইসহাক। এখন সুলতান আইউবীর সঙ্গে ইসহাকের সাক্ষাৎ হয়েছে বটে; কিন্তু তার কংকাল সুলতানকে কিছুই জানাতে পারলো না।

সুলতান আইউবীর গেরিলা বাহিনীটি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, তারা

অগ্রসরমান মূল বাহিনীর উভয় পার্শ্বে দু'তিন মাইল দূর পর্যন্ত চলে গেছে। কয়েকটি ইউনিট চলে গেছে পেছনে। বৈরুত থেকে অনেক দূরেই তাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তারা ভয়ানক অঞ্চলটা অতিক্রম করে চলে গেছে।

ফৌজ এগিয়ে চলছে।

মধ্যরাতে ছাউনি ফেলার আদেশ জারি হয়। বাহিনী দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু গেরিলা ইউনিটগুলো সক্রিয় ও তৎপর থাকে। তাদের জন্য নির্দেশ হলো, সন্দেহভাজন কাউকে দেখা গেলে এবং সে পালাবার চেষ্টা করলে মেরে ফেলবে। কোন কাফেলার দেখা পেলে তাদেরও গতিরোধ করে তল্লাশি নেবে।

বাহিনী এগিয়ে চলছে ও যাত্রাবিরতি দিচ্ছে। সূর্য উদিত হচ্ছে এবং মুজাহিদ বহরটিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অস্ত যাচ্ছে। সুলতান আইউবীর নিকট প্রথম সংবাদ আসে, তাঁর একটি গেরিলা ইউনিট খৃস্টানদের একটি সীমান্ত চৌকির উপর হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। মরু অঞ্চল শেষ হতে চলেছে। গাছ-গাছালি চোখে পড়তে শুরু করেছে। কোথাও সবুজের সমারোহ দেখা যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম-জনবসতিও চোখে পড়ছে।

বৈরুতে বল্ডউইন তার বিভিন্ন সামরিক শাখা থেকে রিপোর্ট গ্রহণ করছেন। তার নিকট সংবাদ এখনো সেটিই যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বৈরুত অবরোধ করবেন। তিনি সুলতানকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করে রেখেছেন বটে; কিন্তু পরবর্তী আর কোন সংবাদ পাননি, সুলতান আইউবী কায়রো থেকে রওনা হয়েছেন কিনা।

এতোক্ষণে খৃস্টান গোয়েন্দা কাফেলাটিও বৈরুত পৌঁছে গেছে। কিন্তু তারাও সম্রাট বল্ডউইনকে কোন সংবাদ জানাতে পারেনি। বল্ডউইন তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ-পঁচিশজনের একটি অশ্বারোহী দলকে সম্মুখে প্রেরণ করেছিলেন। তারাও ফেরত আসেনি। তারা ফেরতে আসতে পারবেও না।

বল্ডউইনের অশ্বারোহী বাহিনীটি অনেক দূর চলে গিয়েছিলো। তারা দূর থেকে এক স্থানে এমন ধারায় ধূলি উড়তে দেখে, যা কোন কাফেলার হতে পারে না। মাটি থেকে উত্থিত এই ধূলিমেঘ কোন সৈন্য বাহিনীর ছাড়া অন্য কারো হতে পারে না। তারা টিলার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। কমান্ডার একটি টিলার উপর উঠে দেখতে শুরু করে। হঠাৎ একদিক থেকে একটি তীর এসে তার ঘাড়ে বিদ্ধ হয়। অন্যান্য আরোহীরা নীচে ছিলো। হঠাৎ তাদের উপরও তীরবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। তাদের কয়েকজন পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সারেম মিসরীর গেরিলারা

তাদেরকে জীবিত পালাতে দিলো না। সব ক'জনকে খুন করে তাদের অস্ত্র ও ঘোড়াগুলো দখল করে নেয়।

কোন সংবাদ না পাওয়া সত্ত্বেও বল্ডউইন ও তার প্রধান সেনাপতি নিশ্চিন্ত। তারা বৈরুতকে অবরোধ থেকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাদের চিন্তামুক্ত হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, সুলতান আইউবী এখনো কায়রো থেকে রওনা হননি এবং যুদ্ধ এখনো বহুদূর। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সুলতান আইউবী যতোই সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন, গেরিলাদের আক্রমণ ও তৎপরতার সংবাদ ততোই বেশি আসছে। এখন তো এমন সংবাদও আসতে শুরু করেছে যে, এতো মাইল দূরে দুশমনের একটি বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে এতোজন গেরিলা শহীদ ও এতোজন আহত হয়েছে। এ ধরনের প্রতিটি সংবাদে সুলতান আইউবী একই উত্তর দিচ্ছেন– 'শহীদদেরকে কোথাও দাফন করে রাখো আর আহতদের পেছনে পাঠিয়ে দাও।'

সুলতান আইউবী তার বাহিনীকে এমন অঞ্চল দিয়ে নিরাপদে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে স্থানে স্থানে শত্রুর উপস্থিতি বিদ্যমান। এটা তার পরম সামরিক যোগ্যতার প্রমাণ। তার স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের গেরিলা ইউনিট আক্রমণ চালাতে চালাতে এবং শত্রুর শক্তি খর্ব ও ব্যর্থ করতে করতে এগিয়ে চলছে। কোথাও গেরিলা আক্রমণ শেষ পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধের রূপ ধারণ করছে। কিন্তু গেরিলারা একস্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে না। এই রক্তপাত সুলতান আইউবীর বাহিনী থেকে দূরে দূরে ঘটে চলছে।

হুসামুদ্দীন লুলুর নৌ-বহর ইসকান্দারিয়ায় প্রস্তুত অপেক্ষমান। প্রস্তুত নৌ-সেনারাও। হুসামুদ্দীন সুলতান আইউবীর দূরত্ব ও গতি অনুমান করে রেখেছেন। একদিন তিনি বাহিনীকে জাহাজে আরোহণ করার আদেশ প্রদান করেন এবং রাতের বেলা জাহাজের নোঙ্গর তুলে পাল উড়িয়ে দেন। নদীর বুক চিরে জাহাজ এগুতে শুরু করে। মুক্ত সমুদ্রে গিয়ে হুসামুদ্দীন জাহাজগুলোকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেন। তিনি একজন সুদক্ষ নৌ-প্রধান। তার জাহাজে করে ফৌজ যাচ্ছে, তার সালার ও নায়েব সালারগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা অন্ধকারে যাচ্ছে না। খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তারা মৎস্য শিকারীর বেশে ছোট ছোট নৌকায় করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু সৈনিককে আগেই পাঠিয়ে রেখেছে।

কয়েকদিন ও কয়েক রাতের পথ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। দিগন্তে বৈরুত চোখে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এখনো কোন নৌকা ফিরে আসেনি। হুসামুদ্দীন জাহাজের গতি থামিয়ে দেন এবং খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য অপর একটি নৌকা নামিয়ে দেন। রাতে তার দণ্ডায়মান জাহাজের সন্নিকটে সমুদ্র থেকে এক ব্যক্তি চীৎকার করে বললো— 'রশি ফেলো, রশি ফেলো।' রশি ছুঁড়ে ফেলা হলো। রশি বেয়ে এক নৌ-সেনা উপরে উঠে আসে। লোকটা অর্ধমৃত। সে বললো, খৃস্টানদের একটি নৌকা তাদের নৌকার গতিরোধ করেছিলো। তাতে সৈন্য ছিলো। উভয়পক্ষে তীর বিনিময় হয়। আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমার সঙ্গীরা ধরা কিংবা মারা পড়েছে। আমি সংবাদ জানাতে এসেছি যে, দুশমন সজাগ রয়েছে।

এই ঘটনায় বুঝা গেলো, খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য প্রথমে যে লোকদের প্রেরণ করা হয়েছিলো, তারা ধরা পড়েছে এবং সম্ভবত তাদের মাধ্যমে দুশমন নৌ-বহর আগমনের তথ্যও পেয়ে গেছে।

হুসামুদ্দীন লুলুর নৌ-বহর আর বৈরুতের মাঝে এখন দূরত্ব এতোটুকু যে, সূর্যাস্তের পর পর পাল তুললে জাহাজ মধ্যরাত নাগাদ কূলে ভিড়তে পারবে। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, খৃস্টানরা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করার জন্য কূলে মিনজানিক স্থাপন করে রাখতে পারে। তা-ই যদি হয়, তাহলে জাহাজগুলোকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এই ভয়ে পিছিয়ে থাকাও উচিত হবে না। সুলতান আইউবীর সমুদ্রের দিক থেকে সাহায্যের খুবই প্রয়োজন। এমন সময়ে তারা একটা নৌকা দেখতে পায়। নৌকাটা তাদের বহরের। তার সৈনিকরা সমুদ্র থেকে দু'জন খৃস্টান সৈন্যকে ধরে নিয়ে এসেছে। খৃস্টানদের যে নৌকাটি হুসামুদ্দীনের বহরের নৌকার উপর আক্রমণ করেছিলো, এরা তার মধ্যে ছিলো। তারা আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর মুসলিম সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে যায়। প্রথমে কোন তথ্য দিতে সম্মত না হলেও হাত-পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেয়ার হুমকি দেয়া হলে তারা তথ্য দেয়, কূলে বল্ডউইনের সৈন্যরা ওঁৎ পেতে আছে এবং বহরে আগুন ধরানোর জন্য মিনজানিক প্রস্তুত রয়েছে। এই ধৃত সৈন্যদের থেকে আরো তথ্য পাওয়া গেলো, বৈরুতের ফৌজ ভেতরে কম এবং বাইরে শহর থেকে দূরে দূরে বেশি।

সংবাদটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সুলতান আইউবীর নৌ-বাহিনী প্রধান

হুসামুদ্দীন রীতিমতো ভাবনায় ডুবে যান। তারা পরস্পর মতবিনিময় করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ফিরিঙ্গিরা আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে গেছে। বিষয়টা সুলতান জানেন কিনা কে জানে। সিদ্ধান্ত হলো, সুলতানকে সংবাদটা পৌঁছানো হবে। এ সময় তার বৈরুতের কাছাকাছি থাকার কথা।

তৎক্ষণাৎ জাহাজ থেকে দু'টি নৌকা নামানো হলো। দু'জন দূতকে দু'টি ঘোড়া দিয়ে তীরে কোথায় অবতরণ করবে এবং কোন্‌দিকে যাবে বলে দেয়া হলো। দূতরা সুলতান আইউবীকে সংবাদ জানানোর জন্য রওনা হয়ে যায়।

দূতরা রাতারাতি গন্তব্যে পৌঁছে যায়। কিন্তু ততোক্ষণে সুলতান আইউবী ফিরিঙ্গিদের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন। তিনি বৈরুত অবরোধ করেছিলেন। স্থলের সবদিকে সৈন্য ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। রিজার্ভ ফোর্সের একটি ইউনিটকেও জবাবি আক্রমণের লক্ষ্যে ব্যবহার করে ফেলেছেন সুলতান। ফিরিঙ্গিরা কঠোরভাবে তার মোকাবেলা করে। পরদিন অবরোধের অপর একটি অংশের উপর আক্রমণ হয়। সুলতান আইউবী তাদের বিরুদ্ধেও রিজার্ভ ফোর্স প্রেরণ করেন। এবার তিনি ভাবনায় পড়ে যান, আমি তো রিজার্ভ ফোর্স ব্যবহার করা ছাড়াই যুদ্ধ জয় করে নিতাম। কিন্তু এখানে তো রিজার্ভ ফোর্সের অর্ধেক শক্তি শুরুতেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। তিনি অবরোধকে দুর্বল করতে চাচ্ছিলেন না। এবার তার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করে।

সুলতান আইউবীর অনুসন্ধান ও গেরিলা ব্যবস্থাপনা ছিলো খুবই উন্নত। তিনি সংবাদ পেতে শুরু করেন, পেছনে সবদিকে শত্রুর উপস্থিতি বিদ্যমান। একটি গেরিলা ইউনিটের একজন মাত্র সৈনিক রক্তরঞ্জিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। লোকটি মাত্র এটুকু বলে শহীদ হয়ে গেছে যে, তার পুরো বাহিনী ফিরিঙ্গিদের বেষ্টনীতে এসে পড়েছিলো। সে ছাড়া আর একজনও জীবন রক্ষা করতে পারেনি এবং আমাদের এই অবরোধ ফিরিঙ্গিদের বিপুলসংখ্যক সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

তার পরক্ষণেই নৌ-দূতরা এসে পৌঁছে। তারা সুলতান আইউবীকে সংবাদ জানায় এবং হুসামুদ্দীনের জন্য নির্দেশ কামনা করে।

'খৃস্টানদেরকে আমি এরূপ প্রস্তুত অবস্থায় কখনো দেখিনি'– সুলতান আইউবী তার হাইকমান্ডের সালার প্রমুখদের বললেন– 'স্পষ্ট বুঝতে

পারছি, তারা সময়ের আগেই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলো যে, আমরা বৈরুত অবরোধ করতে যাচ্ছি। এখন আমরা নিজেরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। ঠিকানা থেকে এতো দূরে এসে পরাজিত যুদ্ধ লড়া যায় না।' তিনি হুসামুদ্দীনের দূতদেরকে বললেন– 'তোমরা হুসামুদ্দীনকে বহর নিয়ে ফিরে যেতে এবং তার সৈন্যদেরকে ইসকান্দারিয়া নেমে দামেশ্ক রওনা হতে বলো।'

দূতরা চলে গেলে সুলতান আইউবী মসুল অভিমুখে পিছপা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু পিছপা হওয়াও সহজ নয়। এ কাজেও গেরিলাদের ব্যবহার করা হয়। রাতে বাহিনীকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে এনে বের করে দেয়া হলো। কিছু সংঘাতের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু গেরিলা ও পশ্চাৎ বাহিনী জীবন ও রক্তের নজরানা দিয়ে বাহিনীকে সেখান থেকে বের করে আনে। ফিরিঙ্গিরা ধাওয়া করেনি।

মসুলের পথে সুলতান আইউবীর মসুল থেকে আসা এক গোয়েন্দার সাক্ষাৎ ঘটে। সে ইসহাক তুর্কির রওনা হওয়া এবং মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীনের পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি তথ্য প্রদান করে। সুলতান ক্ষোভে লাল হয়ে যান। তিনি মসুল অবরোধ করার আদেশ জারি করেন।

কাজী বাহউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ১১৮২ সালের ১০ নবেম্বর মোতাবেক ৫৭৮ হিজরীর ১১ রজব বুধবার মসুলের নিকটে গিয়ে পৌঁছেন। আমি তখন মসুল ছিলাম। ইয্‌যুদ্দীন আমাকে বললেন, আপনি গিয়ে খলীফার নিকট থেকে সাহায্য নিন। আমি দজলার কোল ঘেঁষে ঘেঁষে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মাত্র দু'দিন দু'ঘণ্টায় বাগদাদ পৌঁছে যাই। খলীফা আমাকে বললেন, তিনি শাইখুল উলামাকে বলে মসুল ও সুলতান আইউবীর মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেবেন। মসুলের গবর্নর আজারবাইজানের শাসনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি যে শর্ত আরোপ করেন, তার চেয়ে ভালো ছিলো ইয্‌যুদ্দীন সুলতান আইউবীর হাতে অস্ত্র সমর্পণ করবেন।'

সন্ধি-সমঝোতার আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যায়। ১১৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর মোতাবেক ১৬ শাবান ৫৭৮ হিজরী সুলতান আইউবী মসুলের অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন এবং নাসীবা নামক স্থানে ফৌজকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ দেন।

সারা
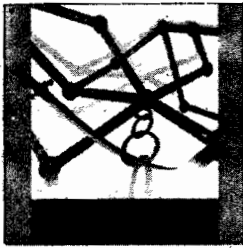
'বৈরুতের অবরোধ খৃস্টানরা নয়, আমার ঈমান নিলামকারী ভাইয়েরা ব্যর্থ করেছে'– সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের বললেন– 'আমি পারস্পরিক খুনাখুনি, রক্তারক্তি থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সম্ভব মনে হচ্ছে না।'

বৈরুত অবরোধের ব্যর্থতা ছিলো সুলতান আইউবীর দ্বিতীয় পরাজয়। এই ব্যর্থতায় তিনি কিছুই হারাননি বটে, তবে অর্জনও হয়নি কিছুই। এ কারণে এই ব্যর্থতাকে তিনি পরাজয় বলেই ধরে নেন। তিনি না হোন, তার ইন্টেলিজেন্স এখানে অবশ্যই পরাজিত হয়েছে। বৈরুতের খৃস্টান বাহিনী সময়ের আগেই তথ্য পেয়ে গিয়েছিলো, সুলতান আইউবী বৈরুত অবরোধ করতে আসছেন। খৃস্টানরা এ সংবাদ পেয়েছে কায়রো থেকে। অথচ সুলতান তাঁর হাইকমান্ডের সালারগণ ব্যতীত কাউকে তাঁর পরিকল্পনা জানতে দেননি।

'একে আপনি পরাজয় বলবেন না'– সুলতান আইউবীর হতাশা দেখে এক সালার বললেন– 'বৈরুত যেখানে ছিলো সেখানেই আছে এবং সেখানেই থাকবে। আমরা নগরীটা পুনরায় আক্রমণ করবো।'

'এতো বড় একটা শিকার আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে'– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন– 'আমি নগরীটা অবরোধ এবং দখল করতে এসেছিলাম। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। আমি নিজেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়লাম এবং অবরোধ প্রত্যাহার করে পেছনে সরে আসতে বাধ্য হলাম। এটা পরাজয় নয় তো কী? আমাদেরকে মেনে নেয়া উচিত এটা পরাজয়। আমার সালার-উপদেষ্টাদের মধ্যেও গাদ্দার আছে।'

তাঁবুতে নীরবতা নেমে আসে। কারো মুখে টু-শব্দটি নেই। সে সময়ে সুলতান আইউবী নাসীবা নামক স্থানে সেনা ছাউনিতে অবস্থান করছিলেন। বহু দিন কেটে গেছে। বাহিনী অনেক ক্লান্ত। বহু জখম ও আছে। সুলতান তাঁর এই বাহিনীকে কায়রো থেকে বৈরুতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিয়ে

এসেছিলেন। বাহিনী কয়েক মাসের পথ কয়েক দিনে অতিক্রম করে এসেছে। গন্তব্যে এসে পৌঁছানোর পরপরই খৃস্টানদের অবরোধ থেকে বের হওয়ার জন্য তাদেরকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লড়তে এবং পরক্ষণেই দ্রুতগতিতে পিছনে সরে আসতে হয়েছিলো। বাহিনীকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দেয়ার জন্য সুলতান আইউবী নাসীবা নামক স্থানে ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ দেন। কিন্তু বিশ্রাম ছিলো শুধু বাহিনীর জন্য। সুলতানের নিজের কোন বিশ্রাম নেই। চোখে ঘুমটি পর্যন্ত নেই তাঁর। দিনে হয় তাঁবুতে পায়চারি করছেন কিংবা বাইরে বের হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছেন। সালারদের সাথেও তেমন কথা বলছেন না। ঠিক এমন এক অবস্থায় এক সালার তাকে বললেন, আপনি একে পরাজয় বলবেন না। সুলতানের উত্তর শুনে সালার নিশ্চুপ হয়ে যান। সুলতান তাঁবুতে পায়চারি করতে থাকেন। সেখানে আরো একজন সালার ছিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে নীরব থাকেন। সুলতান আইউবীর মেজাজে রাগ বলতে ছিলো না। তথাপি সালারগণ তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেতেন।

'তোমরা দু'জনে কী চিন্তা করছো?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'আমি ভাবছি, আপনি যদি এভাবে হতাশা ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকেন, তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত আরো ক্ষতিকর হতে পারে'– এক সালার বললেন– 'রামাল্লার পরাজয়ের সময়ও আমি আপনাকে এই অবস্থায় দেখিনি। আপনি ঠাণ্ডা হোন এবং এই আবেগময় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন।'

'আর আমি ভাবছি'– অপর সালার বললেন– 'কাফেররা আমাদের মূলে ঢুকে পড়েছে। এই মুহূর্তে আমরা যে ভূখণ্ডে অবস্থান করছি, এটি আমাদেরই ভূমি। আমাদের যুদ্ধ খৃস্টানদের সঙ্গে। আর আমাদের লক্ষ্য ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা। অথচ মুসলিম আমীরদের একজনও আমাদের সঙ্গে আসেনি। ইয্‌যুদ্দীন-ইমাদুদ্দীন কোথায়? তারা কি আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়নি যে, প্রয়োজনের সময় তারা আমাদেরকে সৈন্য দেবে? তাদের এই আচরণ প্রমাণ করে, এখনো তারা খৃস্টানদের হাতের পুতুল। তো আমরা কি এভাবেই পরস্পর লড়াই করতে থাকবো?'

সুলতান আইউবী তাঁবুতে পায়চারি করছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে যান। আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমার রাসূলের উম্মতের পতন শুরু হয়ে গেছে। মুসলমান যখন বিজাতির অনুসরণ শুরু

করে, তার পরিণতি এটাই হয়, আমরা এখন যা প্রত্যক্ষ করছি ও ভুগছি। ইহুদী-খৃস্টানরা মুসলমানদেরকে তাদের গোলাম বানানোর জন্য মানব স্বভাবের সবচেয়ে বড় দুর্বলতাটাকে কাজে লাগায়। তা হচ্ছে লোভ। ক্ষমতার লোভ, রাজা-রাজপুত্র হওয়ার লোভ এবং আমি তুলার ন্যায় নরম পালিচার উপর দিয়ে হাঁটবো আর সাধারণ মানুষ খালি পায়ে আমার সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকবে এই লোভ। এসব লোভ যখন মানুষের অন্তরে ঢুকে পড়ে, তখন হৃদয় থেকে ঈমান চলে যায়। বিবেকের উপর এমন আবরণ পড়ে যায় যে, তার কাছে জাতীয় চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু থাকে না। এমন মানুষ অর্থ, ক্ষমতা আর বিলাসিতা ছাড়া কিছুই বুঝে না। একজন মানুষ যখন এই চরিত্র ধারণ করে, তখন সে নিজ ধর্ম ও দেশ-জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকে গৌরবজনক চরিত্র মনে করে। খৃস্টানরা আমাদের অধিকাংশ আমীরকে এই স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তারা তাদের সভ্যতার বেহায়াপনাকে মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের সভ্যতা যখন বদলে যায়, তখন ধর্ম একটা দুর্বল খোলসে পরিণত হয়, যা খুলে ছুঁড়েও ফেলা যায় এবং জাতিকে ধোঁকা দেয়ার জন্য গায়ে জড়িয়েও নেয়া যায়।'

উভয় সালার চুপচাপ সুলতান আইউবীর বক্তব্য শুনছেন। সুলতান থেমে থেমে বলছিলেন। এবার থেমে যান। আবার গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন– ' তোমরা বুঝতে পারছো না, আমি কর্মক্ষেত্রের পুরুষ, এখন কিনা তাঁবুতে দাঁড়িয়ে নারীর ন্যায় কথা বলছি। এটিও আমার পরাজয়। এই মুহূর্তে আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস থাকার কথা ছিলো। আমার কপাল মসজিদে আকসায় সেজদা করতে ছটফট করছে। যেসব মুজাহিদ ফিলিস্তীনের মর্যাদা ও আযাদীর জন্য জীবন ত্যাগ করেছে, আমাকে তাদের রক্তের বদলা নিতে হবে।'

সুলতান আইউবীর কণ্ঠে আক্রোশ চড়ে গেছে। তিনি পায়চারি করতে করতে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন– 'তোমরা কি সেই শিশুদের মুখ দেখাতে পারবে, যাদেরকে আমার নির্দেশ ও প্রত্যয় এতীম করেছে? তোমরা কি সেই নারীদের সম্মুখে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে, যাদের স্বামীরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে আমাদের সঙ্গে এসেছিলো এবং তাদের রক্তাক্ত দেহ ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়েছে? তোমরা সেই সুদর্শন যুবকদের কীভাবে ভুলতে পারবে, যারা আমাদের থেকে বহু দূর দুমশনের অঞ্চলে গিয়ে শহীদ

হয়েছে? আমি তো তাদের মায়েদের সম্মুখে যেতে ভয় পাই। ভয়টা এই জন্য যে, যদি কেউ বলে বসে, হয় আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও, নতুবা আমাকে প্রথম কেবলায় নিয়ে চলো। ওখানে গিয়ে আমি আমার পুত্রের শাহাদাতের শুকরিয়া নামায আদায় করবো। তখন আমি সেই মাকে কী জবাব দেবো?'

'শহীদদের রক্ত বৃথা যাবে না মাননীয় সুলতান'— কণ্ঠটা কমান্ডো বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরীর, যিনি সুলতান আইউবীর তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ভেতরের কথোপকথন শুনছিলেন।

'কোন শহীদের মা নিজ পুত্রের রক্তের হিসাব চাইবেন না। রাসূলের কালেমা পাঠকারী মায়েদের দুধ যমযমের পানির চেয়ে পবিত্র ও মর্যাদাবান। সেই দুধে প্রতিপালিত পুত্ররা আপনার নির্দেশে নয়— আল্লাহর আদেশে যুদ্ধ করছে। তাদের রক্তের দায় আপনি নিজ কাঁধে তুলে নেবেন না। আপনি গাদ্দারদের রক্তের কথা বলুন। আমাদের তারবারী গাদ্দারদের রক্তের পিয়াসী।'

'তুমি আমার মনোবলে জীবনদান করেছো সারেম'— সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন— 'আমার এই দুই বন্ধুও আমাকে বলছিলো, আপনার হতাশ ও আবেগপ্রবণ হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

'কোনই প্রয়োজন নেই'— সারেম মিসরী বললেন— 'পরাজয় পরাজয়ই। কিন্তু স্থায়ী নয়। আমরা এই পরাজয়কে বিজয়ে পরিবর্তন করে ফেলতে পারি এবং তা করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ।'

'বিষয়টা যদি রণাঙ্গনের হতো, তাহলে একটি বাহু কাটা গেলেও আমি নিরাশ ও পেরেশান হতাম না'— সুলতান আইউবী বললেন— 'সমস্যা তো হলো দুশমন মাটির নীচে চলে গেছে। ইহুদী-খৃস্টানরা আমাদের জাতির মাঝে এমন সব বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করছে, যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও যাদুময়। দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। সৈনিক ও সাধারণ জনগণ এসব প্রভাব গ্রহণ করে না। এই বিষ বরণ করে নিচ্ছে এমন গুটিতক মানুষ, জাতির উপর যাদের প্রভাব বিদ্যমান। এরা হচ্ছে আমীর ও শাসক গোষ্ঠী। কতিপয় ধর্মীয় নেতাও এদের অন্তর্ভুক্ত। আছে কিছু সালারও, যারা প্রজাতন্ত্রের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এরা ঈমান নিলামকারীদের দল, যারা সহজ-সরল মানুষগুলোকে ধর্মের ধোঁকা দিয়ে তাদের মাঝে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করছে এবং তাদের মুসলমান

ভাইদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। বিজাতিরা এ জাতীয় মুসলিম আমীর ও শাসকদেরকে তাদের অনুগত বানিয়ে নিচ্ছে এবং তাদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী কাজ করাচ্ছে। এরা সাধারণ মানুষকে ধর্মের ধোঁকা দিয়ে নিজেদের চরিত্রটাকে আড়াল করে রাখছে।'

'কিন্তু আমরা আলেম নই'— এক সালার বললেন— 'আমরা মসজিদের খতিব-ইমাম নই যে তরবারী ফেলে দিয়ে আমরা জনসাধারণকে ওয়াজ করে বেড়াবো। আমাদেরকে এই সমস্যার সমাধান তরবারির মাধ্যমেই করতে হবে। এই পাথরগুলোকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে হবে।'

'এরা কুরআন অস্বীকারকারী'— সুলতান আইউবী বললেন— 'কুরআনের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু ভেবো না। তাদের কথা শোনো না। তোমরা জানো না, তাদের অন্তর আমাদের বিরুদ্ধে পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ।'

'এরা নামের মুসলমান'— সারেম মিসরী বললেন— 'কুরআনের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

'এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ক্ষতিকর যে, তারা কুরআনও হাতে তুলে রেখেছে, আবার কাফেরদের ইশারায়ও নাচছে'— সুলতান আইউবী বললেন- 'জাতি সবসময় এমন নেতাদের হাতেই প্রতারিত হয়েছে, যাদের হাতে কুরআন আর অন্তরে ক্রুশ। এরা আযানের শব্দ শুনে নিশ্চুপ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের হৃদয়ে বাজে গীর্জার ঘণ্টা। জাতি তাদের আসল রূপ দেখতে পায় না, তাদের হৃদয়ের আওয়াজ শুনতে পায় না। এ কারণেই আমরা একটি গৃহযুদ্ধে একে অপরের রক্ত ঝরিয়েছি এবং আরেকটি গৃহযুদ্ধের তরবারী আমাদের ঘাড়ের উপর ঝুলছে।'

'এই তুফান আমরা প্রতিহত করবোই'— এক সালার বললেন— 'আপনি আমাকে এ কথা বলার অনুমতি দিন যে, এখন আর আমরা কোন সন্ধি-চুক্তি করবো না। আমাদেরকে আপন ভাইদের রক্ত ঝরাতে হবে এবং তাদের হাতে আমাদেরকে প্রাণও দিতে হবে।'

সুলতান আইউবীর চেহারা মলিনতায় ছেয়ে যায়। তার চোখ দুটো যেনো দিগন্তে কিছু একটা দেখছে। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, তাঁর দৃষ্টি অনাগত শতাব্দীগুলোর বুক বিদীর্ণ করে ফিরছে। তাঁবুতে পুনরায় গভীর নীরবতা

নেমে আসে। তিন সালার তাদের সুলতানের এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন।

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার রাসূলের উম্মত আপসে লড়াই করে করে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইহুদী-খৃস্টানরা তাদেরকে আজীবন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করে রাখবে। ক্ষমতার মোহ ভাইকে ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত করে রাখবে। ফিলিস্তীন রক্তে লাল হতে থাকবে। মুসলিম শাসকগণ শতধা বিভক্ত হয়ে বিলাসিতায় ডুবে থাকবে। আমাদের প্রথম কেবলা আল্লাহর রাসূলের উম্মতকে চীৎকার করে ডাকতে থাকবে; কিন্তু কোন মুসলমান সাড়া দেবে না। কেউ যদি ফিলিস্তীনের মাটিকে মুক্ত করাতে উঠে দাঁড়ায়, তো সে হবে আমাদেরই ন্যায় কোন এক পাগল। এই পাগলদেরকে তাদেরই মুসলিম শাসকগণ ধোঁকা দেবে এবং তলে তলে বন্ধু হয়ে থাকবে। তোমরা বলেছো, আমরা এই ঝড় প্রতিহত করতে পারবো। কিন্তু আমাদের মৃত্যুর পর এই ঝড় পুনরায় উত্থিত হবে।'

'তখন আবার আরেকজন সালাহুদ্দীন জন্মলাভ করবেন'– সালার সারেম মিসরী বললেন– 'তখন আরেকজন নূরুদ্দীন জঙ্গীর আবির্ভাব ঘটবে। মুসলিম মায়েরা মুজাহিদ জন্ম দিতে থাকবে।'

'আর এই মুজাহিদরা বিলাসী শাসকদের হাতের খেলনা হয়ে থাকবে'– সুলতান আইউবী খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন– 'আর সেই সময়টাও এসে যাবে, যখন সেনাবাহিনীও বিলাসী সৈনিকে পরিণত হবে এবং তাদের সালার কাফেরদের হাতে খেলতে থাকবে।'

বলতে বলতে সুলতান আইউবী এমন ধারায় থেমে যান, যেনো তার কিছু মনে পড়ে গেছে। তিনি পালাক্রমে তিন সালারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'কিন্তু আমরা কতোক্ষণ পর্যন্ত এভাবে কথা বলতে থাকবো? আমরা চারজন একে অপরকে বক্তব্য শোনাচ্ছি। আল্লাহর সৈনিকরা বক্তৃতা করে বেড়ায় না। আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমরা কর্মক্ষেত্রের পুরুষ। সারেম! তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রথম নির্দেশনা মোতাবেক তোমার গেরিলা বাহিনীকে আমার বর্ণিত স্থানগুলোতে ছড়িয়ে রেখেছো। আর তুমি তো জানো, আমাদের এই ছাউনি অঞ্চল কিরূপ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।'

'ভালোভাবেই জানি, মুহ্তারাম সুলতান!'– সারেম মিসরী উত্তর দেন– 'আমরা বৈরুতের অবরোধ প্রত্যাহার করে যখন এদিকে চলে আসি, তখন

আমাদের প্রত্যাশার বিপরীতে খৃস্টানরা আমাদের ধাওয়া করতে ফৌজ প্রেরণ করেনি। কিন্তু আমরা এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইনি যে, খৃস্টানরা আমাদেরকে ক্ষমা করবে। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, তারা আমাদের উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ করবে না। আমাদের উপর তারা আমাদেরই ধারায় গেরিলা আক্রমণ চালাবে। বরং তাদের গেরিলা ও কমান্ডো আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। ছাউনি অঞ্চলের অনেক দূর থেকে ফিরিঙ্গি ও আমাদের টহল বাহিনীগুলোর ছোট ছোট সংঘাতের সংবাদ আসতে শুরু করেছে। আমি আমার গেরিলা ইউনিটগুলোকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রেখেছি। আমার সন্দেহ, কাফেরদের আস্তানা বাইরে কোথাও নয়, মসুলেই বিদ্যমান এবং মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীন তাদের আশ্রয় ও সাহায্য প্রদান করছেন।'

'তা-ই যদি হয়ে থাকে, আমি সংবাদ পেয়ে যাবো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'ক্রুসেডারদের গোপন আস্তানা যদি মসুলেই হয়ে থাকে, তাহলে আমি তার ব্যবস্থা করবো।'

সুলতান আইউবী অন্যান্য সালারদের উদ্দেশে বললেন– 'মুসলিম আমীরদের দুর্গগুলো মসুল ও হাল্‌বের মধ্যখানে অবস্থিত। আমাদেরকে সেগুলো দখল করতে হবে। আমি এই শহর দু'টিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই। তাহলে তারা একে অপরকে সহযোগিতা দিতে পারবে না। তাদের দূতরাও চলাচলের পথ পাবে না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, যাতে আমার তরবারী কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে খাপ থেকে বের না হয়। কিন্তু তাতে আমি সফল হইনি। আমি সেই শাসক ও আমীরদের খতম করে ছাড়বো, যারা খৃস্টানদেরকে বন্ধু বানিয়ে রেখেছে। যেসব আমীর-শাসক জাতিকে বিভ্রান্ত করছে, আমি তাদের ঘাড় মটকে তবে ক্ষান্ত হবো।'

সুলতান আইউবী মানচিত্রটা বের করে সালারদের দেখাতে শুরু করেন।

❖ ❖ ❖

সম্রাট বল্ডউইন বৈরুতে তার প্রাসাদে সকল সেনা অধিনায়ক এবং জনাচারেক খৃস্টান সম্রাটকে নিমন্ত্রণ করেছেন। সকলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বিশাল ভোজের আয়োজন। অসংখ্য খৃস্টান অতিথির মাঝে দু'জন মুসলমানও মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। মদ পরিবেশনকারী মেয়েগুলো এরূপ পাতলা পোশাক পরিহিত, যেনো তারা বিবস্ত্র। মদের ক্রিয়া যতোটা বাড়ছে, মেয়েগুলোর সঙ্গে

অতিথিদের অসদাচরণ ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেয়েগুলোও ধীরে ধীরে অধিক থেকে অধিকতর বেহায়াপনা প্রদর্শন করে চলছে। অন্যদের তুলনায় মুসলিম অতিথি দু'জনের প্রতি মেয়েদের মনোযোগ বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষভাবে দু'টি মেয়ে তাদের আশপাশে ফাং ফাং করে ঘুরে বেড়াচচ্ছে। পোশাক ও আকার-গঠনে এই অতিথিদেরকে রাজপরিবারের সদস্য বলে মনে হচ্ছে।

এক খৃস্টান এসে বললো, সম্রাট বল্ডউইন আপনাদেরকে তার কক্ষে যেতে বলেছেন। মদের পেয়ালা রেখে দিয়ে তারা বল্ডউইনের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে। তাদেরকে যে সরু গলিটি অতিক্রম করে বল্ডউইনের কক্ষে যেতে হয়েছে, তাতে এক ব্যক্তি বর্শা হাতে সামরিক কায়দায় টহল দিচ্ছিলো। বিশেষ ধরনের পোশাক পরিহিত লোকটা। কোমরে তরবারী ঝুলছে। মাথায় সীসার চকমকে শিরোস্ত্রাণ। প্রাসাদে এ ধরনের আরো কয়েকজন লোক বুক টানটান করে বিশেষ ভঙ্গিতে টহল দিয়ে ফিরছে দেখা যাচ্ছে। এরা প্রাসাদের খাস কর্মচারি, যাদের দায়িত্ব সালারদের কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত থেকে পাহারা দেয়া এবং নিমন্ত্রণের সময় বারান্দা ও গলিপথে টহল দেয়া। প্রদীপের আলোতে তাদের পোশাক ও চাল-চলন ভালোই লাগছে। এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকও বটে।

এই যে লোকটি মুসলমান দু'জনকে বল্ডউইনের কক্ষের দিকে যেতে দেখলো, তার গায়ের রং গৌর। সে দাঁড়িয়ে গিয়ে লোকগুলোর যাওয়া দেখতে থাকে। তারা বল্ডউইনের কক্ষে ঢুকে পড়লে কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দরজার সামনে তারই ন্যায় পোশাকের আরো দু'জন লোক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাদের একজন তাকে বললো- 'হ্যালো জ্যাকব! এদিকে ঘোরাফেরা করছো কেন? ওদিকে গিয়ে পরীদের নাচ দেখো। আমরা তো এখান থেকে এক পাও নড়তে পারছি না।'

জ্যাকব রসিকতার ছলে উত্তর দেয়- 'এই যে দু'জন লোক ভেতরে প্রবেশ করলো, মুসলমান বলে মনে হচ্ছে। এরা কারা?'

'তোমার প্রয়োজন কী?'

'প্রয়োজন তেমন কিছু নেই'- জ্যাকব উত্তর দেয়- 'মুসলমানদের প্রতি আমাদের প্রচণ্ড ঘৃণা তো। কেউ আবার ঠুস করে দেয় কিনা। তাই জিজ্ঞেস করলাম। অতিথি হিসেবে তো আমাদের তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আছে।'

'এরা মুসলমান অঞ্চলের মুসলমান'- সঙ্গী উত্তর দেয়- 'আমি যতোটুকু

জানি, এরা মসুল থেকে এসেছে। খুব সম্ভব ইয্‌যুদ্দীনের দূত।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য এসেছে বোধ হয়'– জ্যাকব বললো– 'এই দূতদের কে বলবে সালাহুদ্দীন আইউবীর শেষ হয়ে গেছে। রামাল্লায় পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসে বৈরুত অবরোধ করতে এসেছে। তার নৌ-বহর সামনে অগ্রসর হওয়ারই সাহস পায়নি। আমার আজীবন আক্ষেপ থাকবে, আমাদের বাহিনী আইউবীর বাহিনীকে ধাওয়া করেনি। অন্যথায় আইউবী আজ আমাদের কারাগারে থাকতো।'

'নিজের কাজ করো দোস্ত'!– এক প্রহরী তাচ্ছিল্যের সুরে বললো– 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বন্দি হলে তার সাম্রাজ্যের তুমি মালিক হবে না। সম্রাট বল্ডউইন মৃত্যুবরণ করলেও বৈরুতের রাজত্ব তোমার নামে লিখে দেয়া হবে না।'

জ্যাকব ওখান থেকে সরে আসে। কিন্তু ঘুরেফিরে সেই বন্ধ কক্ষটি দেখতে থাকে, যার অভ্যন্তরে মুসলমান অতিথি দু'জন হারিয়ে গেছে।

❖ ❖ ❖

লোক দু'জন মসুলের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীনেরই দূত। পূর্বে উল্লেখ করেছি, সুলতান আইউবী যখন বৈরুতের অবরোধ প্রত্যাহার করে মসুলের দিকে চলে গিয়েছিলেন, তখন ইয্‌যুদ্দীন কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদকে বাগদাদের খলীফার নিকট এই আবেদন নিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, যেনো তিনি সুলতান আইউবীর সঙ্গে তাকে সন্ধি করিয়ে দেন। সহজ কথায়, ইয্‌যুদ্দীন আবেদন করেছিলেন, যেনো তাকে সুলতান আইউবী থেকে রক্ষা করা হয়। খলীফা দায়িত্বটা শাইখুল উলামার হাতে অর্পণ করেন এবং সুলতান আইউবী ইয্‌যুদ্দীনকে ক্ষমা করে দেন। ইয্‌যুদ্দীন বাহ্যত সুলতান আইউবীর সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করে চুক্তি করে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তলে তলে খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনের নিকট দু'জন দূত পাঠিয়ে দেন। সেই দূত দু'জনই এখন বল্ডউইনের কক্ষে উপবিষ্ট।

'মসুলের গভর্নর বলেছেন, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে ধাওয়া না করে বিরাট ভুল করেছেন'– বল্ডউইনের উদ্দেশে এক দূত বললো– 'আপনি তার বাহিনীকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাদের গবর্নর বলেছেন, আমি ইচ্ছে করলে লিখিত বার্তা দিতে পারতাম। কিন্তু পথে ধরা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি দামেশ্‌ক অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করুন এবং নগরীটা অবরোধ করে

দখল করে নিন। আপনার বাহিনী যেনো এমন পথে এবং এতা দ্রুত দামেশ্‌ক পৌঁছে যায় যে, সালাহুদ্দীন আইউবী সময় মতো দামেশ্‌ক পৌঁছুতে না পারে। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার আক্রমণের সংবাদ শুনে সালাহুদ্দীন আইউবী যখন এখান থেকে রওনা হবে, তখন মসুল ও হালবের বাহিনী মুখোমুখি এসে লড়াই করার পরিবর্তে আইউবীর বাহিনীর উপর কমান্ডো আক্রমণ চালাতে থাকবে। এতে আইউবীর অগ্রযাত্রা অনেক মন্থর হয়ে যাবে আর আপনি সহজে দামেশ্‌ক জয় করে ফেলতে পারবেন। আমাদের অঞ্চলগুলোতে ছোট ছোট যে ক'জন আমীর আছেন, আমি তাদেরকে দলে ভিড়িয়ে নেবো। আপনি তাদের দুর্গ ব্যবহার করতে পারবেন। আমি আপনার বাহিনীকে মসুলের অভ্যন্তরে অবস্থান করার অনুমতি দিতে পারি না। কারণ, তাতে প্রমাণিত হয়ে যাবে আপনার ও আমার মাঝে ঐক্য আছে। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে বুঝ দিয়ে রেখেছি, আমি তার বন্ধু।'

দূত যখন বার্তাটা বলে শোনাচ্ছিলেন, তখন বল্ডউইনের সঙ্গে তার দু'জন সেনাপতিও ছিলো। ইয্‌যুদ্দীনের দূতও সামরিক উপদেষ্টা। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপার-স্যাপার তার ভালোভাবেই জানা আছে। বল্ডউইন তার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। তিনি বুঝে ফেলেছেন, এই মুসলমানরা তার জালে এসে পড়েছে। তিনি শর্ত আরোপ করতে শুরু করেন।

'ইয্‌যুদ্দীনের বোধ হয় খবর নেই, সালাহুদ্দীন আইউবীকে অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরা তার পক্ষে সম্ভব হবে না'– বল্ডউইন বললেন– 'আমরা দামেশ্‌ক অবরোধ করে ফেললে তিনি বিদ্যুদ্গতিতে অগ্রযাত্রা করে আমাদের উপর পেছনে এদিক থেকে আক্রমণ করবেন। আমরা দামেশ্‌ক অভিমুকে অভিযান পরিচালনা করবো আর আইউবী তা জানবে না এ হতে পারে না। আইউবী চিল-শকুনের ন্যায় বহুদূর থেকে শিকার দেখে ফেলেন এবং এমনভাবে ছোঁ মারেন যে, পেছনে সরে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরা এখনো মুখোমুখি যুদ্ধ করার ঝুঁকি মাথায় নিতে পারি না। আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। আপাতত ব্যবস্থা এটুকু করেছি যে, আমরা কমান্ডো বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকে শান্তিতে বসতে দেবে না। এসব বাহিনীর জন্য আমাদের স্বতন্ত্র আস্তানা দরকার। আপনারা যদি এই ব্যবস্থাটা করে দেন, তাহলে সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীকে এদের দ্বারাই হেস্তন্যাস্ত করে দিতে পারি। তখন তিনি না যুদ্ধ

করতে সক্ষম হবেন, না পালাতে পারবেন। আপনারা আমাদের বাহিনীগুলোকে আশ্রয়, সাহায্য ও খাদ্য ইত্যাদি সরবরাহ করতে থাকবেন। আমরা সরবরাহ করবো অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম। হাল্‌বের গবর্নর ইমাদুদ্দীনকেও বলে দেবেন, তিনি যেনো আমাদের উপর আস্থা রাখেন এবং আমাদের গেরিলা ইউনিটগুলোকে প্রয়োজনের সময় আশ্রয় ও সাহায্য দিতে থাকেন। অন্যান্য আমীর ও দুর্গপতিদেরও আপনাদের সঙ্গ দেয়া উচিত। নজর রাখতে হবে, তাদের কেউ যেনো সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে ঐক্য গড়তে না পারে।'

ঐক্যের শর্তাদি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ইয্‌যুদ্দীন তার দূতদের পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন যেনো তারা শর্ত চূড়ান্ত করে আসে এবং খৃস্টানদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া সমীচীন মনে হবে দিয়ে আসবে। তারা একটি মাত্র স্বার্থে তাদের ঈমান একজন খৃস্টান সম্রাটের নিকট বন্ধক রেখে এসেছে, তাদের শাসন ক্ষমতা নিরাপদ থাকবে। কাজ সমাধান করে দূতরা ভোজসভায় অংশগ্রহণের জন্য উঠে চলে যায়। মনটা তাদের মূলত মদ আর মদ পরিবেশনকারী মেয়েদের সঙ্গেই ঝুলে আছে।

'এই মুসলমানদের উপর বেশি আস্থা রাখবেন না'– এক সেনাপতি বল্ডউইনকে বললো– 'প্রয়োজন হলে তারা আপনাকে কিছু না জানিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে ঐক্য গড়তে সময় লাগবে না।'

'আমার একটা আস্তানা দরকার'– বল্ডউইন বললেন– 'মসুল আমার আস্তানা হয়ে গেলে আমি ধীরে ধীরে পুরো বাহিনীই সেখানে নিয়ে যাবো এবং ইয্‌যুদ্দীনকে সেখান থেকে উৎখাত করবো। আমাদের সকলের পরিকল্পনা এই হওয়া উচিত, আমরা মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেবো না। আমরা তাদেরকে আপসে লড়াতে থাকবো এবং ধীরে ধীরে তাদের ভূখণ্ডগুলো দখল করে নেবো। আমরা দেখেছি, মুসলমানদেরকে ভোগ-বিলাসিতার ও ক্ষমতার লোভ দেখালে তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও ধর্ম আমাদের পায়ের উপর রেখে দেয়। ইয্‌যুদ্দীন-ইমাদুদ্দীন ও অন্যান্য ছোটখাট মুসলমান আমীরগণ শুধু এ কারণে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরোধী যে, তারা প্রত্যেকে স্বাধীন শাসক হতে এবং বিলাসী জীবন লাভ করতে আগ্রহী। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবীর মধ্যে ভোগ-বিলাসিতা ও ক্ষমতার লোভ নেই। তিনি সকলকে এক রণাঙ্গনে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদেরকে ফিলিস্তীন থেকে উৎখাত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু

তিনি যাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাচ্ছেন, তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে ভয় পায়। আমি আশাবাদী, ইয্‌যুদ্দীন ও সাঙ্গরা আমাদের হাত থেকে বের হবে না। কেউ যদি বের হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে আমরা তাকে হাশিশিদের দ্বারা হত্যা করিয়ে ফেলবো।'

বল্ডউইন তার সেনাপতিদের আরো কতিপয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বললেন– 'ইয্‌যুদ্দীনের এই দূতদেরকে এতো খাতির-যত্ন করো, যেনো তাদের বিবেক মরে যায় এবং তাদের জাতি-ধর্মের কথা ভুলে যায়।' বল্ডউইন যে বিষয়টি কঠোরভাবে পালন করতে আদেশ করেন তাহলো, এই কক্ষে দূতদের সঙ্গে যা যা আলোচনা, কথোপকথন ও সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেনো তা কক্ষের বাইরে না যায়। বল্ডউইন বললেন– 'বৈরুতে সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা আছে।'

উভয় দূত মদ ও নারীর নেশায় মাতাল হতে চলেছে। অতিথিগণ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে মদপান ও গালগল্প করছে। জ্যাকব এই দূত দু'জনকে খুঁজে ফিরছে। হঠাৎ সে তাদের একজনকে আলাদা পেয়ে যায়। জ্যাকব তাকে সামরিক কায়দায় সালাম জানায় এবং জিজ্ঞেস করে– 'আপনি বোধ হয় মসুলের মেহমান? আমরা মসুলবাসীদের অনেক ভালোবাসি।'

'আমরা মসুলের শাসক ইয্‌যুদ্দীনের দূত'– দূত মদমাতাল ঢুলু ঢুলু কণ্ঠে বললো– 'আমরা জানতে এসেছি, বৈরুতের খৃস্টানদের অন্তরে মসুলের মুসলমাদের কী পরিমাণ ভালোবাসা আছে।' দূতের কণ্ঠটা যেমন টলমল করছে, তেমনি পা দুটোও কাঁপছে। লোকটা এতো বেশি পান করেছে যে, পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে জ্যাকবের কাঁধের উপর সজোরে হাত মেরে বললো– 'মদের এই এক গুণ যে, মানুষের অন্তর থেকে ধর্ম বেরিয়ে যায় এবং তদস্থলে ভালোবাসা এসে স্থান করে নেয়। আমি ক্রুশ ভালোবাসি। তোমার এই বর্শাটার প্রতি আমার ভালোবাসা আছে। যেদিন এই বর্শা সালাহুদ্দীন আইউবীর বুকে বিদ্ধ হবে, সেদিন আমি প্রধান সেনাপতি হয়ে যাবো।'

জ্যাকব ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ডিউটি তো তার টহল দেয়া। সে ইয্‌যুদ্দীনের দূতকে নড়বড়ে অবস্থায় ফেলে সরে আসে। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পায়, দূতকে দু'জন লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ইয্‌যুদ্দীনের মুসলমান দূত অধিক মদপান করে চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে।

এখন মধ্যরাত। জ্যাকবের ডিউটি শেষ। নাচ-গান চলছে। জ্যাকব ও তার সঙ্গীদের স্থানে অন্য লোক এসে পড়েছে। জ্যাকব নিজ কক্ষে চলে যায়। ডিউটির পোশাক খুলে সাধারণ পোশাক পরিধান করে। লোকটা অনেক ক্লান্ত। এখনই তার শুয়ে পড়া উচিত। কিন্তু জ্যাকব বাইরে বেরিয়ে যায়। গতি তার অন্যদিকে। কিন্তু হঠাৎ কী যেনো ভেবে মহলের মেয়েরা যেখানে থাকে, সেদিকে চলে যায়।

এটি একটি ভবন। এর একটি অংশ এতোই সুন্দর ও মনোরম, যেনো এটি রাজকন্যাদের আবাস। এটি সেই মেয়েদের আবাস, যাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা এবং মুসলিম আমীর-সালার ও শাসকদেরকে ক্রুশের জালে ফাঁসানোর জন্য মুসলমানদের অঞ্চলে প্রেরণ করে থাকে। খৃস্টানদের দখলকৃত মুসলিম ভূখণ্ডের মুসলমান গোয়েন্দাদের ধরার জন্যও এদেরকে ব্যবহার করা হয়।

এই ভবনেরই অপর এক অংশে নর্তকী-গায়িকারা বাস করে। তাদের মূল্য-মর্যাদা গোয়েন্দা মেয়েদের সমান না হলেও রূপ-সৌন্দর্যে কোন অংশেই কম নয়। মহলে নিমন্ত্রণ ও ভোজসভায় নেচে-গেয়ে অতিথিদের মনোরঞ্জন করা তাদের দায়িত্ব। বাইরে থেকে মেহমান আসলে নাচ-গান ছিলো অবধারিত। আজ রাত মসুলের দূতদের সম্মানে যে ভোজের আয়োজন হয়েছিলো, তাতেও নাচ-গানের ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু সারা এই অনুষ্ঠানে ছিলো না। অত্যন্ত সুন্দরী এক মেয়ে সারা। মেয়েটার গাত্রবর্ণ ও চুল-চোখের রং ইউরোপিয়ান মেয়েদের মতো নয়। বোধ হয় বৈরুতের মেয়ে। মিসর কিংবা ইউনানেরও হতে পারে। তবে কেউ জানে না, সারার বাড়ি কোথায়।

জ্যাকব যাচ্ছিলো অন্য একদিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় আজ যারা নাচ-গান করলো, তাদের মধ্যে তো সারা ছিলো না। ব্যাপার কী! হতে পারে মেয়েটা অসুস্থ কিংবা এই পেশায় সে বিরক্ত, তাই পালিয়ে রয়েছে। জ্যাকব জানে, এই পেশায় সারা খুশি নয়। কারণ, এ কাজে সে নিজে আসেনি, ভুল বুঝিয়ে আনা হয়েছে। জ্যাকবও এই ভবনের কাছেই এক স্থানে থাকে এবং মহলে ডিউটি করে। একদিন এমনি এক ভোজসভায় হঠাৎ সারার সঙ্গে জ্যাকবের দেখা হয়েছিলো। সকলের দৃষ্টিতে সারা অহংকারী মেয়ে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। কী কারণে কে জানে জ্যাকবকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। জ্যাকবেরও সারাকে বেশ ভালো লাগে।

এক রাতে সারা মহলের কাজ-কর্ম শেষ করে নিজ কক্ষের দিকে

যাচ্ছিলো। পথে জ্যাকবের দেখা পেয়ে যায়। সারা বললো– 'একাকী যাচ্ছি, আমাকে কক্ষে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসো।'

'একা যেতে ভয় পাচ্ছো বুঝি?'– জ্যাকব বললো– 'এখান থেকে তোমাকে কেউ অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'এখন আর আমি অন্যের দ্বারা অপহৃত হওয়ার ভয় করি না'– সারা বললো– 'আমার নিজেই নিজেকে অপহরণ করার পালা এসে গেছে। আমার সঙ্গে চলো। একা যেতে ভয় করি না বটে, তবে তোমার সঙ্গ কামনা করি।'

সারার মতো একটি সুন্দরী মেয়ের জ্যাকবকে ভালোবাসা বিস্ময়কর কোন ঘটনা নয়। এমন সুশ্রী, সুদর্শন যুবককে কার ভালো না লাগে। আরো কয়েকটি মেয়ে ভালোবাসার ডালি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো। কিন্তু জ্যাকব কাউকে পাত্তা দেয়নি। কারণ, জ্যাকব জানে এরা অপবিত্র ও সম্ভ্রমহারা মেয়ে। জ্যাকব তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের দাম বাড়িয়ে নিয়েছে। প্রথম সাক্ষাতে জ্যাকব সারাকেও তেমনি চরিত্রহীন মেয়ে মনে করেছিলো। কিন্তু সারার চাল-চলন, রং-ঢং তার ভালো লেগে যায়। সারা যখন জানতে পারে জ্যাকব মদপান করে না, তখন তাকে আরো ভালো লাগতে শুরু করে। একদিন সারা জ্যাকবের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শোনার জন্য বললো– 'তুমি কোনদিন আমার নাচের প্রশংসা করোনি। অন্যরা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমার বিদ্যা ও দেহের তারিফ করে।'

'তুমি আমার মুখ থেকে তোমার বিদ্যার প্রশংসা কখনো শুনবে না'– জ্যাকব উত্তর দেয়– 'তবে তোমার দেহে যাদুর ন্যায় ক্রিয়া আছে। ভালো শরীর। খোদা তোমার চেহারায় যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন, তা তার বান্দাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। কিন্তু নাচের অবস্থায় এই দেহটা মোটেও ভালো লাগে না। তুমি যখন কাউকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচাও, তখনো তোমাকে ভালো লাগে না। তোমার এই দেহটা যদি কোন একজন পুরুষের মালিকানায় চলে যেতো, সে ছয় কালেমা পাঠ করে এই দেহটা সম্মান ও মমতার সঙ্গে আবৃত করে নিয়ে যেতো,তাহলে এর উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতো। তুমি তো খোদাকে অপমান করছো।'

'জ্যাকব!'– সারা বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কোন্ ছয় কলেমার কথা বলছো? তাছাড়া খৃস্টানরা তো বধূদেরকে আবৃত করে নেয় না! তুমি কী বললে?'

জ্যাকব ভয় পেয়ে যায়। পরক্ষণে হঠাৎ খিল খিল হেসে ওঠে বললো–

'আমার মন-মস্তিষ্কে সবসময় মুসলমান সাওয়ার থাকে। নিজে তো বিয়ে করিনি, মুসলমানদের বিয়ে দেখেছি।'

জ্যাকব বুঝাতে চেষ্টা করে 'ছয় কলেমা' কথাটা তার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সারা তার প্রতি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েই থাকে। তারপর সারা চুপসে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল চোখে শূন্যে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর অস্থিরের ন্যায় জ্যাকবের কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি মুসলমান নও তো জ্যাকব? আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তুমি গুপ্তচর। হতে পারে চাকরির খাতিরে নিজেকে খৃস্টান পরিচয় দিয়ে রেখেছো কিংবা ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছো।'

'জ্যাকব নামের মানুষ মুসলমান হয় না সারা'– জ্যাকব বললো– 'আমার নাম গলবার্ট জ্যাকব। তুমি এতো অস্থির হয়েছো কেন সারা! মনে হচ্ছে, তোমার হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি এতো ঘৃণা যে 'ছয় কলেমা' উচ্চারণটাও শুনতে চাচ্ছো না।'

'আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলে দিচ্ছি'– সারা বললো– 'বিষয়টা হয়তো তোমার ভালো লাগবে না। আমার কাছে মুসলমান খুবই ভালো লাগে। তার কারণটা বোধ হয় এই যে, মুসলমান ছয় কলেমা পড়িয়ে বধূদেরকে আবৃত করে নিয়ে যায়।' সারা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো– 'নারীকে যখন বিবস্ত্র করে ফেলা হয়, তখন সে অনুভব করে আবৃত হওয়ার মধ্যে তার যে আত্মিক শান্তি ও স্থিরতা ছিলো, তা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। নারীর নাচে কোন স্বাদ নেই এবং রূপের যাদু প্রয়োগ করে পুরুষদেরকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচানোর মধ্যেও শান্তি নেই। আমি যখন একাকী আয়নার সামনে দাঁড়াই, তখন আয়নায় নিজেকে একজন ঘৃণ্য নারী বলে মনে হয়। নিজের প্রতিবিম্বকে আমি আবৃত করতে পারি না। তার উপর পর্দা চড়াতে পারি না। তবে আমার আত্মার উপর কালো আবরণ পড়ে গেছে।'

'পেশাটার প্রতি তোমার এতোই যখন ঘৃণা, তো পালিয়ে যাও না কেন?' জ্যাকব বললো।

'কোথায় যাবো?'– সারা বললো– 'এখান থেকে পালাবো তো বেশ্যালয়ে চলে যাবো। আচ্ছা, তুমি আমাকে ভালোবাসো, নাকি আমার নাচ?'

'আমার সেই সারাকে ভালো লাগে, যে নাচ-গানের পেশাকে ঘৃণা করে এবং এর জন্য বেজায় বিরক্ত ও অস্থির থাকে'– জ্যাকব বললো– 'আমি তো বলেছি, তুমি খোদাকে অপমান করছো।'

'আচ্ছা, তুমি ফৌজে এসেছো কীভাবে?'– সারা বললো– 'তোমাকে গ্রামগঞ্জের কোন এক গীর্জার পাদ্রী হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। প্রতিদিন কী পরিমাণ মদপান করো?'

'মদের ঘ্রাণকেও আমি ঘৃণা করি।'

'তাহলে তুমি মুসলমান'– সারা দৃঢ়কণ্ঠে বললো– 'তুমি নও তো তোমার পিতা মুসলমান ছিলেন। তুমি নারীকে আবৃত দেখতে চাও। নাচ পছন্দ করো না। মদের প্রতি তোমার প্রচণ্ড ঘৃণা। আর সম্ভবত এ কারণেই আমাকে তোমার ভালো লাগে। আমাকে তো যেই দেখে ভোগের চোখে দেখে। তুমি আমর হৃদয়ের ব্যথা বুঝো না?"

'বুঝি সারা'– জ্যাকব বললো– 'এই ব্যাথাটা আমার হৃদয় অনুভব করেছে।'

এরপর কয়েকবার সারা-জ্যাকবের সাক্ষাৎ ঘটে। সারা জ্যাকবের সঙ্গে হৃদয়ের কথা বলতে থাকে। মেয়েটি জ্যাকবকে একাধিকবার বলেছে, তোমার চাল-চলন ও চিন্তা-চেতনা মুসলমানদের মতো। জ্যাকব সারাকে জিজ্ঞেস করেছে, মুসলমানদের তুমি এতো বেশি পছন্দ করো কেন? সারা কখনো সন্তোষজনক উত্তর দেয়নি। তবে উভয়ে এটুকু অবশ্যই অনুভব করেছে, তারা একে অপরের হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে।

জেয়াফতের রাতে জ্যাকব যখন ডিউটি শেষ করে একদিকে যাচ্ছিলো, তখন মাঝপথে সে গতি পরিবর্তন করে সারার বাসভবনের দিকে হাঁটা দেয়। জেয়াফতে সারার অনুপস্থিতির কারণ হতে পারে, সে অসুস্থ। তাই খবরটা নেয়া দরকার। উক্ত ভবনে কারো যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। তারপরও জ্যাকব ঝুঁকিটা এ জন্য বরণ করে নেয় যে, মেয়েরা সকলে আসরে চলে গেছে। চাকরানী মহিলারাও এ সময়ে ভবনে নেই। জ্যাকব অন্ধকার দিক থেকে হাঁটা দেয়। সারার কক্ষ তার জানা ছিলো। পা টিপে টিপে সে কক্ষের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দরজায় হাত লাগালে কপাট খুলে যায়। একটি কক্ষ অতিক্রম করে অপর কক্ষে চলে যায় জ্যাকব। ওখানে একটি বাতি জ্বলছে, যার ক্ষীণ আলোতে সারা শুয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। এ মুহূর্তে মেয়েটাকে একটা দুগ্ধপোষ্য নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় মনে হলো জ্যাকবের। জানালাটা খোলা। রোম উপসাগারের শীতল বায়ুর তীব্র ঝাপটায় সারার মাথার বিক্ষিপ্ত চুলগুলো ধীরে ধীরে নড়ছে। গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে সারা। জ্যাকব সারার কপালে হাত রাখে। এই বয়সের একটা

ঘুমন্ত মেয়ের কপাল যতোটুকু গরম থাকার কথা, তার চেয়ে বেশি গরম নয়। অতএব, সারার জ্বর হয়নি।

'তুমি গুলবাগিচার ফুল, যে ফুল রাজা-বাদশাহদের শয়ন কক্ষে এসে শুকিয়ে যায়'– জ্যাকব মনে মনে সারাকে উদ্দেশ করে বললো– 'তুমি ভোরের তারকা, যেটি সূর্যের আলোতে নির্বাপিত হয়ে যায়, রাত এলে আবার জ্বলে ওঠে। তোমার জীবন রাতের আঁধারে ঘুরপাক খাচ্ছে। তোমার ভাগ্য অন্ধকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তোমাকে আমার ভালো লাগে কেন? তুমি আমাকে বারবার কেন জিজ্ঞেস করছো, আমি ছয় কলেমার উল্লেখ কেন করেছি? তুমি কোন মুসলিম মায়ের কোলে জন্মলাভ করোনি তো? তোমার শিরায় কোন মুসলমান পিতার রক্ত নেই তো? এই রহস্য উন্মোচন করবে কে? আমি তোমার জন্য রহস্য। তুমিও আমার জন্য রহস্য।'

জ্যাকবের মনে পড়ে যায়, খৃস্টান সৈন্যরা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করে থাকে। মুসলিম মেয়েদের তুলে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে নিজেদের রঙে রঙিন করে গুপ্তচরবৃত্তি, বেহায়াপনা ও নাচ-গানের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সারাও এমনি এক হতভাগী মেয়ে হতে পারে। অন্যথায় এই খৃস্টান জাতিটা তো অনুভূতি ও চেতনার দিক থেকে মৃত হয়ে এবং বেহায়াপনার মধ্যে পুরোপুরি জীবিত থাকতে পারে। কিন্তু সারা পারছে না কেন? জ্যাকব ভুলে যায়, সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। কোন পুরুষের এই ভবনের দিকে পা বাড়ানোর অনুমতি নেই। কিন্তু জ্যাকব এখন সারার কক্ষে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে। সারা তার হৃদয়ে এমনভাবেই ঢুকে পড়েছে যে, কোন ঝুঁকিই ঝুঁকি বলে মনে হচ্ছে না জ্যাকবের। জ্যাকব বাতিটা নিভিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সারার চোখ খুলে যায়।

জ্যাকব সারার সন্ত্রস্ত কণ্ঠ শুনতে পায়– 'কে?'

'জ্যাকব।'

'এ সময়ে তুমি এখানে কেন?'– সারা এমন কণ্ঠে বললো যাতে প্রেমও আছে, সমবেদনাও আছে– 'কেউ দেখে ফেললে সোজা কারাগার, ছাড়া উপায় থাকবে না। আমাকে বাইরে ডেকে নিলেই পারতে!'

'জেয়াফতে তোমাকে না দেখে ভাবলাম, তোমার অসুখ-টসুখ হলো কিনা। তাই ঝুঁকি মাথায় নিয়ে চলে এলাম'– জ্যাকব অন্ধকারে সারার খাটের উপর বসতে বসতে বললো– 'কেউ যাতে দেখতে না পায় তাই বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিনি সারা। জানি না, কী

আকর্ষণ আছে, যা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তোমার কোন অসুখ হয়নি তো?'

'আমার আত্মা অসুস্থ'– সারা বললো– 'আমি যখনই আসরে–জেয়াফতে নাচি, আমার হৃদয় সঙ্গে থাকে না। আমার দেহ নাচে বটে; কিন্তু আত্মা মরে যায়। আজ যখন আমাকে জানানো হলো মসুল থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'জন মেহমান এসেছেন, শুনে আত্মার সঙ্গে আমার দেহটাও নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। শুনে আমার মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। এই রাজা-বাদশাহদের যুদ্ধ, শান্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তিতে আমার কোন আন্তরিকতা নেই। কিন্তু যখন কানে আসলো, মসুল থেকে দু'জন মেহমান আসছেন, তখন আমার মনে হলো, খৃস্টান ও মুসলমানদের দু'পক্ষের কোন এক পক্ষের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এখন পর্যন্ত আমি ঠিক করে ওঠতে পারিনি, আমার আত্মিক সম্পর্কটা আসলে কার সঙ্গে। শুধু এই অনুভূতিটা জেগে ওঠলো, আমি এই আসরে নাচতে পারবো না। আমি মসুলের মেহমানদের মুখোমুখি হতে পারবো না। হতে পারে আমাকে দেখে তারা ওখান থেকেই পালিয়ে যাবে।'

'কেন?'– জ্যাকব জিজ্ঞেস করে– 'মসুলের লোকদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?'

'বলতে পারবো না'– সারা বললো– 'আমি তো নিজেকেও বলতে ভয় পাচ্ছি, মসুলবাসীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

'সারা'– জ্যাকব সারার একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বললো– 'আমার থেকে মনের কথা কেন গোপন করছো?' তোমাকে কি কোন কাফেলা থেকে অপহরণ করা হয়েছিলো? তুমি কোন্ পিতার কন্যা?'

সারা কোন উত্তর দিতে পারে না। হঠাৎ জ্যাকব খানিকটা চকিত হয়ে ওঠে। উভয়ে খোলা জানালার দিকে তাকায়। জানালায় একটা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। সারা জ্যকবের কানে কানে বললো– 'খাটের নীচে চলে যাও।' জ্যাকব অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে। তারপর নিঃশব্দে ধীরে ধীরে খাটের নীচে চলে যায়। সারা শুয়ে পড়ে।

'সারা'– জানালায় দণ্ডায়মান ছায়াটির কণ্ঠ ভেসে আসে। এক বৃদ্ধ মহিলার কণ্ঠ। নর্তকী-গায়িকাদের দেখাশোনা করা তার দায়িত্ব।

সারা কোন উত্তর দেয়নি যেনো ডাকটা শোনেনি। মহিলা আবারো ডাক দেয়– 'সারা!' সারা এবারও নিশ্চুপ। যেনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এবার

মহিলা বিক্ষোভিত কণ্ঠে বললো-- 'আমি জানি সারা! তুমি সজাগ আছো। উত্তর দাও। বাতি নেভানো কেন?'

সারার মুখ থেকে এমন শব্দ বেরিয়ে আসে, যেনো সে বিড় বিড় করে জেগে ওঠেছে। কণ্ঠটাকে ঘুমজড়িত করে বললো– 'কে? কী হয়েছে?'

'ওদিক থেকে এসে বলছি কী হয়েছে'– মহিলার ছায়াটা জানালা থেকে সরে যায়। দরজার দিক থেকে আসতে চাচ্ছে সে। সারা অবনত হয়ে জ্যাকবকে বললো– 'বেটি অন্যদিক থেকে আসছে। তুমি বেরিয়ে এসে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ো।'

'না সারা'– জ্যাকব খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে বললো– 'আমি তাকে জানি। আসতে দাও। আমি ওর মুঠো গরম করে দেবো; তো খুশি মনে চলে যাবে।'

'না, বড় বজ্জাত মহিলা'– সারা বললো– 'গোপনে গোপনে মেয়েদের দালালী করে বেড়ায়। তুমি এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। অন্যথায় আমার মিথ্যাচার আমাকে মেরে ফেলবে। তুমি চলে যাও, আমি ওকে সামলে নেবো।'

মহিলা সবেমাত্র দরজায় এসে পৌঁছেছে। জ্যাকব জানালা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে যায়। সারা বাতি জ্বালিয়ে দেয়। মহিলা ভেতরে প্রবেশ করে। দৈহিক দিক থেকে মহিলা যতোটা না নারী, তার চেয়ে বেশি পুরুষ। এসেই সারার সঙ্গে বুঝাপড়া শুরু করে দেয়। সারা তাকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে, এই কক্ষে অন্য কেউ ছিলো না। সম্ভবত ঘুমের ঘোরে কথা বলছিলো। মহিলা বললো, স্বপ্নে নারীর কণ্ঠ পুরুষের ন্যায় হয়ে যায় না। আমি তোমার কক্ষে পুরুষ কণ্ঠও শুনেছি।'

'এটা কী?' মহিলা ঝুঁকে খাটের সন্নিকটে মেঝেতে পড়ে থাকা একটা রোমাল তুলে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে। রোমালটা হাত দুয়েক লম্বা এবং ততোখানি চওড়া একখণ্ড কাপড়, যা কিনা পুরুষরা গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথায় ব্যবহার করে থাকে। লোকটা কে ছিলো? তার থেকে তুমি কতো মূল্য নিয়েছো?'

'আমি বেশ্যা নই'– সারা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– 'আমি নর্তকী। তুমি জানো, আমি কোন পুরুষের গায়ে মুখ লাগাই না।'

'শোন সারা!'– মহিলা সারার পাশে বসে পড়ে এবং তার কাঁধে হাত রেখে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললো– 'আমিও জানি, তুমি নর্তকী। কিন্তু তুমি

জানো না একজন নর্তকী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কিংবা দেশের শাসক-সম্রাট নয়। আমি শুধু এটুকু বলে দেবো, রাতে তোমার কাছে একজন পুরুষ এসেছিলো। ফল কী হবে তুমি ভালোভাবেই জানো। এমন ধারায় কথা বলো না যে তুমি শাহী নর্তকী। এখানে তোমার কোন মর্যাদা নেই।'

'আসল কথা বলো'– সারা বরলো– 'যে দয়াটা করতে চাচ্ছো, তার বিনিময় কী নেবে বলো, আমি এখনই পরিশোধ করে দিচ্ছি।'

'তোমার থেকে আমি কিছুই নেবো না'– মহিলা বললো– 'বিনিময়টা আমি অন্য কারো থেকে উসুল করবো। তুমি শুধু হ্যাঁ বলো।'

সারা মহিলার মতলব বুঝে ফেলে। বাইরে থেকে শাহী মেহমান আসছেই কেবল। তাদের মধ্যে খৃস্টানও আছে। আছে মুসলমানও। এই সম্মানিত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য মেয়েরা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যে আমলারা আসে, তাদের জন্য এ জাতীয় কোন বিলাসী আয়োজন হয় না। এই মহিলা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তাদের নিকট মেয়ে সরবরাহ করে থাকে এবং মোটা অংকের পুরস্কার লাভ করে থাকে। এটা তার গোপন ব্যবসা। কোন কোন রাজ অতিথি সরকারীভাবে প্রদত্ত মেয়ের দ্বারা তৃপ্ত না হয়ে এই মহিলার শরণাপন্ন হয়। মহিলা তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। সারা এ যাবত কখনো তার হাতে আসেনি। কিন্তু এখন মেয়েটি তার জালে ফেঁসে গেছে। যদি বলে, তার কাছে জ্যাকব এসেছিলো এবং তাদের দু'জনের সম্পর্কটা পবিত্র, তো মহিলা বিশ্বাসও করবে না এবং জ্যাকবও বিপদে পড়ে যাবে।

'সারা!'– মহিলা বললো– 'যদি নিজের ভয়ানক পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে চাও, তাহলে আমার প্রস্তাব মেনে নাও। বাইরে থেকে দু'জন মেহমান এসেছেন। অনেক ধনী। পরশু থেকেই তারা কর্মচারিদের বলে আসছেন, তাদের ভালো দুটো মেয়ে দরকার। এটা মূলত তাদের অভ্যাস। নিজেদের হেরেমে তাদের বিশ-ত্রিশটি করে মেয়ে থাকে। কাল তুমি তাদের একজনের কাছে চলে যাবে।'

'তারা কারা?'– সারা জিজ্ঞেস করে– 'মুসলমান হলে আমি যাবো না।'

'তাহলে কয়েদখানায় যাও'– মহিলা বললো– 'মাথা ঠিক রেখে চিন্তা করে কথা বলো। নিজের প্রতি তাকাও। তুমি কী? নিজের পেশাটা দেখো। ভদ্র সাজবার চেষ্টা করো না। তারা মন খুলে পুরস্কার দেবে। তুমিও ভাগ পাবে।'

'আর যদি ধরা পড়ে যাই, তাহলে?' সারা বললো।

'যারা তোমাকে ধরবে আমি তাদের হাত বেঁধে রাখি'– মহিলা বললো– 'কাল রাতে প্রস্তুত থাকবে। আমার আর জানবার প্রয়োজন হবে না, তোমার কাছে কে এসেছিলো।'

মহিলা চলে যায়। সারার চোখ থেকে অশ্রু বেরুতে শুরু করে।

জ্যাকব পালিয়ে যাওয়ার মানুষ নয়। কিন্তু সারা বিপদে পড়ে যাবে ভয়ে বেরিয়ে গেলো। তার আশা ছিলো সারা মহিলাকে সামলে নিতে সক্ষম হবে। কারণ, সে নিজেও নোংরা জগতের মেয়ে। জানালা টপকে বেরিয়ে জ্যাকব শহরের দিকে যাচ্ছে। তার মন-মস্তিষ্কে শুধুই সারা। সারার সঙ্গে এখন তার আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক। থেকে থেকে তার কেবলই ধারণা হচ্ছে, সারা কোন মুসলমান পিতার কন্যা। জ্যাকব হাঁটতে হাঁটতে নগরীর সরু ও অন্ধকার গলিপথে ঢুকে পড়ে। গলির মোড় ঘুরে ঘুরে একটি গৃহের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং দরজায় করাঘাত করে।

খানিক পর দরজা খুলে যায়।

'কে?'

'হাসান।' জ্যাকব উত্তর দেয়।

'এতো রাতে কেন?'– যে লোকটি দরজা খুললো সে জিজ্ঞেস করে– 'ভেতরে এসে পড়ো। কেউ দেখেনি তো?'

'না'– জ্যাকব উত্তর দেয়– 'কাফেরদের জেয়াফত থেকে এই মাত্র অবসর হলাম। জরুরি এক সংবাদ নিয়ে এসেছি।'

জ্যাকব ভেতরে ঢুকে পড়ে। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এখন সে জ্যাকব নয়– হাসান আল-ইদরীস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর। এক বছর আগে নিজেকে খৃস্টান পরিচয় দিয়ে এবং গলবার্ট জ্যাকব নাম ধারণ করে খৃস্টান বাহিনীতে চাকরি নিয়েছিলো। গৌর বর্ণের যুবক। প্রশিক্ষণ মোতাবেক অত্যন্ত চতুর ও বাকপটু। দেহের আকার-গঠনের সুবাদে উক্ত প্রাসাদের বিশেষ দায়িত্বের জন্য নিযুক্ত হয়। এখান থেকে কায়রোতে তথ্য সরবরাহ করতে থাকে। তার দলনেতার নাম হাতেম। জ্যাকব এসে এখন যে ঘরে প্রবেশ করলো, হাতেম এ ঘরেই থাকে।

'মসুলের দু'জন দূত বল্ডউইনের নিকট এসেছে'– হাসান আল-ইদরীস তার নেতাকে বললো– 'আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, তারা মসুল থেকে এসেছে এবং মুসলমান। বল্ডউইন তাদেরকে নিজ কক্ষে নিয়ে যান। তারা যে মসুলের

গবর্নর ইয্যুদ্দীনের বার্তা নিয়ে এসেছে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'আর সেই বার্তাটা হচ্ছে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে চুক্তির বার্তা'– নেতা বললো– 'তা উভয় পক্ষের মাঝে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে তা কি জানতে পেরেছো? সুলতান তো এখন পর্যন্ত ধোঁকায় রয়েছেন যে, ইয্যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীন আমাদের বন্ধু কিংবা অন্তত পক্ষে আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবে না।'

'তাদের আলাপ-আলোচনা রুদ্ধ কক্ষে হয়েছে'– হাসান বললো– 'আমার ধারণা, যা কিছু সিদ্ধান্ত হওয়ার ছিলো হয়ে গেছে। আমি তাদের একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে বেশ আনন্দিত দেখা গেছে। অভাগা এতো মদপান করেছিলো যে, নেশার ঘোরে বলে দিয়েছে, তারা মুসলমান এবং মসুল থেকে এসেছে। আমাকে বলেছিলো, সে আমাদের অর্থাৎ খৃস্টানদের ভালোবাসা দেখতে চায়। লোকটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, লুটিয়ে পড়লো।'

'মসুল থেকে দু'জন লোক এসেছিলো' সুলতানকে শুধু এটুকু সংবাদ প্রেরণ করা যথেষ্ট হবে না'– হাতেম বললো– 'আমরা সুলতানের নিকট অত্যন্ত লজ্জিত, তাঁর কাছে এই সংবাদটা পৌঁছাতে পারলাম না যে, আপনি বৈরুত অবরোধের পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। কেননা, বল্ডউইন আপনার এই পরিকল্পনার সংবাদ জেনে গেছে।'

'তাতে আমাদের কোন ক্রটি ছিলো না'– হাসান বললো– 'ইসহাক তুর্কি যথাসময়ে রওনা হয়ে গিয়েছিলো। সে তো ধোঁকা দেয়ার মতো মানুষ ছিলো না। পথে হয়তো মরুভূমির নির্মম আচরণের শিকার হয়েছে, নয়তো ধরা পড়েছে।'

'বৈরুত অবরোধে সুলতান আইউবীর যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, আমাদের তার প্রতিকার করতে হবে'– হাতেম বললো– 'তার জন্য এই সংবাদটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, মসুল বৈরুতের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করছে। কিন্তু চুক্তিতে কী কী শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা কী ঠিক হয়েছে, পুরো তথ্যই সুলতানকে জানানো প্রয়োজন। এ মুহূর্তে সুলতান আইউবী বড় ঝুঁকির মধ্যে বসে আছেন। হয়তো ভাবছেন, তিনি বন্ধুদের মাঝে নিরাপদ রয়েছেন। কিন্তু আসলে তিনি শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে ছাউনি ফেলেছেন।' হাতেম হাসানকে জিজ্ঞেস করে– 'ভেতরের সংবাদ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা করা যায় না?'

'আলোচনা হয়েছে রুদ্ধ কক্ষে'– হাসান উত্তর দেয়– 'বল্ডউইন তার সালার কিংবা উপদেষ্টাদের তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না। মসুলের

দু'ব্যক্তির বক্ষ থেকে তথ্য বের করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি উপায় বের করার চেষ্টা করবো। তাতে কাজ না হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করবো। তারা যখন ফেরত রওনা হবে, তখন তাদের অপহরণ করে কথা বের করবো। তারপর প্রয়োজন হলে মেরে ফেলবো।'

'তাদের মেরে ফেললে তো আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না'– হাতেম বললো– 'আমাদের বল্ডউইন ও ইয্যুদ্দীনের পরিকল্পনা জানা আবশ্যক।'

'আমি সে চেষ্টাই করবো'– হাসান বললো– 'তথ্য বের করতে না পারলে তাদেরকে সুলতান আইউবীর নিকট পাঠিয়ে দেবো।'

'ঠিক আছে চেষ্টা চালাও'– হাতেম বললো– 'সফল হলে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে জানাও। আমি ভোরেই সুলতানের নিকট লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। তুমি যতো স্বল্প সময়ে সম্ভব তথ্য নেয়ার চেষ্টা করো।'

'দুআ করুন যেনো সফল হতে পারি।' হাসান উঠে বেরিয়ে যায়।

'খৃস্টান কমান্ডোদের জীবিত ধরার চেষ্টা করবে'– সালার সারেম মিসরী তার গেলিরা বাহিনীর কমান্ডারদের নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন– 'তবে নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলো না। যেখানেই আক্রমণ করবে, কার্যকর আঘাত হানবে এবং নিরাপদে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। আক্রান্ত হলে দৃঢ়পদে লড়াই করবে এবং শত্রুকে বেরিয়ে যেতে দেবে না। এই এতোগুলো সৈনিক তোমাদের উপর ভরসা করে ঘুমায় আর এতোগুলো খাদ্য-সামগ্রীর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব তোমাদেরই।'

নিজ কর্তব্যের পুরোপুরিই অনুভূতি আছে সারেম মিসরীর সৈন্যদের। সুলতান আইউবী তাঁবু অঞ্চল থেকে বেশ দূরে বিভিন্ন টিলার উপর বিশ থেকে চল্লিশজন সৈনিকের কয়েকটি চৌকি স্থাপন করে রেখেছেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তাঁবু অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করা তাদের দায়িত্ব। এমনি একটি চৌকি দুশমনের নিশানায় পরিণত হয়ে যায়। চৌকিটির পেছনে কয়েকটি উঁচু পর্বত এবং একটি উপত্যকা। এই উপত্যকার মধ্যদিয়ে বাহিনী অতিক্রম করতে পারে। এই লুকানো পথটির উপর দৃষ্টি রাখার জন্যই এই চৌকিটি স্থাপন করা হয়েছিলো। দু'জন আরোহী দু'টি ঘোড়া নিয়ে সেখানে সর্বদা প্রস্তুত থাকতো। এখন সেখানে নিত্যদিনের রুটিন হয়ে গেছে যে, প্রতিদিন সূর্য অস্ত্র যাওয়ার পর তিন-চারটি তীর ছুটে আসছে এবং এক-দু'জন সৈনিককে শেষ করে দিচ্ছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা

একটি ঘোড়ার গায়ে একসঙ্গে তিনটি তীর এসে বিদ্ধ হয় এবং ঘোড়াটি ছটফট করে মারা যায়। তীর নিকটের পাহাড় থেকে আসতো এবং পরক্ষণেই অন্ধকার ছেয়ে যেতো। সে কারণে তীর নিক্ষেপকারীদের খুঁজে বের করা যেতো না।

একদিন সন্ধ্যার আগে চৌকির দু'জন সৈনিক পাহাড়ের এক স্থানে লুকিয়ে বসে যায়। সূর্য অস্ত যাচ্ছে বলে। দু'টি তীর ধেয়ে আসে। দু'টিই এই দু'সৈনিকের গায়ে-পিঠে আঘাত হানে। দু'জনই শহীদ হয়ে যায়। ভোরে তাদের আধখাওয়া লাশ তুলে আনা হলো। রাতে নেকড়েরা লাশের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। স্পষ্ট বুঝা গেলো, এটা খৃস্টান গেরিলাদের কাজ।

একদিন দশ সৈনিকের একটি টহল দল অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করা হলো। তারা পার্বত্য অঞ্চলে ঢুকে পড়ে চারজনের দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। একস্থানে দশ-বারো বছরের একটি কিশোর দেখা গেলো। ছেলেটা সৈনিকদের দেখে দৌড়ে একটি উঁচু টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ছেলেটা রাখাল হতে পারে। কিন্তু ওখানে কোন ভেড়া-বকরি বা উট কিছুই ছিলো না। সৈনিকরা সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুলে টিলার অভ্যন্তরে ছোট্ট একটি গুহা দেখতে পায়। ছেলেটি তারই ভেতরে ঢুকে গিয়ে থাকবে।

সৈনিকরা গুহার মুখে কান লাগায়। ভেতর থেকে ফিস ফিস কথা বলার শব্দ শুনতে পায়। একটি কিশোরের গুহার ভেতরে ঢুকে যাওয়া বিস্ময়কর কোন ঘটনা ছিলো না। কিন্তু সৈনিকরা ছেলেটাকে খৃস্টান গেরিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলো। তারা অনেক ডাকাডাকি করে। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া আসছে না। সৈনিকরা হুমকি দেয়, ভেতরে যে-ই আছো বেরিয়ে আসো। অন্যথায় আমরা ভেতরে ঢুকে সবাইকে হত্যা করে ফেলবো। এবার ভেতর থেকে এক যুবতী বেরিয়ে আসে। সে স্থানীয় ভাষায় সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। পরে কেঁদে ফেলে বললো, আপনারা আমাকে হত্যা করে ফেলুন। বিনিময়ে আমার সন্তানদের ক্ষমা করে দিন। মেয়েটির দু'টি সন্তান। একটির বয়স দশ-বারো বছর, যে বাইরে থেকে ছুটে এসে গুহায় ঢুকেছে। অপরটির বয়স কয়েক মাস। মহিলা তাকে ভেতরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছে।

সৈনিকরা তাকে বললো, আমরা মুসলিম সৈনিক। আমরা তোমার কোন ক্ষতি করবো না। কিন্তু মেয়েটি একদিকে তাদের গালাগাল করছে,

অপরদিকে অনুনয়-বিনয় করছে। সে জানালো, দু'দিন আগে এই পাড়ায় পনের-ষোলজন সৈনিক আসে এবং পাড়াটা দখল করে নেয়। তারা পাড়ার প্রতিটি ঘর তল্লাশি করে। আমার স্বামীকে তারা হত্যা করে ফেলে। খৃস্টান সৈন্যরা পাড়ার সকল শিশু-যুবক-বৃদ্ধ ও মহিলাদের এক স্থানে একত্রিত করে বললো, কেউ যেনো জানতে না পারে এই গ্রামে সৈন্য আছে। তারা তাদের এবং তাদের ঘোড়াগুলোর পানাহারের দায়িত্ব গ্রামবাসীর উপর চাপিয়ে দেয়। তাদের কমান্ডার তরবারী বের করে। আমার স্বামী সকলের সামনে দাঁড়ানো ছিলো। কমান্ডার তাকে বাহু ধরে টেনে আরো সম্মুখে নিয়ে তরবারীর এক আঘাতে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারপর কমান্ডার সকলকে হুঁশিয়ার করে দেয়, কেউ আমার আদেশ অমান্য করলে তাকেও এমনি পরিণতি বরণ করতে হবে।

খৃস্টানরা গ্রামবাসীকে তাদের জন্য তিন-চারটি ঘর খালি করে দিতে বাধ্য করে এবং মেয়েদের ডেকে নিয়ে তাদের সেবা করাতে শুরু করে। এই মেয়েটি রাতে সুযোগ পেয়ে বাচ্চাদের নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। এখন সে জানে না, খৃস্টান সৈনিকরা এখনো এখানে আছে কিনা।

গ্রামটির অবস্থান এখান থেকে খানিক দূরে। মুসলিম সৈনিকরা মেয়েটিকে এখানেই রেখে গ্রামের দিকে চলে যায়। পাহাড়ী অঞ্চলের বাইরে বিস্তৃত একটি মাঠ। ওখানেই পনের-বিশটি কুঁড়ে ঘরের একটি পল্লী। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এই টহল দলটি অশ্বারোহী। তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে গ্রামে গিয়ে উপনীত হয়। দখলদার খৃস্টান সৈনিকরা এখনো গ্রামে অবস্থান করছে। তারা সম্ভবত পাহারার ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। অশ্বারোহী মুসলিম সৈনিকরা গ্রাম থেকে সামান্য দূরে থাকতেই সকল খৃস্টান সৈন্য বেরিয়ে আসে। তাদের সম্মুখে কয়েকটি শিশু ও অনেকগুলো মহিলা। তারা শিশু ও নারীদেরকে একস্থানে একত্রিত করে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং নিজেরা উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে তাদের চতুর্পার্শ্বে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে যায়। একজন সুলতান আইউবীর সৈনিকদের উদ্দেশে চীৎকার করে বললো– 'তোমরা যদি আর এক পা অগ্রসর হও, তাহলে আমরা এই শিশু ও নারীদের হত্যা করে ফেলবো।'

মুসলিম সৈনিকরা বিশ-পঁচিশ পা দূরে দাঁড়িয়ে যায়। তারা মুসলিম শিশু ও নারীদেরকে খৃস্টানদের হাতে খুন করাতে চাচ্ছে না।

'ওহে কাপুরুষগণ!'– সুলতান আইউবীর গেরিলা দলটির কমান্ডার

বললো– 'তোমরা যদি ক্রুশের খাতিরে লড়াই করতে এসে থাকো, তাহলে পুরুষের ন্যায় সম্মুখে এসে লড়াই করো। কাপুরুষের ন্যায় নারী ও শিশুদের ঢালের পেছনে দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

'তোমরা ফিরে যাও'– খৃস্টান কমান্ডার বললো– 'আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবো।'

খৃস্টান সৈনিকরা যে শিশু ও নারীদের পণ বানিয়ে রেখেছিলো, তাদের মধ্যে থেকে এক মহিলা সুলতান আইউবীর সৈনিকদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বললো– 'ইসলামের সৈনিকগণ! তোমরা দাঁড়িয়ে গেলে কেন? আমাদেরকে তোমাদের ঘোড়ার পদতলে পিষে ফেলো। এই কাফেরদের একজনকেও জীবিত ফিরে যেতে দিও না। আমরা শিশুদেরসহ মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত আছি।'

খৃস্টান কমান্ডার পূর্ণ শক্তিতে তরবারীর এক আঘাত হানে। মহিলার মাথাটা কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। সুলতান আইউবীর টহল সেনাদলের কমান্ডার তার সৈনিকদেরকে তীর-ধনুক বের করে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেয়। তারা মুহূর্ত মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। সব ক'জন খৃস্টান সৈনিক নারী ও শিশুদের পেছনে বসে পড়ে।

'মিথ্যা ধর্মের পুজারীগণ!'– মুসলিম কমান্ডার বললো– 'সৈনিকরা নারী-শিশুদের পেছনে লুকায় না।'

খৃস্টান সৈনিকরা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলো, পাড়ায় পুরুষ মানুষও আছে। তারা লোকগুলোকে অনেক সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলো। তারাও তাদের নারী-শিশুদের জীবনহানির ভয়ে তটস্থ। ইতিমধ্যে এক নারী হুংকার ছেড়ে বললো– 'এই কাফেরগুলো তো কাপুরুষ। তোমরা আমাদের জীবনের ভয় করছো কেন?' মহিলা তার সম্মুখে দণ্ডায়মান তিন-চার বছর বয়সের একটা শিশুকে তুলে সম্মুখে মাটিতে ছুঁড়ে বললো– 'আমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার এই সন্তানটিকে কুরবানী দিচ্ছি। তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ো। দশজন কাফেরের জীবন হরণ করার লক্ষ্যে আমি আমার এই সন্তানকে কুরবান করছি।'

এক খৃস্টান তরবারী উঁচু করে মহিলাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু অতটুকু সুযোগ সে পেলো না। পেছন থেকে পাড়ার সকল পুরুষ বর্শা, লাঠি এবং যে যা হাতে পেয়েছে নিয়ে এসে খৃস্টান সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খৃস্টান সেনারা আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নারী ও শিশুদের পেছনে বসেছিলো। এবার তারা গ্রামবাসীদের মোকাবেলার জন্য উঠে দাঁড়ায়। অমনি মুসলিম সৈনিকরাও তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দু'তিনজন সৈনিক চীৎকার করে বলতে থাকে– 'মহিলারা পালিয়ে যাও। শিশুদেরকে একদিকে সরিয়ে নাও। মুসলিম সৈনিকদের ঘোড়াগুলো মরুঝড়ের ন্যায় ধেয়ে আসে। মহিলারা শিশুদের তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে দু'খৃস্টান সৈনিক ছাড়া সকলে মারা যায়। গ্রামবাসীরা তাদের লাশগুলো ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। তারা জীবিত খৃস্টানদেরকেরও নিজ হাতে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। কিন্তু মুসলিম সেনাদলের কমান্ডার তাদের বড় কষ্টে বুঝাতে সক্ষম হয়, এদের মাধ্যমে এদের অন্যান্য সঙ্গীদের তথ্য বের করতে হবে। কাজেই এদের জীবিত বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন।

জীবিত দু'খৃস্টান সেনাকে সুলতান আইউবীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহর হাতে তুলে দেয়া হলো। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাদের বললেন, ভালোয় ভালোয় তোমাদের অন্যান্য গেরিলাদের সব তথ্য বলে দাও। তারা ধরা খাওয়া পরাজিত সৈনিক। হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে সকল তথ্য বলে দেয়। এরা বল্ডউইনের বাহিনীর গেরিলা সৈনিক। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক কমপক্ষে এক হাজার গেরিলা সুলতান আইউবীর ফৌজ ও রসদের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে বৈরুত থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো তাদের স্থায়ী কোন আস্তানা গড়ে ওঠেনি। তারা সমগ্র অঞ্চলে দলে দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এভাবে ছোট পাড়া-পল্লী দখল করে সেখান থেকে খাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করতে এবং সুলতান আইউবীর সৈনিকদের কোণঠাসা করে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জীবিত দুই সেনাকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হলো। সুলতান তাদের বক্তব্য শুনেন এবং নির্দেশ দেন– 'দূরে কোথাও নিয়ে এদের হত্যা করে ফেলো। এরা খুনী ও লুটের অপরাধে অপরাধী।'

সুলতান তার সালারদের বললেন– 'এতে প্রমাণিত হচ্ছে খৃস্টান গেরিলাদের মসুল কিংবা অন্য কোন দুর্গে অবস্থান গ্রহণের অনুমতি মেলেনি। অন্যথায় এই গ্রামটাকে আস্তানা বানাতো না।' সুলতান নির্দেশ দেন– 'এ ধরনের প্রতিটি গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করে খোঁজ নাও। সৈনিকদেরকে কঠোরভাবে বলে দেবে, যেনো তারা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার না করে। তারা তাদের ও ঘোড়ার খাদ্য ফৌজের রসদ থেকে সংগ্রহ করবে। গ্রামবাসীদের থেকে একটি দানাও যেনো গ্রহণ না করে।'

❖ ❖ ❖

গোয়েন্দাদেরকে ঝুঁকি মাথায় নিয়েই কাজ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহে তাদের অসাধ্য সাধনও করতে হয় আবার চেষ্টা করতে হয়, যাতে ধরা না পড়ে। হাসান গোয়েন্দা। এ মুহূর্তে তাকে যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। তার সারার সেই কথাগুলো মনে পড়ছে, যার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ মিলছে, মেয়েটা মুসলমানদের ভালোবাসে। হাসান এও অনুভব করেছে যে, সারার মনে সন্দেহ জেগে গেছে, হাসান মুসলমান। ভাবতে ভাবতে হাসানের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দূর থেকে ফজরের আযান কানে আসতে শুরু করেছে । আযানের অর্থবহ সুললিত বাক্যগুলো তার মন-মস্তিষ্কে ইসলাম ও মহান আল্লাহর মহত্ত্ব জাগিয়ে তোলে। আল্লাহই তাকে সাহায্য করতে পারেন। হাসান ওঠে অজু করে কক্ষের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। খৃস্টানদের এই জগতে হাসান মুসলমান নয়– খৃস্টান। হাসান আল ইদরীস নয়– গলবার্ট জ্যাকব।

ছোট্ট একটি কক্ষে একা থাকে হাসান। কক্ষে ক্রুশের সঙ্গে হযরত ঈসার প্রতিকৃতি ঝুলানো থাকে। দেয়ালে কোন চিত্রকরের আঁকা মেরির ছবি। হাসান প্রতিকৃতি, ছবি ও ক্রুশ দেয়াল থেকে সরিয়ে খাটের নীচে রেখে দেয়। দরজার ভেতর দিকের শেকলটা আটকে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করে। হাসান প্রতিদিনই এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়ে থাকে। কিন্তু আজ ফজরের নামাযে যে আবেগময় অবস্থার সৃষ্টি হলো, তেমনটি অতীতে কোনদিন হয়নি। হাসানের চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। হাসান তেলাওয়াত করছে। আজ আবেগ তার নিয়ন্ত্রণ মানছে না। 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন' (আমি কেবল তোমারই ইবাদত করছি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি) বলার সময় তার কণ্ঠটা বেশ উঁচু হয়ে যায়। জীবনে তার এই প্রথমবার অনুভব হলো যেনো আল্লাহ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং এতো নিকটে যে ইচ্ছা করলে সে আল্লাহকে স্পর্শ করতে পারে।

নামায শেষ করে হাসান দু'আর জন্য হাত তুলে। চক্ষু বন্ধ হয়ে যায়। মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে– 'মুসলমানের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসার খোদা! তোমার নাম উচ্চারণকারী, তোমার রাসূলের কালেমা পাঠকারী মুসলমান কাফেরদের ভয়ে তোমার মসজিদে আকসায় তোমার সমীপে সেজদাবনত হতে ভয় পাচ্ছে। তোমার প্রথম কেবলা আজ

বিরান হয়ে গেছে। যে ভূখণ্ড তোমার রাসূলের পদধূলিতে পবিত্র ও বরকতময় হয়েছিলো, তার উপর আজ ক্রুশের ছায়া পড়ে আছে। যে বনী ইসরাইলকে তুমি বিতাড়িত করে দিয়েছিলে, তারা আজ তোমার প্রথম কেবলাকে হাইকেলে সুলায়মানী বলছে। হে আমার আল্লাহ! আমাকে তুমি তোমার বড়ত্বের প্রমাণ দাও। বলো, তুমি মহান নাকি ইহুদীদের খোদা মহান। বলো, ঈসা তোমার কাছে আছেন নাকি ক্রুসেডারদের ক্রুশের উপর ঝুলছেন। আমাকে তোমার মহত্ত্বের প্রমাণ দাও। তোমার কুরআনের মহত্ত্বের প্রমাণ দাও। তোমার রসূলের মহত্ত্বের প্রমাণ দাও। আমাকে, ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে তোমার রাসূল ও কুরআনের মহত্ত্ব বুঝাবার যোগ্যতা দান করো। যে পাহাড়গুলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এবং তোমার প্রথম কেবলার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে, আমাকে সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার শক্তি ও সাহস দান করো। আমাকে তুমি আলো দান করো, যেনো এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমি আমার কর্তব্যের গন্তব্য দেখতে পাই। আমাকে তুমি এমন কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করো, যেনো আমার জীবন তোমার নামে কুরবান হয়ে যায়। তবে প্রতিশ্রুতি দাও, আমার জীবন বৃথা যাবে না। আমাকে তুমি সেই সাহস ও আলো দান করো, যার মাধ্যমে আমি তোমার জন্য শাহাদাতবরণকারী মর্দে মুজাহিদদের প্রতি ফোঁটা রক্তের প্রতিশোধ নিতে পারি। আমাকে তুমি সাহস দান করো, যেনো আমি কুফরের প্রতিটি দুর্গকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি। তুমি আমাদের সকলকে সাহস ও হেদায়াত দান করো, যেনো আমরা আমাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারি, যেনো অনাগত প্রজন্ম বলতে না পারে আমরা আত্মমর্যাদাহীন মানুষ ছিলাম। আজ পাথরের মূর্তিরাও তোমার নামে ঠাট্টা করছে। তুমি আমাকে বীরত্ব দান করো, যেনো আমি এই মূর্তিগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তোমার নাম সমুন্নত করতে পারি। হে আমার আল্লাহ! অন্যথায় তুমি আমার দেহের রক্তগুলো পানি করে দাও। আমাকে এমন আত্মমর্যাদাহীন করে দাও, যেনো আমি ভুলেই যাই আত্মমর্যাদা কাকে বলে। তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে নিয়ে নাও, যেনো আমি ইসলামের কন্যাদের নির্লজ্জ ও বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে না পাই। তুমি আমার শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে নাও, যেনো আমি তোমার নাম শুনতে না পাই। যেনো আমি সেই মুসলমানদের ফরিয়াদ শুনতে না পাই, যারা ফিলিস্তীনে ইহুদী-খৃস্টানদের গোলাম হয়ে আছে।'

হাসানের কণ্ঠ উঁচু হয়ে যায়– 'তুমি কোথায়? তুমি কি আছো, নাকি নেই? বলো আমার আল্লাহ! বলো, আমাকে বাক্‌শক্তিদানকারী আল্লাহ! বলো, ইসলাম সত্য, নাকি ক্রুশ সত্য। অন্যথায় আমাকেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দাও, সত্য কে– ইসলাম না ক্রুশ। বলো, বলো।'

কণ্ঠটা ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে হাসান আল-ইদরীসের। খোদার দরবারে আকুতির চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে লোকটা। এখন মনে হচ্ছে যেনো ছাদটা দুলছে। পরক্ষণেই এমন বিকট শব্দে আকাশে বজ্রপাত ঘটে, যেনো হাসানের কক্ষটা দুলে ওঠে। হাসান কক্ষের দরজায় বিজলির ঝলকানি দেখতে পায়। এবার সে কণ্ঠটা আরো উঁচু করে বলে ওঠে– 'হে আল্লাহ! এই বজ্র দ্বারা আমাদের মসজিদে আকসাকে ভস্ম করে দাও। মুসাফির-মনযিল উভয়কে তুমি ধ্বংস করে দাও।'

আবারো বজ্রপাত ঘটে। বৈরুতের সমুদ্রোপকূল নিকটেই ছিলো। ঋতুটা নদ-নদীর শান্ত থাকার। কিন্তু এক্ষুণে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের পাহাড়সম উর্মিমালার ভয়ানক গর্জন এমন ধারায় হাসানের কানে এসে প্রবেশ করছে, যেনো রোম উপসাগরের ক্ষেপে যাওয়া ঢেউগুলো তার কক্ষের দেয়ালের সঙ্গে আছড়ে পড়ছে। বিজলীর চমক, বজ্রের গর্জন এবং সমুদ্রের উতলা একত্রিত হয়ে মহাপ্রলয়ের রূপ ধারণ করেছে। হাসানের কণ্ঠ আরো বেশি উঁচু হয়ে যায়।

'এমনি একটি ঝড় আমার মধ্যে তুলে দাও, যেনো আমি কুফরের প্রতিটি চিহ্নকে উড়িয়ে ও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মসজিদের আকসার আঙ্গিনায় তুমি আমার খুন বইয়ে দাও। আমি লজ্জিত যে, প্রথম কেবলার মহান প্রহরী সুলতান সালাহুদ্দীন এখানে তোমাদের সৈনিকদের নিয়ে এলেন আর আমি তাকে সতর্ক করতে পারলাম না, আপনি আসবেন না; বৈরুতে আপনার জন্য ফাঁদ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আমি অক্ষম ছিলাম। তবুও স্বীকার করি, এটা আমার মস্তবড় গুনাহ। তুমি আমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সাহস ও বীরত্ব দান করো। অন্যথায় আমার বিবেক আমাকে দংশন করবে যে, তোমার খোদা বলতে আসলে কেউ নেই। আমাকে তুমি এই মূর্তিগুলোর সম্মুখে লজ্জিত করো না। তুমি যদি আমার দুআ কবুল না করো, তাহলে কেয়ামতের দিন আমার মৃতদেহে জীবন দিও না। অন্যথায় আমি তোমার কলার ধরে ফেলবো এবং তোমার সৃষ্টিকে বলবো, এই সেই খোদা যিনি আপন রাসূলের লাজ রক্ষা করেননি।

ইনি এমন এক খোদা, যদি রাসূলের অনুসারীদেরকে এতো অক্ষম ও অসহায় করে তুলেছিলেন যে, প্রথম কেবলা বিরান হয়ে গিয়েছিলো এবং তার উপর ক্রুশের অপচ্ছায়া পতিত হয়েছিলো।'

আকাশটা আবারো গর্জে ওঠে। হাসানের কক্ষের দরজা-জানালা ও ছাদ সজোরে কেঁপে ওঠে। ছাদের উপর এমন শব্দ হতে শুরু করে, যেনো ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঝড়-বৃষ্টিতে আকাশ-জমিন কাঁপছে। ভয়ে আবেগে হাসানের পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছে না। মাঝে-মধ্যে মনে হচ্ছে, যেনো সে স্বপ্ন দেখছে। হাসান আল্লাহর সঙ্গে এভাবে কখনো কথা বলেনি। চুপচাপ নামায আদায় করে সংক্ষেপে দুআ করে জ্যাকবে পরিণত হয়ে যেতো হাসান।

আজ রাত হাতেমকে রিপোর্ট করে যখন হাসান ফিরে এলো, তখন তার মনের অবস্থা ছিলো অন্যদিনের চেয়ে ব্যতিক্রম। তার ঘুম পাচ্ছিলো। কিন্তু সম্মুখে এমন একটি সমস্যা যে ভাবতে ভাবতে হাসান পাগলের মতো হয়ে যেতে শুরু করে। তার জন্য সহজ পথ এই ছিলো, যে সমস্যার কোন সমাধান নেই, তা মাথা থেকে ফেলে দিতো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী, আলী বিন সুফিয়ান এবং তার নেতা হাতেম তো জানতেন না ইয্‌যুদ্দীনের দূত বল্ডউইনের নিকট এসেছে এবং কিছু একটা চুক্তি হচ্ছে। নিজে চুপ থাকলেই হতো। চাকরির বেতন-ভাতাটা তো ঘরে বসে পিতা-মাতা ঠিকই পেয়ে যাচ্ছেন। বৈরুতে নিজে থাকছে রাজার হালে। কিন্তু হাসান আল-ইদরীস একজন মর্দে মুমিন। কর্তব্যকে নামায-রোযারই মতো গুরুত্বপূর্ণ আমল মনে করে হাসান। হাসান মনে করে, জাতির প্রতিজন সদস্য যদি ভাবে কাজটা অন্য কেউ করবে, আমি না করলেও চলবে, তাহলে পরাজয়ই জাতির ভাগ্যলিপি হয়ে যেতে বাধ্য।

হাসান রাতে একতিল ঘুমায়নি। এখন জায়নামাযেই ঘুম চেপে ধরেছে তাকে। এই আবেগময় অবস্থায় তার ঘুম না পাবারই কথা ছিলো। কিন্তু এই নামায ও দুআর পর হাসান এমন শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে যে, তার শান্তিময় আত্মা অস্থির দেহ ও মস্তিষ্ককে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। হাসান সেখানেই কাৎ হয়ে পড়ে থাকে। জায়নামাযটা লুকিয়ে ঈসার মূর্তি, মরিয়মের ছবি এবং ক্রুশটা খাটের নীচ থেকে তুলে এনে আপন আপন জায়গায় রেখে দেবে, সেই সুযোগটাও পেলো না। একটা সুখনিদ্রা এসে

ঝাপটে ধরেছে যেনো তাকে। প্রয়োজন ছিলো, ভেতরে সব ঠিকঠাক করে দরজাটা খুলে রেখে জ্যাকবের বেশে শুয়ে পড়া।

হাসান স্বপ্নের জগতে চলে যায়। স্বপ্নে মসজিদে আকসা দেখে। এই মসজিদটা সে একবার দেখেছিলো। যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েছিলো, তখন। মসজিদটা অনাবাদ ছিলো। তার উন্মুক্ত দরজাগুলো চোখ মেলে নামাযীদের চেয়ে চেয়ে দেখছিলো। কিন্তু মুসলমানরা নামায পড়ছে অন্যান্য মসজিদে কিংবা নিজ নিজ ঘরে। ইহুদী-খৃস্টানদের সন্তানরা মসজিদের আঙ্গিনাটাকে খেলার মাঠ বানিয়ে রেখেছিলো। সেখানে অসংখ্য ছেলেমেয়ে জুতা পায়ে খেলা করছিলো। খৃস্টানরা সেখানকার মুসলমানদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলো। হাসান মসজিদে আকসার পবিত্র ভূমি এবং মুসলমানদের জন্য তার গুরুত্ব ভালোভাবেই জানতো। সেখানে তার নাম ছিলো রেল্‌ফ নেকালসন।

এখন হাসান বৈরুতে স্বপ্নে মসজিদে আকসা দেখছে। মসজিদের গম্বুজের উপর অনেকগুলো পায়রা বসে আছে। সবগুলো পায়রা একসঙ্গে উড়ে শূন্যে উঠে স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়ে যায়। স্ফুলিঙ্গগুলো মসজিদে আকসার আশপাশে পড়তে শুরু করে। খৃস্টান ও ইহুদীদের একটি ভিড় বেরিয়ে আসে। তাদের প্রত্যেকের গায়ের পোশাকে আগুন ধরে গেছে। তারা সকলে এদিক-ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে। তারা চীৎকার ও হৈ-হুল্লোড় করছে। কিন্তু কারো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ স্ফুলিঙ্গগুলো রং-বেরঙের পাখিতে পরিণত হয়ে যায়। পাখিগুলো মসজিদে আকসার সবুজ গম্বুজের উপর গিয়ে বসতে শুরু করে। এখন মসজিদে না কোন ইহুদী আছে, না খৃস্টান।

হাসান ধীরে ধীরে মসজিদের দিকে হাঁটা দেয়। আকাশটা নীল। দিনের আলোতেও নীল। মসজিদের দরজায় এমন চাকচিক্য দেখা যাচ্ছে যেনো বড় একটি আয়নার উপর সুর্যের কিরণ এসে পড়েছে।

হাসানের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সে চোখ দুটো বন্ধ করে আবার খোলে। কিন্তু এখন আর সেখানে সেই আলোর ঝিলিক নেই। দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। সারা। সারা মিটিমিটি হাসছে। হাসান বিস্ময়াভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাঁদের ন্যায় সাদা চাদরে আবৃতা। শুধু মুখমণ্ডল আর হাত দুটো দেখা যাচ্ছে। তার হাসি মুখের দাঁতগুলো এতো শ্বেত-শুভ্র দেখাচ্ছে, যে শুভ্রতা এই পৃথিবীর মানুষ কখনো দেখেনি। সারা

তার বাহু দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দেয়। ঠোঁট দুটো বন্ধ। কিন্তু হাসান তার সুরেলা কণ্ঠ শুনতে পায়– 'এসো পড়ো, মসজিদে আকসা আমাদের। যে কাফের এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আকাশ তার উপর আগুন বর্ষণ করবে। যে মুসলমান এই মসজিদের পবিত্রতা ভুলে গেছে, তারও উপর আগুন বর্ষিত হবে। আমি তার আঙ্গিনাকে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে দিয়েছি। আমার সব পাপ মুছে গেছে। আসো- আসো।'

হাসানের চোখ খুলে যায়। সে আবার চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলে। এই সুখময় স্বপ্ন থেকে ফিরে আসতে চাইছে না হাসান। কিন্তু মুদিত চোখে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। হাসান বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। ছাদের উপরে এবং এদিক-ওদিক মুষলধারা বৃষ্টির কানফাটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে উত্তাল সমুদ্রের ভয়ানক গর্জন। সমুদ্রটা এখন পূর্বের তুলনায় বেশি ক্ষিপ্ত। ঝড়-বৃষ্টি এবং রোম উপসাগরের এই তর্জন-গর্জনের মধ্যেই হঠাৎ হাসানের মনে হলো, কে যেনো দরজায় করাঘাত করেছে। এটা তার কল্পনাও হতে পারে। তবু হাসান শয্যা ছেড়ে ওঠে দাঁড়ায়। ক্রুশ ও ঈসা-মরিয়মের প্রতিকৃতি দুটো নিজ নিজ স্থানে ঝুলিয়ে রাখে। দরজায় আবারো করাঘাত পড়ে। হাসান জায়নামাযটা ভাজ করে লুকিয়ে রেখে দরজা খুলে দেয়।

দরজায় দাঁড়িয়ে সারা হাসছে। এতো মুষলধারা বৃষ্টি পড়ছে যে, বারান্দার বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সারার গায়ের পোশাক আর মাথার চুল থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে।

'এই ঝড়ের মধ্যে তুমি আমার নিকট এসেছো?' সারাকে ভেতরে আসতে বলে হাসান বললো।

'না, জ্যাকব!'– সারা উত্তর দেয়– 'আমি অন্য একজনের নিকট গিয়েছিলাম। পাইনি। গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। সারাটা রাত মদপান করেছে আর ফস্টি-নস্টি করেছে। এখন লাশের মতো ঘুমাচ্ছে। জাগবে সেই সন্ধ্যায়। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিরাশ মনে এদিকে চলে এসেছি। ঝড় আমাকে সামনের দিকে হাঁটতে দিচ্ছিলো না। তোমার কাছে দিনের বেলা আসতে তো কেউ আমাকে ঠেকাতে পারে না।'

হাসান একটা কাপড় হাতে নিয়ে সারার মাথার উপর ছড়িয়ে দেয়। তারপর নিজ হাতে সেই কাপড় দ্বারা তার চুলগুলো মুছে দিতে শুরু করে। হাসানের এই অকৃত্রিম আচরণ সারার ভালো লাগে। হাসান তার মুখটাও

মুছে দেয়। তারপর একটা চাদর ধরিয়ে দিয়ে বললো– 'আমি ওদিকে ফিরে থাকছি, তুমি ভেজা কাপড়টা খুলে এটা পেঁচিয়ে নাও।'

সারা পরিধানের ভেজা পোশাকটা খুলতে গিয়ে ভাবে, আমার প্রতি লোকটার ভালোবাসা এতোই আত্মিক যে, আমার দেহটার সঙ্গে এই প্রেমের কোনই সম্পর্ক নেই নাকি– তার অন্তরটা একেবারেই মৃত? সারা যখন হাসানকে বললো, আমি কাপড় পরিবর্তন করেছি, তখন হাসান অন্যদিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে আনে এবং সারার ভেজা কাপড়টা বারান্দায় নিয়ে চিপে শুকাতে দেয়।

'এবার বলো, কোথায় গিয়েছিলে?'– হাসান জিজ্ঞেস করে– 'আর রাতে আমার চলে যাওয়ার পর কী হয়েছিলো? মহিলা কি ভেতরে এসেছিলো?'

'সে সূত্রেই এদিকে এসেছিলাম'– সারা উত্তর দেয়– 'মহিলা কক্ষে প্রবেশ করে শর্ত সাপেক্ষে আমাকে ক্ষমা করার প্রস্তাব দেয়। তুমি আমার কক্ষে এসেছিলে আমি স্বীকার করিনি। তার শর্তটা শুধু এই জন্য মেনে নিয়েছি যে, না হলে তোমার কথা বলতে হতো। তখন আমার সঙ্গে তোমাকেও শাস্তি ভোগ করতে হতো। আর তুমি জানো, শাস্তিটা কতো ভয়ানক হতো। আমি কোন পবিত্র মেয়ে নই। তারপরও মসুলের অতিথি কিংবা অন্য কারো শয়নকক্ষে যাওয়া আমার ভালো লাগে না। আমি নর্তকী ঠিক, কিন্তু বুড়িটা আমাকে যেভাবে খেলনা বানিয়ে রাখতে চায়, আমি তা মেনে নিতে পানি না। আমার নিজের একটা পছন্দ-অপছন্দ আছে। জীবনে বহু পাপ করেছি। কিন্তু কারো উপার্জন কিংবা অন্য কারো পাপের মাধ্যম হতে পারি না। মহিলা আমাকে বললো, এ কাজে তুমিও বিনিময় পাবে। চুপি চুপি দেবো, কেউ টের পাবে না। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ঠিক আছে, তোমার কথামতো আজ রাতে আমি মসুলের একজন মেহমানের নিকট চলে যাবো। কিন্তু এখন চেষ্টা করছি, সম্রাটদের বলে দেবো, এই মহিলা মহলে গোপন ব্যবসা চালু করেছে।'

'আর সে বলে দেবে, রাতে তোমার কক্ষে পুরুষ মানুষ যাওয়া-আসা করছে।' হাসান বললো।

'বলুক'– সারা বললো– 'আমি এখন যে কোন শাস্তি মাথা পেতে বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি। প্রয়োজনে আত্মহত্যা করতেও প্রস্তুত। মহিলাটার মুখোশ আমি খুলেই ছাড়বো। আমি নর্তকী। বেশ্যাবৃত্তি আমি করবো না।'

'আচ্ছা, নাকি আমিই এগিয়ে গিয়ে বলে দেবো, রাতে তোমার কক্ষে

আমি গিয়েছিলাম?'– হাসান বললো– 'বলবো, তোমার সঙ্গে আমার দৈহিক নয়– আবেগের সম্পর্ক রয়েছে।'

'এ কথাটা যদি বলা যেতো, তাহলে আমি নিজেই বলে দিতাম, আমার কক্ষে জ্যাকব এসেছিলো'– সারা বললো– 'কিন্তু এ তথ্য স্বীকার করা আর নিজেকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া হাঁকানো সমান। কেউই মেনে নেবো না, তোমার-আমার মাঝে আত্মিক সম্পর্ক আছে। এরা মানুষের আবেগ-চেতনা সম্পর্কে অবহিত হয়। এদের কাছে সম্পর্ক মানেই দৈহিক। তুমি এ্যালবার্তুকে চিনে থাকবে। ইতালির নাগরিক। একজন সৎ ও হৃদয়বান অফিসার। বল্ডউইনের উপর তার বেশ প্রভাব আছে। শুধু এই একজন অফিসার আছেন, যিনি আমার প্রতি পবিত্র চোখে তাকিয়ে থাকেন। আমি তাকে রাতের ঘটনা শোনাবো এবং নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করার চেষ্টা করবো। যদি আমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবো। সমুদ্র যদি আমার লাশটা উগরে দেয়, তাহলে হয়তো তুমি আমাকে দেখবে। অন্যথায় এখনই বিদায়। রোম উপসাগরের মাছ খেলে তাতে আমার দেহের ঘ্রাণ পাবে।'

'সারা!'– হাসান বললো– 'তুমি খৃস্টান নও। তোমার সহকর্মীদের মধ্যে একটি মেয়েও এমন নেই, যে দৈহিক বিলাসিতা এবং উপহার-উপঢৌকনের প্রস্তাবকে তোমার ন্যায় প্রত্যাখ্যান করবে। আজ অবধি তুমি আমার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলেছো, তাতে আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি, তোমার শিরায় মুসলমানের রক্ত আছে। সেই রক্তই আজ তোমার মধ্যে টগবগ করছে। বলো, আমি কি মিথ্যে বলছি?'

সারা হাসানের প্রতি তাকায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো– 'শোনো জ্যাকব!...'

'আমি জ্যাকব নই সারা!'– হাসান বললো– 'আমার নাম হাসান আল-ইদরীস। বাড়ি সিরিয়া। এখানে এসে জ্যাকব গলবার্ট হয়েছি।'

'গোয়েন্দা?'

'অন্য কোন কারণও হতে পারে'– হাসান বললো– 'গুপ্তচরবৃত্তিই একমাত্র কারণ নয়। দেখো, আমরা দু'জন একজন অপরজনের আত্মায় ঢুকে পড়েছি। তার কারণ, আমরা উভয়ে মুসলমানের সন্তান।' জ্যাকব গোপন একটা জায়গা থেকে জায়নামাযটা বের করে। একস্থান থেকে একটি পাথর সরিয়ে তার পেছন থেকে ছোট্ট এক কপি কুরআন হাতে

নেয়। জায়নামায ও কুরআনখানা সারাকে দেখিয়ে বললো– 'এগুলো ছাড়া আমি থাকতে পারি না। এই মূর্তি, এই ছবি, এই ক্রুশ প্রতারণা মাত্র।'

'আমি যদি কাউকে বলে দিই, তুমি খৃস্টান নও মুসলমান, তাহলে কী করবে?'– সারা হেসে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি গোয়েন্দা হতে পারো না। গোয়েন্দারা নিজেদেরকে এভাবে প্রকাশ করে না।'

'বলে দাও'– হাসান বললো– 'আমি তোমার চোখের সামনে এই ঝড়-তুফানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবো। তবে সারা! আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তুমি বলবে না।'

হাসান আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিজের হাত দুটো পেয়ালার মতো করে সারার মুখমণ্ডলটা তাতে নিয়ে কাছে টেনে আনে। তার চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ অথচ ক্রিয়াশীল ও যাদুময় কণ্ঠে বললো– 'আমি জানি, তুমি কাউকে বলবে না লোকটা জ্যাকব নয়– হাসান। তুমি বলতে পারবেই না। আমাদের শিরায় আল্লাহর রাসূলের প্রেমিকদের রক্ত আছে। এই রক্ত সাদা হতে পারে না। এই রক্ত কাউকে ধোঁকা দিতে পারে না।'

হাসানের চোখ দুটো সারার চোখে আটকে যায়। সারা অনুভব করতে শুরু করে, যেনো এই সুদর্শন যুবকটা সুন্দর একটা ভূতের ন্যায় তার মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের উপর জেঁকে বসেছে। হাসান বলছে– 'তুমি নাচের জন্য নয়– মসজিদে আকসাকে কাফেরদের দখল থেকে মুক্ত করতে জন্মলাভ করেছো। আল্লাহ আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। এখন আর বলো না তুমি মুসলমান নও। বলতে পারবেই না। কথা বলো সারা! আমি তোমাকে আমার তথ্য দিয়েই দিয়েছি। আমাকে তুমি তোমার তথ্য দিয়ে দাও। তোমার দেহের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমার আত্মাটাকে আমি পবিত্র দেখতে চাই।'

সারার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। টল টল করে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। ক্ষীণ স্বরে বললো– 'হ্যাঁ হাসান! আমি মুসলমান। আমি আমার পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করছি। আমি সারা নই– সায়েরা।'

'পাপটা যারই থাকুক'– হাসান বললো– 'আজ পর্যন্ত আমি তোমার যেসব কথাবার্তা শুনেছি এবং তুমি যে ধারায় কথা বলছিলে, তাতেই আমি ধরে নিয়েছি সেই পাপ তোমাকে দংশন করছে। তুমি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছিলে। তাতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে এই দংশন তোমাকে অস্থির করে রাখছে।'

'যখন থেকে তুমি আমার আত্মাটাকে পবিত্র ভালোবাসায় ধন্য করেছো, আমার কাছে ভোগ-বিলাসিতার এই জীবনটা জাহান্নামের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক অনুভব হতে শুরু করেছে। আমি পাপের মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়েছি এবং পাপের মধ্যেই যৌবন লাভ করেছি। সেই পাপের সৌন্দর্য আজ বিষাক্ত নাগিনী হয়ে আমাকে দংশন করছে। এখন আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

নিজের জীবন হরণ করাও পাপ'- হাসান বললো- 'আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। এটা তার ওয়াদা। তুমি পাপের কাফফারা আদায় করো। তোমার সকল অস্থিরতা-অশান্তি শান্তিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে।'

'বলো, কী করবো?'- সারা চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে বললো- 'নামায পড়বো? দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাবো? বলো হাসান! আমি কিভাবে পাপের কাফফারা আদায় করবো?'

'গুপ্তচরবৃত্তি'- হাসান উত্তর দেয়- 'মাত্র একবার- প্রথম ও শেষবার। আগে লক্ষ্য বুঝে নাও। মানুষের লক্ষ্য যতো মহৎ হয়, মানুষ ততো মহান হয়। জানো, নূরুদ্দীন জঙ্গীর লক্ষ্য কী ছিলো? সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর লক্ষ্য কী? এতো অনেক বড় লোকদের কথা। তাদের মোকাবেলায় আমি কিছুই না। তারপরও তুমি আমার ব্যক্তিসত্ত্বায় এবং আমার চোখে এমন প্রভাব দেখে থাকবে, যা তোমার থেকে সত্য বের করিয়ে ছেড়েছে। এটা মূলত আমার ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া নয়। এটা আমার জীবনের লক্ষ্যের ক্রিয়া, যা আমার নিকট ঈমানের চেয়েও বেশি প্রিয়। আমার লক্ষ্যের মহত্ব এবং পবিত্রতার কারণেই তোমার এই রূপ-যৌবন আমার উপর ক্রিয়া করতে পারেনি। কেন পারেনি? কারণ, আমি মানুষ ও বস্তুকে আত্মার চোখে দেখে থাকি।'

'আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর লক্ষ্য ভালোভাবে জানি'- সারা বললো- 'আমি এও জানি, খৃস্টান শাসকবর্গ মুসলিম আমীর ও শাসকদেরকে সাহায্য এবং বিলাসিতার উপকরণ দিয়ে তাদেরকে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছে। আমি আরো জানি, ক্রুসেডাররা ইসলামী জগতটাকে ক্রুশের ছায়ায় নিয়ে আসতে চাচ্ছে। হাসান! সুলতান সালাহুদ্দীন ও খৃস্টানদের এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আমি এখানে এসে জানতে পেরেছি। অন্যথায় আমিও ক্রুশের বানে ভেসে গিয়েছিলাম। এই বান আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। শোনো হাসান! আজ কিছুদিন হলো

মসজিদে আকসা আমার হৃদয়ের উপর জয়ী হয়ে আছে। দু'রাত আমি স্বপ্নে মসজিদে আকসা দেখেছি। আমি এ যাবত চর্মচক্ষে এই মসজিদটি দেখিনি। আমি জানি না, মসজিদে আকসা দেখতে কেমন। স্বপ্নে দেখেছি। ভেতরে গিয়েছি। মসজিদটা শূন্য এবং বিরান। আমি একটি কণ্ঠ শুনতে পেলাম- 'এটি তোমার খোদার ঘর। তুমি একে আবাদ করো।' আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে শুরু করলাম, শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসলো। এমন সময় আমার চোখ খুলে যায়। শব্দটা আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। আচ্ছা, আমি কি একেই আমার লক্ষ্য বানাতে পারি না?'

'এটা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য'- হাসান বললো- 'কিন্তু এর জন্য বহু কুরবানী দিতে হবে। আমি বৈরুতে প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকি। যেদিন ধরা পড়বো, সেদিনটি হবে আমার জীবনের শেষ দিন।'

'আমি কুরবানী দিতে প্রস্তুত আছি'- সারা বললো- 'আমাকে কর্তব্য বুঝিয়ে দাও।'

ঐ বৃদ্ধা তোমাকে মসুলের যে দূতের বিনোদনের জন্য যেতে বলেছে, তুমি তার নিকট চলে যাও।' হাসান বললো।

সারা বিস্ময়াভিভূত অপলক নয়নে হাসানের প্রতি তাকিয়ে থাকে, যেনো তার চোখ দুটো আটকে গেছে।

'হ্যাঁ সারা!'- হাসান বললো- 'এই ত্যাগ তোমাকে দিতেই হবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী গুপ্তচরবৃত্তির জন্য মেয়েদের কোথাও প্রেরণ করেন না। তিনি বলে থাকেন, এক নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমি একটি শক্ত দুর্গ শত্রুকে দিয়ে দিতে রাজি। আমরা নারীর সম্ভ্রমের সংরক্ষক। কিন্তু সারা! তুমি এখানে উপস্থিত আছো। এই মুহূর্তে আমাদেরকে যে কাজটি না করলেই নয়, সেটি কেবল তোমার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হতে পারে। কোন পুরুষের বিনোদনের উপকরণ হওয়া তোমার পক্ষে নতুন কোন বিষয় নয়। আমি তোমাকে দু'একটি কৌশল বলে দেবো, যার মাধ্যমে তুমি বৃদ্ধের বক্ষ থেকে তথ্য বের করে আনতে পারবে এবং নিজের সম্ভ্রমও রক্ষা করতে পারবে। তোমার লক্ষ্য অতিশয় পবিত্র ও মহান। আমি আশাবাদী, আল্লাহ তোমার ইজ্জতের হেফাজত করবেন।'

'বলো কী করতে হবে'- সারা বললো- 'আমি একটা কুলটা মেয়ে। আল্লাহ যদি আমার থেকে এই কুরবানী নিয়ে খুশি হন, তাহলে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।'

'মনোযোগ সহকারে শোনো'- হাসান বললো- 'এই দূত দু'জন মসুলের

শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীনের পক্ষ থেকে এসেছে। আমি নিশ্চিত, তারা বল্ডউইন থেকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে সাহায্য নিতে এসেছে। এ সময়ে আমাদের বাহিনী নাসীবা নামক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। সুলতান এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের মাঝে অবস্থান করছেন। কিন্তু আসলে তিনি তাঁর মুসলিম শত্রুদের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছেন। খৃস্টানরা কিরূপ সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং মসুল, হাল্‌ব ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে, এসব ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে সুলতানকে জানাতে হবে।'

হাসান বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে সারাকে কর্তব্য বুঝিয়ে দেয় এবং শেষে বললো– 'তুমি আত্মহত্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না। আমি তোমাকে পবিত্র ও আনন্দময় জীবনে অনুপ্রবেশ করাচ্ছি। তুমি নির্যাতিত মেয়ে। সম্ভবত শৈশবে কোন কাফেলা থেকে খৃস্টানরা তোমাকে অপহরণ করে এনেছিলো। তারাই তোমাকে পাপের জীবনে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

না হাসান!'– সারা বললো– 'আমি নিজেই নিজেকে অপহরণ করেছিলাম। সেই কাহিনী পরে একসময় শোনাবো। এখন আমাকে কাজ করতে দাও। দু'আ করো আল্লাহ যেনো আমাকে সফল করেন এবং আমি আমার জীবনের সব পাপের কাফফারা আদায় করতে পারি।'

বৃষ্টি থেমে গেছে। সারা নিজের পোশাক পরিধান করে হাসানের কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। যে ভবনটিতে তার কক্ষ, সেই ভবনে প্রবেশ করামাত্র বৃদ্ধাকে পেয়ে যায়। বৃদ্ধা সারাকে দেখে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বললো– 'রাতে প্রস্তুত থাকবে। আমার লোকেরা মসুলের এক দূতের সঙ্গে কথা পাকা করেছে। আজ রাত না কোথাও নাচ-গান হবে, না জেয়াফত আছে। আমি তোমাকে তার কক্ষে দিয়ে আসবো।'

'আমি প্রস্তুত থাকবো।' সারা হাসিমুখে বললো।

মসুলের দূত দু'জন যেনো ক্ষুধার্ত নেকড়ে। তারা নিজেদের ও ইয্‌যুদ্দীনের ঈমান বিক্রি করতে এখানে এসেছে। এসেছে গাদ্দারীতে সফল হওয়ার জন্য খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনের সাহায্য নিতে। এই সম্রাট নিজের স্বার্থ এবং মুসলিম শাসকদেরকে পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে রাখার লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। এই মুসলমান দূতদের মাঝে

না ঈমান অবশিষ্ট আছে, না ব্যক্তিগত ও জাতীয় মর্যাদার অনুভূতি। সম্রাট বল্ডউইনের মদদে পুষ্ট হয়ে বিলাসী জীবন লাভ করাই এখন তাদের একমাত্র সাধনা। বল্ডউইনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের পর বৈরুত নগরী এবং সমুদ্র ভ্রমণের জন্য এখনো তারা রয়ে গেছে। এই সময়ে মহলের মেয়েদের নেত্রী বৃদ্ধা মহিলা একজন লোক মারফত প্রস্তাব পাঠায়, আপনারা চাইলে এমন এক রূপসী মেয়ের ব্যবস্থা করে দেবো, যেমনটি জীবনে কখনো দেখেননি। প্রস্তাব পেয়ে তাদের জিভে পানি এসে যায়। বিনিময় নির্ধারণের মাধ্যমে চুক্তি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। তাদের একজনের নিকট পাঠানোর জন্য সারাকে প্রস্তুত করা হয়।

রাতে কালো চাদরে আবৃত করে সারাকে মসুলের এক দূতের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। দূত– যে কিনা মসুলের গবর্নর ইযযুদ্দীনের সামরিক উপদেষ্টাও পঞ্চাশোর্ধ বৃদ্ধ– গত রাতে মাত্রাতিরিক্ত মদপান করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আজ নিজ কক্ষে বসে ধীরে ধীরে অল্প অল্প পান করছেন। কক্ষে বসে বসে সে এমন এক নর্তকীর আগমনের অপেক্ষা করছে, যার রূপের বিবরণ শুনে তার মাথাটা গরম হয়ে আছে।

দূতের কক্ষের দরজা খুলে যায়। একটি মেয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। মেয়েটি আপাদমস্তক কালো চাদরে আবৃত। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দূত মেয়েটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম হয় এবং তার মুখমণ্ডল আবরণমুক্ত হওয়ার আগেই অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে তাকে জড়িয়ে ধরে। নিজের বয়সের কথা ভুলে যায় বৃদ্ধ।

সারা তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গায়ের কালো চাদরটা খুলে দূরে ফেলে দেয়। দূতের মুখের প্রতি তাকায়। সহসা মেয়েটির মুখ বিস্ময়ে পাংশু হয়ে যায়। মাথাটা অবনত করে পেছন দিকে সরে যেতে শুরু করে। সরতে সরতে তার পিঠ দেয়ালের সঙ্গে ঠেকে যায়। সারার অনাবৃত মুখটা দেখার পর দূতও হঠাৎ চমকে ওঠে মনে মনে বলে উঠে– 'সায়েরা!'

সারার মুখে কোন কথা নেই, যেনো তার বাক্‌শক্তি হারিয়ে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধের প্রতি। দূত ভয়জড়িত এবং বিস্ময়ভিভূত কণ্ঠে বলে ওঠে– 'সায়েরা! তুমি সায়েরা?' পরক্ষণে মুখে জোরপূর্বক হাসি টেনে বললো– 'না, মানে আমার এক মেয়ে দেখতে ঠিক তোমার মতো। তার নাম সায়েরা। তোমাকে দেখে হঠাৎ মনে হলো, তুমিই বুঝি সায়েরা।'

'আমিই আপনার কন্যা সায়েরা'– হঠাৎ সারার জবান খুলে যায়। ঘৃণায়

দাঁত কড়মড় করে বললো– 'আমিই আপনার কন্যা। যারা মহল্লে মহল্লে অন্যের মেয়েদের নাচিয়ে বেড়ায়, তাদের মেয়েরাও নাচতে পারে। আমি এক আত্মমর্যাদাহীন পিতার আত্মমর্যাদাহীন কন্যা।'

ইযযুদ্দীনের দূত অকস্মাৎ কেঁপে ওঠে। খাটের উপর লুটিয়ে পড়ার মতো করে বসে পড়ে। মুখে কোন কথা নেই। সারা তার কন্যা। পিতা-কন্যার বিরহ ঘটেছে দু'বছর হয়েছে।

'ঈমান নিলামকারীদের কন্যারা ঈমান নিলামকারীই হয়ে থাকে'– সারা অগ্রসর হয়ে পিতার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘৃণায় দাঁত কড়মড় করতে শুরু করে। বললো– 'আজ নিজের আত্মমর্যাদা ও ইয্যতের পরিণতি দেখো। আজ তুমি নিজ কন্যার সম্ভ্রমের খদ্দের। তোমার মেয়ে তোমারই শয্যায় ভাড়ায় রাত কাটাতে এসেছে।' সারা বিদ্যুদ্গতিতে নিজের একটা হাত সম্মুখে এগিয়ে ধরে বললো– 'দাও, আমার পারিশ্রমিক বের করো। আমি তোমার সঙ্গে রাত কাটাতে এসেছি।'

'তু... তু...'– সারার পিতার মুখ দিয়ে কথা সরছে না– 'তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলে। আমি নই– তুমিই আত্মমর্যাদাহীন।'

'যে পিতা নিজ যুবতী কন্যার সামনে কন্যার বয়সী মেয়েদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করতে পারে এবং আপন কন্যার বয়সী মেয়েদেরকে নাচাতে ও মদপান করে মাতাল হয়ে তার সঙ্গে কন্যার সম্মুখে অসদাচরণ করতে পারে, সেই পিতার কন্যা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না। তার কন্যাও নর্তকী কিংবা বেশ্যা হতে বাধ্য। পিতা যদি সেই কন্যাকে বিবাহও দিয়ে দেয়, তো সে স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করে এবং তলে তলে একাধিক পুরুষের শয্যায় রাত কাটায়। আমি তোমাকে তোমার অতীত আর আমার নিজের বর্তমান বলছি। আমি দামেশ্কে তোমার ঘরে যখন বুঝমান হই, তখনই তোমাকে নারী নিয়ে ফূর্তি করতে দেখি। নূরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তুমি আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে হাল্ব পালিয়ে গিয়েছিলো। আমাকে ও মাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে। হালবে গিয়ে মদও পান করতে শুরু করেছিলে। তখন আমি কিশোরী ছিলাম। তোমার নিকট খৃস্টানরা আসতে শুরু করেছিলো। তোমার ঘরে মদ এবং নাচ-গানের আসর বসতে শুরু হয়েছিলো। খৃস্টানরা আমার সঙ্গে অসদাচরণ শুরু করলে তুমি খুশি হয়েছিলো।'

তারপর আল-মালিকুস সালিহ মারা গেলেন। তোমার নিকট খৃস্টানদের আনাগোনা আরো বেড়ে গেলো। তুমি আগের চেয়ে বেশি বিলাসী হয়ে

উঠেছিলে। ইয়্যুদ্দীন তোমাকে অনেক বড় পদমর্যাদা দান করলেন। আমি তোমার নর্তকী মেয়েদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে লাগলাম। তাদের থেকেই আমি নাচ শিখেছি। তুমি জানতে পেয়ে খুশি হয়েছিলে। খৃস্টানরা তোমার সামনে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। তুমি আপত্তি করোনি। তার কারণ, তারা আমার পরিবর্তে তোমাকে ইউরোপের একটি মেয়ে দান করেছিলো। তুমি তোমার ঈমান বিক্রি করে ফেলেছো। সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছো। তোমার নীতি-নৈতিকতা সব শেষ হয়ে গেছে। নিজের মেয়েটাকে পর্যন্ত পাপের পথে ছেড়ে দিয়েছো। তারপর খৃস্টানরা আমাকে সবুজ বাগান দেখায়। আমি তোমার গৃহকে বিদায় জানিয়ে স্বপ্নের স্বর্গের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আজ রাতের ন্যায় এরূপ আর ক'জনের শয়নকক্ষে রাত কাটিয়েছি আমাকে সে প্রশ্ন করো না। সেই খৃস্টান আমাকে ভালোবাসার ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করে ফেলে। আমি তোমার ন্যায় বিপুল সম্পদের মালিকদের বিনোদনের উপকরণ হয়ে বৈরুত এসে পৌঁছি। এখানে আমি রাজ নর্তকী। আজ আমার পিতা আমার সম্ভ্রমের গ্রাহক।'

ইয়্যুদ্দীনের দূত মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। শরীরটা তার কাঁপছে।

'আজ তুমি তোমার ঈমানের মূল্য উসূল করতে এসেছো'– সারা তাচ্ছিল্যমাখা কণ্ঠে বললো– 'তুমি ফিলিস্তীন ও প্রথম কেবলা বিক্রি করতে এসেছো। নিজ কন্যার মূল্য আদায় করতে এসেছো।' সারার কণ্ঠ তুঙ্গে উঠে যায়– 'এটি আমার জীবনের শেষ রাত। আমি পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করে এই জগত থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

সারার পিতা ধীরে ধীরে মাথা উঠায়। তার দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে গণ্ডদেশ ভিজিয়ে ফেলেছে। উঠে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে ঝুলন্ত তরবারীটা খুলে হাতে নেয়। খাপ থেকে বের করে তরবারীটা সারার দিকে এগিয়ে ধরে বলে– 'এই নাও, নিজ হাতে আমাকে শেষ করে দাও। সম্ভবত এতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।'

সারা পিতার হাত থেকে তরবারীটা নিয়ে নেয় এবং বলে– 'আজ আল্লাহর রাসূলের উম্মত এমন এক অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছে যে, পিতা কন্যার হাতে তরবারী দিয়ে 'যাও প্রথম কেবলাকে এই তরবারী দ্বারা মুক্ত ও আবাদ করো' না বলে বলছেন, নাও, এই তরবারী দ্বারা আমাকে খুন করো, আমার পাপের কাফফারা আদায় করো।' পিতার আবেগময় অবস্থা এবং অশ্রুসজল চোখ দেখে সারার বলার ধরন পাল্টে যায়। হৃদয়ে

পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ফিরে আসে। কণ্ঠটা শান্ত করে বললো– 'মৃত্যুবরণ করে গুনাহের কাফফারা আদায় করা যায় না। একটা পন্থা এও আছে, বেঁচে থাকুন এবং দুশমনকে হত্যা করুন। বলবো কী করবেন?'

পিতা পরাজিতের ন্যায় মেয়েরে প্রতি তাকায়।

'সম্রাট বল্ডউইনের সঙ্গে আপনার যে চুক্তি হয়েছে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করার লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত ও স্থির হয়েছে, তা আমাকে বলে দিন'– সারা বললো– 'আমি সুলতানকে এই তথ্য পৌঁছিয়ে দেবো। এর চেয়ে বড় পুণ্য আর কিছু হতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন।'

পিতা নীরবে কথা শুনছে। সারা বললো– 'অন্যথায় আসুন আমরা উভয়ে এখান থেকে পালিয়ে মুক্তি লাভ করি এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট গিয়ে আপনি তাকে সব খুলে বলবেন।'

'আমি প্রস্তুত'– পিতা বললো– 'কিন্তু এখান থেকে আমরা বের হবো কীভাবে?'

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' সারা বললো।

পিতা কন্যাকে বুকে জড়িয়ে নেয় এবং ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

বৃদ্ধা বেজায় আনন্দিত, সে অনেক মোটা একজন খদ্দের পেয়ে গেছে এবং সারার মতো রূপসী মেয়ে তার শয্যায় রাত কাটাতে চলে গেছে। এখন মনে তার শুধুই আনন্দ। মহিলা জানে, সারা সকালে ফিরে আসবে। কিন্তু সারা রাতের বাকি অংশটুকু অতিবাহিত করেছে হাসান আল-ইদরীসের কক্ষে– পরিকল্পনা প্রণয়নে। সারা হাসানকে বললো– 'রাত কাটাতে যার নিকট গিয়েছিলাম, তিনি আমার পিতা। শুনে হাসানের মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। সারা হাসানকে তার পিতার চরিত্র ও নিজের ইতিবৃত্ত শোনায়। সারা জানায়; তিনি এখান থেকে পালিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট চলে যেতে প্রস্তুত আছেন।'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার লক্ষ্য পবিত্র'– হাসান বললো– 'আমি আশাবাদী আল্লাহ তোমার সম্ভ্রম রক্ষা করবেন। আমি তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো এবং প্রস্তুত থাকতে বলবো।'

দিনের বেলা হাসান সারার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সাবধানে কথা বলে। তার আত্মমর্যাদা উস্কে দেয়। হাসান অনুভব করলো, লোকটা অত্যন্ত অনুতপ্ত। হাসান তাকে পালাবার সহজ পন্থা বলে দেয়।

সারার পিতাকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে হাসান সারার সঙ্গে দেখা করে।

সারার পিতা তার মেজবানদের কাছে আকাঙ্খা ব্যক্ত করে, আমি একাকী একটু বেড়াতে যেতে চাই। তাকে ঘোড়া দেয়া হলো। সঙ্গী দূতকে বলে যান, আমি সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসবো। ঘোড়ায় চড়ে তিনি শহর থেকে বেরিয়ে যান। হাসান ঘোড়ায় চড়ে এক স্থানে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সারা লুকিয়ে আছে অন্য এক স্থানে। তিনজন একত্রিত হয়। সারার পিতা তাকে নিজের ঘোড়ায় বসিয়ে নেন। তিনজন নাসীবা অভিমুখে রওনা হয়ে যায়।

তারা অতি সাবধানে পথ চলতে থাকে। অনেক পথ অতিক্রম করার পর এবার দ্রুতবেগে ঘোড়া হাঁকায়। সফর অনেক দীর্ঘ ছিলো। কিন্তু এই পথ তারা একদিন ও একরাতে অতিক্রম করে ফেলে।

সম্রাট বল্ডউইন আকাশটা মাথায় তুলে নেন। বৈরুতের গোয়েন্দাদের জন্য তিনি গজবরূপে আবির্ভূত হন। মসুলের এক দূত পালিয়ে গেছে। এক রাজ নর্তকী– যার সঙ্গে বল্ডউইনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিলো– নিখোঁজ। গলবার্ট জ্যাকব নামক এক নিরাপত্তা কর্মীও উধাও। তিনজনের একজনেরও কোন সন্ধান মিলছে না। বৃদ্ধার জবানও বন্ধ। সারাকে সে রাতে পালিয়ে যাওয়া দূতের কক্ষে প্রেরণ করেছিলো, এ তথ্য দিতে ভয় পাচ্ছে মহিলা।

বৈরুতে মাত্র এক ব্যক্তি জানে এই তিন ব্যক্তির কী হয়েছে এবং কোথায় আছে। তার নাম হাতেম। কিন্তু হাতেম তো অখ্যাত একজন মুচি। তাকে তারাই চেনে, যারা তার দ্বারা ছেঁড়া জুতায় তালি লাগায়। আর চেনে মুচি হিসেবে। কেউ কি জানে, এই ছা-পোষা নিরীহ মানুষটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন গোয়েন্দা নেতা, যিনি বৈরুতের সব খবরাখবর পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন আইউবীর কানে? কোন কিনারা করতে ব্যর্থ হয় বৈরুতের গোয়েন্দারা।

হেজাজের কাফেলা

হাসান আল-ইদরীস, সারা এবং সারার পিতা সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছে গেছে। সুলতান তাঁর অভ্যাস মতো তাঁবুতে পায়চারি করছেন। সারার পিতা আইউবীকে বল্ডউইনের সঙ্গে তাদের চুক্তি ও পরিকল্পনার বিবরণ প্রদান করে। সুলতান আইউবী তৎক্ষণাৎ তার সালারদের তলব করেন। মানচিত্রটা সামনে মেলে নিয়ে তাদেরকে খৃস্টানদের পরিকল্পনা বুঝাতে শুরু করেন এবং তার বিপরীতে নিজের পরিকল্পনা ঠিক করে নেন।

হাল্‌ব ও মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীন খৃস্টানদের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে এই সংবাদে সুলতান আইউবী বিচলিত বা বিস্মিত হননি। খৃস্টানদের সঙ্গে তলে তলে খাতির পাতানো সে কালের ছোট-বড় মুসলিম আমীরদের রেওয়াজে পরিণত হয়েছিলো। তার একমাত্র কারণ ছিলো সুলতান আইউবী তাদের সকলকে এক খেলাফতের অধীনে এনে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এই আমীরগণ আপন আপন রাজ্য বহাল রেখে তার শাসক হয়ে থাকাকে জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিলো, এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে হবে।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন ইয্‌যুদ্দীন ও ইমামুদ্দীন। ভৌগোলিক অবস্থান, বিস্তৃতি এবং নিরাপত্তার দিক থেকে এদের রাজ্য মসুল ও হাল্‌ব ছিলো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। খৃস্টানদের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিলো, কীভাবে মুসলমানদের এই অঞ্চল দু'টি দখল করা যায় কিংবা সুলতান আইউবীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা যায়। সুলতান আইউবী যদি এই অঞ্চল দু'টি দখল করে নিতে পারেন, তাহলে সৈন্য ও রসদ ইত্যাদির জন্য তা এমন দু'টি আস্তানা হয়ে যায়, যেখান থেকে তিনি অতি সহজে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন।

'কাবার প্রভুর কসম! আমি হাল্‌ব ও মসুল দখল করতে চাই না'—

সুলতান আইউবী বার কয়েক বললেন– 'আমি কোন মুসলিম প্রজাতন্ত্রের উপর দিয়ে বাহিনী অতিক্রম করাতেও পছন্দ করি না। আমার একটাই কামনা, এই আমীর ও শাসকগণ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক। তারা সকলে বাগদাদের খেলাফতের অফাদার হয়ে যাক, যা কিনা কুরআনেরই নির্দেশ। আমি তাদেরকে আমার পদানত করে রাখবো না। আমি খলীফা নই– খলীফার একজন অনুসারী এবং সেবক মাত্র।'

তাদের ভয় হলো, খেলাফতের অধীনে চলে এলে তাদের বিলাসিতা এবং এখন খৃস্টানদের পক্ষ থেকে নারী ও মদের যে উপহার-উপঢৌকন পেয়ে আসছে বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ক্ষমতা আর জগতের মিথ্যা আড়ম্বর ও ভোগ-বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের দৃষ্টিতে সালতানাতে ইসলামিয়ার কোন মর্যাদা নেই।

১১৮৩ সালের শুরুর দিক। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নাসীবার সেনা ছাউনিতে অবস্থান করছেন। এখান থেকে তার বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রা করার কথা। কিন্তু তিনি মুসলিম আমীর-শাসকদের নিয়তে গড়বড় লক্ষ্য করছেন। তিনি জানবার চেষ্টা করছেন, হাল্‌ব ও মসুলের দুই গবর্নরের গোপন তৎপরতাটা কী এবং খৃস্টানরা কী পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে।

গোয়েন্দা হাসান আল-ইদরীস বৈরুত থেকে এসে তাঁকে পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। সুলতান আইউবী এখন ইয্‌যুদ্দীন-ইমাদুদ্দীনের অবস্থান এবং খৃস্টানদের পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। হাসান আরো একটি কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছে যে, সে ইয্‌যুদ্দীনের এক সামরিক উপদেষ্টা এবং তার এক কন্যাকে– যে কিনা এক সময় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে খৃস্টানদের ওখানে নর্তকীর কাজ করছিলো– সঙ্গে নিয়ে এসেছে। হাসান আল-ইদরীস সুলতান আইউবীর নিকট এসে জানালো, ইয্‌যুদ্দীন বৈরুতে খৃস্টানদের নিকট সাহায্যের জন্য দু'জন দূত প্রেরণ করেছেন। এই তথ্যে সুলতান বিস্মিত হননি। তবে এই তথ্যটা ছিলো তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তৎক্ষণাৎ সালারদের ডেকে পাঠান এবং মানচিত্রটা সামনে নিয়ে তাদেরকে খৃস্টানদের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দেন।

ইয্‌যুদ্দীনের যে দূত বৈরুতে খৃস্টানদের থেকে সাহায্য নিতে গিয়েছিলো, তার নাম এহতেশামুদ্দীন। সুলতান আইউবীর নিকট তার মর্যাদা একজন বন্দির সমান হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সুলতান তাকে

সম্মানের সাথে তার সালারদের সঙ্গে বসালেন। এহ্‌তেশামুদ্দীনকে প্রায় সকল সালারই চিনতেন। কেউ তার প্রতি তাচ্ছিল্যের চোখে তাকাচ্ছেন। আবার কারো চেহারায় আনন্দের দ্যোতি যে, এহ্‌তেশামুদ্দীন তাদের মাঝে উপবিষ্ট এবং তাদের কয়েদী হয়েছে। সুলতান আইউবী হাসান আল-ইদরীসের রিপোর্ট শুনেছেন।

'আমি আশা করি আমাদের বন্ধু এহ্‌তেশামুদ্দীন নিজেই আপনাদেরকে বলবে, ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনের নিয়ত কী'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি এহ্‌তেশামুদ্দীনের উপর এই অভিযোগ আরোপ করবো না যে, সে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খৃস্টানদের সাহায্য নিতে গিয়েছিলো। তাকে মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীন প্রেরণ করেছিলো। এতো ইয্‌যুদ্দীনের কর্মচারি।'

'সুলতানে মুহতারাম!'– এক সালার বললেন– 'আমি আশা করি, আপনি আমাকে বলতে নিষেধ করবেন না, এহ্‌তেশামুদ্দীন তার সরকারের সাধারণ কোন কর্মচারী নয়। লোকটা ইয্‌যুদ্দীনের সামরিক উপদেষ্টা। একজন সেনা অধিনায়ক। গবর্নরকে খৃস্টানদের থেকে সাহায্য নেয়ার পরামর্শ তার না দেয়া উচিত ছিলো।'

'আমাকে আদেশ করা হয়েছিলো'– এহ্‌তেশামুদ্দীন উত্তর দেয়– 'আমি যদি আদেশ অমান্য করতাম, তাহলে...।'

'তাহলে আপনাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হতো'– এক নায়েব সালার বললেন– 'আপনি মৃত্যুর ভয়ে আপনার রাজার এমন একটি আদেশ মান্য করেছেন, যা কিনা নিজ জাতি ও আপন ধর্মের অপদস্তের কারণ। আমরা কি বাড়ি–ঘর, পরিবার-পরিজন থেকে দূরে এবং স্ত্রী-সন্তানদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে ইসলাম ও দেশ-জাতির জন্য কাজ করছি না? দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত আমরা এই পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে ফিরছি এবং এই পাথুরে জমিনের উপর শুয়ে রাত কাটাচ্ছি। অথচ আপনার কিনা হালবের প্রাসাদে রাজা-রাজপুত্রদের ন্যায় জীবন-যাপন করছেন। আপনি মদপান করছেন, ইহুদী-খৃস্টান ও মুসলমান রূপসী নর্তকীরা আপনাদের মনোরঞ্জন করছে। আপনারা পালঙ্কের উপর নরম গালিচায় ঘুমাচ্ছেন। আর আমরা কিনা এই বন-বাদাড়ে, পাহাড়-জঙ্গল মরু বিয়াবানে মরতে বসে আছি। আমাদের সহকর্মীদের লাশ কোথায় কোথায় হারিয়ে গেছে আমরা জানি না। আমাদের সৈনিকদের হাড়-

কঙ্কাল সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। কোন শহীদের হাড় চোখে পড়লে আপনি বলবেন, এটা মানুষের নয়– পশুর হাড়। ভোগ-বিলাসিতা আপনাদের হৃদয়ে শহীদদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকতে দেয়নি। আপনারা শত্রু-বন্ধুকে এক করে ফেলেছেন। আমরা যখন মরতে এসেছি তো আপনাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

'আহরাম!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এহ্তেশামুদ্দীন আমার নিকট এসে জীবনের সব পাপের কাফফারা আদায় করে দিয়েছে। তাকে তিরষ্কার করতে হলে আমিও করতে পারতাম।'

'মহান সুলতান!' অপর এক সালার বললেন।

'আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা আমাকে শুধু সুলতান নামে ডাকো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমাকে শান-শওকত থেকে দূরে থাকতে দাও। আমাকে রাজা বানাবার চেষ্টা করো না। আমি একজন সৈনিক। তোমরা আমাকে সৈনিকই থাকতে দাও। আচ্ছা বলো, কী যেনো বলতে চেয়েছিলে?'

'আমি উপস্থিত সকলকে, বিশেষভাবে এহ্তেশামুদ্দীনকে বলতে চাই, সালার তার শাসনকর্তার এতোটুকু গোলাম হয়ে যায় যে, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার ভুল নির্দেশও মান্য করে, সেই সালার আপন জাতির মর্যাদার ঘাতকে পরিণত হয়। জাতির মর্যাদার মোহাফেজ আমরা। সালতানাতের মালিক রাজা কিংবা সুলতান নয়– দেশের জনগণ। বর্তমানে আমরা যে কাল অতিক্রম করছি, এটা সৈনিকের যুগ। এটা জিহাদের যুগ। খলীফা এবং সুলতান যদি নৈতিকতার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা না করেন, তাহলে আল্লাহর সৈনিকগণ তাদেরকে এমন শত্রু মনে করবে, যেনো তারা ইহুদী-খৃস্টান। আর যখন এহ্তেশামুদ্দীনের ন্যায় আল্লাহর সৈনিকদের উপরও সুলতান হওয়ার নেশা চেপে বসবে, তখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর লাশের উপর গীর্জার ঘণ্টা বাজতে শুরু করবে।'

'ইসলামের প্রতিটি যুগই সৈনিকের যুগ'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যতোদিন পর্যন্ত ইসলাম জীবিত আছে, কাফেররা ইসলামের শত্রুই থাকবে। আজ আমাদের সালারদের অন্তরে সম্মান-সুখ্যাতির যে বাসনা জন্মলাভ করেছে, তা কোন একদিন ইসলামকে নিয়ে ডুবে মরবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, ইসলাম বেঁচে থাকবে তবে সেই সিংহের ন্যায়, যে ভুলে গেছে সে বনের রাজা। এরূপ সিংহ ভেড়া-বকরিকেও ভয় করে থাকে। মুসলমান কাফেরদের আঙ্গুলের ইশারায় নাচবে।

পৃথিবীতে আল্লাহর সৈনিক থাকবে; কিন্তু তার হাতে তরবারী থাকবে না। থাকেও যদি তা হবে কোন খৃস্টানের উপহার, যার কোষ থেকে বের হতে হলে খৃস্টানদের অনুমতির প্রয়োজন হবে।'

সুলতান বলতে বলতে থেমে যান। তিনি চোখ ঘুরিয়ে সকলকে এক নজর দেখে নেন এবং বললেন– 'আমিও আলাপচারিতায় জড়িয়ে পড়েছি। আমার বন্ধুগণ! আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমরা যদি এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি যে, এই পাপ কার, এই ভুল কার এবং কে সত্য, কে মিথ্যা– তাহলে আমরা কথাই বলতে থাকবো। কথা শেষ হবে না। এখন হাল্‌ব ও মসুলের গবর্নরদ্বয় খৃস্টানদের সঙ্গে কী চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং আমাদেরকে কোন্ জাতীয় শত্রুর সঙ্গে কী রকম যুদ্ধ করতে হবে, এহতেশামুদ্দীন তার বিবরণ প্রদান করবে।'

এহতেশামুদ্দীন উঠে সকলের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। সকলের প্রতি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বলতে শুরু করে–

'আমার বন্ধুগণ! আমি তোমাদের দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য ও রোষ দেখতে পাচ্ছি। আমি যে অপরাধ করেছি, তার জন্য তোমরা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারো। কিন্তু আমি তোমাদের জন্য একটা শিক্ষার উপকরণ। আমি একটা নমুনা। কথা ঠিক যে, আমি মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীনের সন্তুষ্টির জন্য নিজের ঈমান ক্রয় করেছি, তার দূত হয়ে বৈরুত গিয়েছি এবং খৃস্টানদের নিকট সাহয্যে কামনা করেছি। তবে এ কথাও ঠিক, যে যাদু আমার বিবেক ও ঈমানকে কব্জা করে নিয়েছে, তোমরাও তার থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদের কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সেনা অধিনায়ক কি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ধরা পড়েনি? তাদের অনেকে তো এমন ছিলো, যাদের উপর সুলতান আইউবীর এতোটুকু আস্থা ছিলো, যতোটুকু আস্থা আছে তার নিজের উপর। কিন্তু তারা ঈমান নিলামকারী প্রমাণিত হয়েছে। আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, মানবীয় স্বভাবে এমন একটি দুর্বলতা আছে, যেটি মানুষকে বিলাসিতার পথে ঠেলে দেয়। আর যেখানে দিন-রাত সারাক্ষণ ক্ষমতা আর সমাজে অপরাধ বিস্তারের উৎসাহ দানকারী আলোচনা চলে, সেখানে একজন অতি বুযুর্গও বিলাসপ্রিয় এবং পাপাচারী হয়ে ওঠেন। তখন যে কেউ আমীর এবং সুলতান হওয়ার স্বপ্ন

দেখতে শুরু করে। তোমরা যদি আমাকে অপরাধী মনে করো, তাহলে আমার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। তবে যদি আমাকে তওবা করার সুযোগ দান করো, তাহলে ইসলামের মর্যাদার সুরক্ষা এবং সালতানাতে ইসলামিয়ার সম্প্রসারণে আমি তোমাদের অনেক সহযোগিতা করতে পারি।'

'খৃস্টানরা সম্ভবত তোমাদের মুখোমুখি যুদ্ধ করার ঝুঁকি নেবে না'- এহতেশামুদ্দীন বললো- 'তারা আমাদেরকে আমাদেরই তরবারী দ্বারা হত্যা করার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। আমাদেরকে নিঃশেষ করতে তাদের একজন সৈন্যকেও প্রাণ দিতে হবে না। তারা মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াবার জন্য একদলকে সাহায্য দিচ্ছে। এই ছোট-বড় মুসলিম এমারত ও প্রজাতন্ত্র- যেগুলো মূলত বাগদাদের খেলাফতের প্রদেশ- সকলে তলে তলে খৃস্টানদের গোলাম হয়ে গেছে, যাতে তারা স্বাধীন থাকতে পারে। কেন্দ্র থেকে সটকে স্বাধীন তখনই থাকা যায়, যখন শত্রুর সাহায্য মিলে। তাদের নীতি হলো, শত্রুর নিকট থেকে সাহায্য নাও আর নিজের ভাইকে শত্রু বলো। গৃহযুদ্ধে যে কোন এক পক্ষ সঠিক ও দেশপ্রেমিক হয়ে থাকে। অপরপক্ষ হয় শত্রুর বন্ধু। শত্রু তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা দেয় না। তারা নিজেদের স্বার্থে ও নিজেদের মতলবে একদল মুসলমানকে সাহায্য দিয়ে থাকে। খৃস্টানরা তোমাদের প্রতিপক্ষকে সাহায্য দিচ্ছে। তারা মসুলে তাদের গেরিলা বাহিনীর আস্তানা গড়তে যাচ্ছে। বহুদিন পর্যন্ত তারা গেরিলা ও কমান্ডো যুদ্ধ লড়বে। এভাবে পর্যায়ক্রমে হাল্‌বকে এবং অন্য সকল মুসলিম প্রজাতন্ত্রকে আস্তানা বানিয়ে সেগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। মসুল থাকাকালে আমি জানতে পেরেছি, খৃস্টানরা মসুলের সামান্য দূরে পাহাড়ী এলাকায় বিপুল অস্ত্র ও সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখবে। তাতে অনেক দাহ্য পদার্থ থাকবে। সেগুলোকে তারা গেরিলা অপারেশনে ব্যবহার করবে এবং পরে প্রকাশ্য যুদ্ধেও। তারা অনেকগুলো মুসলিম প্রজাতন্ত্রে নিজেদের শক্ত ঘাঁটি স্থাপনের পর প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। সেই অস্ত্র ও দাহ্য পদার্থগুলো ঠিক কোন্ স্থানে রাখা হবে, তা অবশ্য আমি জানতে পারিনি। এ তথ্য সংগ্রহ করা আপনাদের গোয়েন্দাদের কাজ।'

বৈঠক শেষ হলো। সুলতান আইউবী গোয়েন্দা উপ-প্রধান হাসান

ইবনে আবদুল্লাহ এবং গেরিলা বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরী ছাড়া অন্যদের বিদায় করে দেন।

'আমার অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয়েছে'- সুলতান আইউবী তাদেরকে বললেন- 'আমার জানা ছিলো, খৃস্টানরা মসুল ও হালবে গোপনে তাদের ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করবে এবং আমাদের ভাইয়েরা তাদের পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। তোমরা এহতেশামুদ্দীনের জবানবন্দি শুনেছো যে, বল্ডউইন ও অন্যান্য খৃস্টানরা অদূরে কোথাও যুদ্ধ সরঞ্জাম ও দাহ্য পদার্থ ইত্যাদির সমাবেশ ঘটাচ্ছে। তোমরা জানো, আমাদের যেমন রসদ প্রয়োজন, তেমনি তাদেরও আবশ্যক। দু'পক্ষের যাদের রসদ নিঃশেষ কিংবা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা অর্ধেক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যাবে। আমাদের কতিপয় সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মসুল ও হালবের মাঝে বসে আছে। আমি তাদেরকে ইয্যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য বসিয়েছি। এখন বৈরুতের সঙ্গেও এই দুই অঞ্চলের পথ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এই অভিযান খানিকটা কঠিন ও বিপজ্জনক হবে। কেননা, গেরিলাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে বেশ দূরে চলে যেতে হবে।'

'আমি চিন্তা করে দেখবো, অভিযানটা কঠিন না সহজ'- সারেম মিসরী বললেন- 'তাছাড়া কঠিনকে সহজ করা আমার কর্তব্যও তো বটে। আপনি আদেশ করুন।'

'কোন কাফেলা চোখে পড়লে গতিরোধ করবে'- সুলতান আইউবী বললেন- 'তল্লাশি নেবে। সংঘাত হলে রীতিমতো যুদ্ধ করবে। বেশি বেশি কয়েদী বানাবার চেষ্টা করবে।'

'আর হাসান!'- সুলতান হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে উদ্দেশ করে বললেন- 'তুমি আমাকে একটা কাজ করে দেখাও। তথ্য নাও, খৃস্টানরা দাহ্য পদার্থ এবং অস্ত্রের ডিপো কোথায় সমবেত করছে। হতে পারে কাজটা তারা করেও ফেলেছে। তুমি স্থানটা চিহ্নিত করো, সেগুলো ধ্বংস করার ব্যবস্থা আমি করবো।'

'সেই ব্যবস্থাও আমিই করবো ইনশাআল্লাহ।' সারেম মিসরী বললেন।

'একটা বিষয় মাথায় রাখবে, কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধ কানামাছি খেলার ন্যায় হবে'- সুলতান আইউবী বললেন- 'খৃস্টানরা মুখোমুখি যুদ্ধ করার পরিবর্তে গেরিলা ও নাশকতামূলক যুদ্ধ লড়বে। তারা সম্ভবত

তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি সেই বোকামী করবো না। তারা আমার জন্য কয়েকটি স্থানে ওঁৎ পাতবে। আমি সর্বাগ্রে সেই আমীরদেরকে সঙ্গে জুড়ে নেবো, যারা খৃস্টানদের বন্ধুতে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাদের কাছে আমি সাহায্য ভিক্ষা চাইবো না। এখন আমি তরবারীর আগা দ্বারা তাদের থেকে সাহায্য নেবো। তাদের যে কারো রক্ত ঝরাতে আমি কুণ্ঠিত হবো না। এরা নামের মুসলমান। যে মুসলমান কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে, সেও কাফের হয়ে যায়। এখন আর আমি এই পরোয়া করি না, ইতিহাস আমাকে কী বলবে। আজ যদি কেউ বলে, অনাগত বংশধর আপনাকে ভাইয়ের ঘাতক বলবে কিংবা গৃহযুদ্ধের অপরাধে অপরাধী বলবে, তবু আমি আমার প্রত্যয় থেকে ফিরে আসবো না। আমি ইতিহাস ও অনাগত বংশধরদের নিকট নয়– আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করবো। আল্লাহ ছাড়া নিয়তের খবর আর কেউ জানে না। আমার পুত্রও যদি আমার ও ফিলিস্তীনের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়, তবে আমি তাকেও খুন করে ফেলবো। আজ যদি আমরা প্রথম কেবলাকে খৃস্টানদের হাত থেকে মুক্ত না করি, তাহলে কাল তারা কাবা গৃহকেও দখল করে নেবে। আমাদের আমীর ও শাসকদের গতিবিধি প্রমাণ করছে, তারা রাজা হবে এবং তাদের সন্তানরাও রাজা হবে। এই লোকগুলো ফিলিস্তীনকে ইহুদীদের দখলে নিয়ে দেবে। এখন তরবারী ছাড়া আমার কাছে আর কোন প্রতিকার নেই।'

'আমরা আপনার আদেশের অপেক্ষায় অপেক্ষমান'– সারেম মিসরী বললেন– 'আপনি যদি আমাকে মতামত প্রদানের অনুমতি দেন, তাহলে আমি বলবো, যারা কেন্দ্র থেকে স্বায়ত্তশাসন কিংবা আধা-স্বায়ত্তশাসনের আবেদন করছে, তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেয়া উচিত।'

'আমি তাদেরকে শাস্তি দেবো।' সুলতান বললেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সারেম মিসরী ও হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে যুদ্ধ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বিদায় করে দেন।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও সারেম মিসরী বিদায় গ্রহণ করেন। সুলতান আইউবী অপর একটি বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তিনি যখন বৈরুত থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে নাসীবায় ছাউনি স্থাপন করেছিলেন, তার কিছুদিন আগে লোহিত সাগরের পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে

রিপোর্ট পেয়েছিলেন, খৃস্টান সৈন্যরা উক্ত অঞ্চলে কাফেলা লুণ্ঠন করে ফিরছে। তারা শুধু মুসলমান কাফেলাগুলো লুট করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, ধন-সম্পদ ছাড়া উট-ঘোড়াও নিয়ে যাচ্ছে এবং স্বল্পবয়সী ও যুবতী মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। মিসরের হজ্ব কাফেলাগুলো যাওয়ার সময় এই লুটতরাজের প্রবণতা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই দস্যুদের প্রতিহত করতে হলে রীতিমতো সামরিক অভিযান প্রয়োজন। কিন্তু অতো সৈন্য তো সুলতান আইউবীর নেই। তাছাড়া তার এসব নিয়ে ভাববারই বা সময় কোথায়। তার মাথায় তো চেপে বসে আছে ফিলিস্তীন আর সেইসব মুসলিম আমীর, যারা তলে তলে খৃস্টানদের সঙ্গে আপোস ও সাহায্যের চুক্তি করে বসে আছে।

আপনারা পড়ে এসেছেন, বৈরুত অবরোধে সুলতান আইউবী নৌ-বহরও ব্যবহার করেছিলেন, যার সেনাপতি ছিলেন হুসামুদ্দীন লুলু। অবরোধ শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে গেলে সুলতান হুসামুদ্দীনকে বার্তা প্রেরণ করেন যেনো বহরটা ইস্কান্দারিয়া নিয়ে যান। তার পরপরই কায়রো থেকে সংবাদ আসে, খৃস্টানরা কাফেলা লুণ্ঠন করাকে রীতিমতো পেশা বানিয়ে নিয়েছে এবং এখন একটি কাফেলাও গন্তব্যে পৌঁছতে পারছে না। সুলতান আইউবী কায়রোকে কোন জবাব দেয়ার পরিবর্তে নৌ-বাহিনী প্রধান হুসামুদ্দীনকে আদেশ প্রেরণ করেন, যেনো তিনি তার বহরের যে অংশটি লোহিত সাগরে অবস্থান করছে, তার নেতৃত্ব হাতে তুলে নেন।

সুলতান আইউবীর আদেশ ছিলো এরকম– 'লোহিত সাগরে দুশমনের নৌ-বহরের সঙ্গে তোমার মোকাবেলা হবে না। তুমি বরং স্থলে ওঁৎ পেতে সেই দস্যুদের পাকড়াও করে ফেলবে, যারা মুসলমানদের কাফেলাগুলো লুণ্ঠন করছে। আমি জানতে পেরেছি, এই দস্যুরা খৃস্টান সৈন্য, যারা সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে এবং উপরের আদেশে এই লুটতরাজ চালাচ্ছে। এরা নদীর কূলে কূলে থাকে। তুমি বাছাই করে একদল সৈন্য নিয়ে যাও এবং নদীতে টহল দিতে থাকো। যেখানেই ডাকাতরা আছে বলে সন্দেহ হবে, সেখানেই সৈন্যদেরকে নৌকায় করে নামিয়ে ডাঙ্গায় পাঠিয়ে দেবে এবং ডাকাতদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবে। আমার পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ওখানে থাকবে।'

আদেশ পাওয়ামাত্র হুসামুদ্দীন চলে যান। সে যুগে রোম উপসাগর ও এর মাঝে সংযোগের জন্য সুইজ খাল ছিলো না। আপনি মধ্যপ্রাচ্যের

মানচিত্রে এবং তার উপর সুইজ উপসাগর দেখতে পাবেন। এই নদীটির পশ্চিম তীরে মিসর এবং পূর্ব তীরে সৌদি আরবের অবস্থান। উত্তরে সিনাই মরু এবং দক্ষিণে লোহিত সাগরের অবস্থান। মিসরের অনেক হজ্ব কাফেলা উট-ঘোড়াসহ নৌকায় করে এই সুইজ উপসাগর অতিক্রম করে থাকে। তবে অধিকাংশ কাফেলাই স্থল পথেই গমনাগমন করে থাকে এবং লোহিত সাগরের কূল ঘেঁসে সফর করে। কেননা, গরমের দিনে সমুদ্রতীর ঠাণ্ডা থাকে।

হুসামুদ্দীন সেখানে পৌঁছেই স্থলে হানা দিতে শুরু করেন এবং কয়েকজন ডাতাতকে ধরে হত্যা করে ফেলেন। কিন্তু তাদের একজনও খৃস্টান সৈন্য নয়।

❖ ❖ ❖

একদিন হুসামুদ্দীন সংবাদ পান, মিসর থেকে বিশাল একটি কাফেলা রওনা হয়েছে। এতোক্ষণে কাফেলাটির আরব সাহারায় এসে পৌঁছানোর কথা। হুসামুদ্দীন যাযাবরের বেশে জনাচারেক সৈন্যকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তারা কোথাও কোন কাফেলার সন্ধান পেলো না।

এটি একটি হতভাগ্য কাফেলা। তারা নদীর কূল থেকে অনেক দূর দিয়ে পথ চলছিলো। একদিন কাফেলা এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেয়। কাফেলায় হজ্বযাত্রীও ছিলো, ব্যবসায়ীও ছিলো। অনেকে গোটা পরিবার নিয়ে যাচ্ছিলো। সদস্যদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, কিশোর এবং যুবতী মেয়েও ছিলো। উট-ঘোড়ার সংখ্যা ছিলো অনেক। লোকসংখ্যা কমপক্ষে ছয়শত। সবাই খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ে।

কাফেলা রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হয়। এখনো অন্ধকার। একজন আযান দেয়। সকলে তায়াম্মুম করে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করে এবং রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে। হঠাৎ একদিক থেকে উচ্চকণ্ঠে হুঙ্কার ভেসে আসে– 'সামান বেঁধো না। সকলে একধার হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। কেউ মোকাবেলা করার চেষ্টা করলে মেরে ফেলবো।'

কাফেলার মধ্যে এক ভীতিকর গুঞ্জরণ শুরু হয়ে যায়– 'ডাকাত! ডাকাত!'

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কাফেলার লোকেরা দেখলো, মরু পোশাক পরিহিত শত শত মানুষ তাদের ঘিরে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে ঘোড়ায় সওয়ার। কারো হাতে বর্শা। কারো হাতে তলোয়ার। কাফেলার লোকদের সংখ্যা অনেক। ফলে অবস্থানের

জায়গাটাও বেশ বিস্তৃত। ডাকাতরা ঘেরাও সংকীর্ণ করতে শুরু করে। কাফেলার সদস্যরা মুসলমান। মোকাবেলা ছাড়া অস্ত্র ফেলে দেয়া তাদের রীতি নয়। তারা জানে, এ ধরনের কাফেলার উপর আক্রমণ হয়ে থাকে। সে কারণে তারা সকলে সশস্ত্র এবং যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত।

'নারী ও শিশুদেরকে মধ্যখানে এক স্থানে একত্রিত করে ফেলো'– এক ব্যক্তি অনুচ্চস্বরে বললো। এক কান দু'কান করে এই নির্দেশনা সব কানে পৌঁছে গেলো।

মহিলা ও শিশুরা অবস্থান স্থলের মধ্যখানে যেতে শুরু করে। কাফেলার ভেতর থেকে তরবারী বেরিয়ে আসে। কিছু বর্শাও দেখা যাচ্ছে। ডাকাতরা চতুর্দিক থেকে একযোগে কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরক্ষণেই ঘোড়ার ছুটাছুটি, হাঁক-ডাক ও তরবারীর সংঘাতের শব্দ শোনা যেতে শুরু করে। নারী ও শিশুদের আর্ত–চীৎকার ভেসে ওঠে হট্টগুলোর মধ্যে মিশে যাচ্ছে। দস্যুরা অধিকাংশ অশ্বারোহী। সকলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ সৈনিক। কাফেলা মোকাবেলায় তাদের সঙ্গে পেরে ওঠছে না। তবু তারা দৃঢ়পদে লড়ে যাচ্ছে এবং মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনি দিয়ে চলছে। একটি শব্দ বারংবার শোনা যাচ্ছে– 'মেয়েদেরকে মধ্যখানে রাখো। মেয়েদেরকে আলাদা হতে দিও না।'

একটি মেয়ে উচ্চস্বরে হাঁক দেয়– 'তোমরা আমাদের চিন্তা করো না, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি।'

কাফেলার লোকেরা যদি ঘোড়ায় আরোহণ করার সুযোগ পেতো, তাহলে তারা ভালোভাবে লড়াই করতে পারতো। কিন্তু তাদের ঘোড়াগুলোয় তখনো যিন বাঁধা হয়নি। ফলে তারা দস্যুদের ঘোড়ার নীচে পিষে যেতে থাকে। সংঘর্ষে কাফেলার লোকদেরই বেশি ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া নারী-শিশুদেরকে আগলে রাখতে হচ্ছে বলে তারা প্রয়োজন অনুসারে ঘুরে-ফিরে মোকাবেলা করতে পারছে না।

কাফেলায় সাত-আটটি যুবতী মেয়ে ছিলো। তন্মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী এক নর্তকীও ছিলো। তার নাম রাদী। পেশার প্রতি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে আত্মার শান্তি লাভের জন্য মেয়েটি হজ্বে যাচ্ছিলো। সঙ্গে তার প্রেমিক। এই লোকটিকেই আশ্রয় করে মেয়েটি তার মনিবদের থেকে পালিয়ে এসেছে। এখনো তারা বিয়ে করেনি। কথা ছিলো পবিত্র মক্কায় গিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করে হজ্ব পালন করবে।

রাদী অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রেমিক সহযাত্রীর সঙ্গে অবস্থান করে। লোকটার সঙ্গে তরবারী নেই। আছে একটা খঞ্জর। রাদীকে সঙ্গে রেখে তার মাথা ও মুখমণ্ডলটা এমনভাবে ঢেকে রাখে, যেনো কেউ বুঝতে না পারে এটি মেয়ে। সে পদাতিক দস্যুকে পেছন থেকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত হানে। আঘাত এতো তীব্র হয় যে, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রটা বের করে আনা সম্ভব হলো না। দস্যু মোড় ঘুরিয়ে লোকটির পাজরে বর্শার ন্যায় তরবারীর আঘাত হানে। তারপর দু'জনই লুটিয়ে পড়ে যায়। দস্যু ও রাদীর সহযাত্রী প্রেমিক মারা যায়।

দস্যুর পিঠে তীরভর্তি তূনীর বাঁধা ছিলো এবং কাঁধে ধনুক ঝুলছিলো। রাদী তূনীর ও ধনুকটা খুলে নেয়। এরা তিনজন অবস্থান স্থলের একধারে ছিলো। নিকটেই কিছু সরঞ্জাম পড়ে ছিলো। তন্মধ্যে তাঁবুও ছিলো। রাদী মালামাল ও তাঁবুর স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে যায়। তার সম্মুখ দিয়ে খৃস্টান দস্যুদের ঘোড়াগুলো ছুটে অতিক্রম করছে। রাদীর ধনুক থেকে এক একটি তীর বেরিয়ে যাচ্ছে আর অশ্বারোহী দস্যুরা উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছে। এভাবে মেয়েটি কয়েকজন অশ্বারোহী দস্যুকে ফেলে দেয় এবং তার তীর খেয়ে অনেকগুলো ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে।

রাদীকে এতোক্ষণ কেউ দেখতে পায়নি। এবার সে এক আরোহীর গায়ে তীর ছুঁড়লে তীরটা ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে বিদ্ধ হয়। ঘোড়াটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোড় ঘুরিয়ে চক্কর খেয়ে খেয়ে রাদী যে মালপত্র ও তাঁবুর আড়ালে লুকিয়ে ছিলো; সেগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। পিঠের আরোহী ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে। স্তূপের ভেতর থেকে একটা চীৎকার ভেসে আসে। ঘোড়াটা রাদীর ঠিক উপরে পড়েছে। তবে পশুটা এখনো মরেনি। তার ঘাড়ে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। পরপরই উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করে। আরোহী উঠে দাঁড়াবার পর তাঁবু ও মালপত্রের স্তূপের মধ্যে একটা মাথা দেখতে পায়– নারীর মাথা। আরোহী তাঁবু সরিয়ে দেখে অতিশয় এক রূপসী লুকিয়ে আছে। মেয়েটা উঠে দাঁড়াতে পারছে না। তবে সংজ্ঞাহীনও নয়। খৃস্টান দস্যু তাকে তুলে দাঁড় করালে সে কোঁকাতে শুরু করে।

দু'দিন পর। হুসামুদ্দীন এক নৌ-জাহাজে কেবিনে বসে আছেন।

দরজায় করাঘাত পড়ে। স্থল বাহিনীর এক ইউনিট কমান্ডার দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে অপর এক ব্যক্তি, যার চেহারা ফ্যাকাশে এবং লাশের ন্যায় সাদা।

'খৃস্টান দস্যুরা বিশাল এক কাফেলা লুট করে ফেলেছে'– কমান্ডার হুসামুদ্দীনকে বললো– 'এই লোকটি তাদের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে এসেছে। বিস্তারিত এর নিকট শুনুন।'

কাফেলার উপর কিভাবে আক্রমণ হলো, ক্ষয়ক্ষতি কী হলো, এখন কী অবস্থা লোকটি হুসামুদ্দীনকে বিস্তারিত শুনিয়ে বললো– 'আমরা অনেক মোকাবেলা করেছি। কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো তখনো যিনছাড়া বাঁধা ছিলো। অন্যথায় আমরা তাদেরকে সফল হতে দিতাম না। কাফেলার অল্প ক'জন মানুষ জীবিত আছে। তারা সকলে দস্যুদের হাতে বন্দী। আমার মনে হচ্ছে, এতোক্ষণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আমিও তাদের হাতে বন্দি ছিলাম। আমরা না হয় পুরুষ। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের পাঁচটি যুবতী মেয়ে এবং দশ-বারোটি কিশোরী তাদের আয়ত্তে রয়েছে। কাফেলায় বহু মূল্যবান মালামাল ছিলো। সকলের কাছে নগদ অর্থ ছিলো। নব্বইটি ঘোড়া এবং প্রায় দেড়শত উট ছিলো।'

'এখন তারা কোথায়?' হুসামুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'সেখানে ভয়ানক খাড়া খাড়া টিলা আছে'– লোকটি উত্তর দেয়– 'টিলাগুলোর মধ্যে দস্যুরা কক্ষের ন্যায় গুহা তৈরি করে রেখেছে। তাদের কাছে পানির সম্ভার আছে। মনে হচ্ছে, সেটা তাদের স্থায়ী ঘাঁটি। বিজন-বিরান হওয়া সত্ত্বেও জায়গাটা বিরান মনে হচ্ছে না।'

আগন্তুক যে জায়গাটার কথা বললো, সেটির অবস্থান সমুদ্র থেকে বিশ মাইল দূরে। সে বললো– 'কয়েকজন দস্যুও আমাদের তরবারী-বর্শার আঘাতে মারা গেছে। কিন্তু বেশি ক্ষয়ক্ষতি আমাদের হয়েছে। আমরা যে ক'জন জীবিত ছিলাম, তাদেরকে তারা ওখানে নিয়ে গেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের সমস্ত উট-ঘোড়া ও সমুদয় মালপত্র তুলে তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যায়। তারা রাতে মদপান করে এবং আমাদের সমস্ত মালপত্র খুলে খুলে দেখতে শুরু করে। তাদের একজন নেতাও আছে। মেয়েগুলোকে তার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। আমি মেয়েগুলোকে পরে আর দেখিনি। তারা আমাদের দ্বারা মালামাল বহন করিয়ে প্রশস্ত একটি

গুহায় রাখা ছিলো। অনেকগুলো প্রদীপ জ্বলছিলো। আমার অধিকাংশ সঙ্গী আহত ছিলো। আমি তাদের বলে রেখেছিলাম, আমি পালাবার চেষ্টা করছি। তাদেরই একজন আমাকে বললো, নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারলে সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সেখানে আমাদের বাহিনীর টহল নৌকা পেয়ে যাবে। তাতে আমাদের সৈন্য থাকবে। আমাদের ঘটনাটা তাদেরকে অবহিত করে ব্যবস্থা নিতে বলবে। আমার মনে পড়ে যায়, আমরা যখন মিসরের সীমান্ত অতিক্রম করছিলাম, তখন সেখানে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। তারা আমাদেরকে বলেছিলো, পথে কোন সমস্যায় পড়লে নদীর তীরে চলে যাবে। সেখানে আমাদের বাহিনী আছে। তারা তোমাদের সাহায্য করবে। যা হোক, দস্যুরা মদে মাতাল হয়ে উঠতে শুরু করলো। আমরা মালপত্র সরিয়ে গুহায় রাখছিলাম। আমি অন্ধকারে পালাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। কিন্তু টিলা এলাকাটায় পথ পাচ্ছিলাম না। দু'বার ঘুরে-ফিরে যেখান থেকে পলায়ন করলাম, সেখানেই পৌঁছে গেলাম। আমি আল্লাহকে স্মরণ করলাম। কুরআন তেলাওয়াত করতে শুরু করলাম এবং মধ্য রাতের অনেক পর টিলাময় অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এলাম। নদীটা কোন্ দিকে আন্দাজ করতে পারলাম না। আমি এলোপাতাড়ি হাঁটতে শুরু করলাম। ভোর নাগাদ এতোটুকু দূরে চলে এলাম যে, এখন আর দস্যুরা আমাকে খুঁজে পাবে না। সারাটা দিন আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকি। সঙ্গে পানির ছোট্ট একটি মশক ছিলো। অল্প ক'টা খেজুরও ছিলো। আল্লাহর ইচ্ছায় এই পানি আর খেজুর আমাকে বাঁচিয়ে রাখলো। দুপুর পর্যন্ত পা টেনে টেনে হাঁটলাম। ক্লান্তিতে শরীরটা অবশ হয়ে আসে। এখন আর পা চলছে না। আমি একটি বালির ঢিপির পাদদেশে পড়ে গেলাম। আমার ঘুম এসে গেলো। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আমার চোখ খুলে। আকাশে তারকা উজ্জ্বল হলে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হলাম। আমি হাঁটতে শুরু করলাম। দীর্ঘক্ষণ পর আমি সমুদ্রের ঘ্রাণ অনুভব করতে শুরু করলাম। আমি বাতাসের বিপরীত পথে এগুতে শুরু করলাম এবং সম্ভবত রাতের শেষ প্রহরে নদীর তীরে এসে পৌঁছি। এবার গন্তব্যে এসে পৌঁছেছি ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ্রামের জন্য অবসন্ন দেহটা মাটিতে এলিয়ে দেই। আমার দু'চোখের পাতা বুজে আসে। যে লোকটি আমাকে

জাগিয়ে তুললো, তাকে সৈনিক বলে মনে হলো। আমি কূলে একটি নৌকা বাঁধা দেখলাম। তার মধ্যে সৈন্য দেখলাম। তারা সকলে আমার নিকট চলে আসে। আমি তাদের ঘটনাটা শোনালাম। তারা আমাকে নৌকায় তুলে নিয়ে আহার করায় এবং এখানে নিয়ে এসে এই কমান্ডারের হাতে তুলে দেয়। কমান্ডার আমাকে আপনার কাছে নিয়ে আসে।'

'পথ দেখানোর জন্য তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাওয়া প্রয়োজন'– 'হুসামুদ্দীন বললেন– 'কিন্তু এই শরীরে যাবে কী করে? চেহারাটা তোমার লাশের ন্যায় সাদা হয়ে গেছে। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

'আমি এক্ষুনি আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত'– লোকটি বললো– 'আমি বিশ্রাম করতে পারি না। এই সফরে যদি ক্লান্তিতে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তো আমি প্রস্তুত আছি। ডাকাতদের কবলে আমাদের মেয়েদের না জানি কী পরিণতি ঘটেছে। এই নিষ্পাপ মেয়েগুলাকে হায়েনাদের কবল থেকে উদ্ধার করা আমার ঈমানী কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে আমি জীবন বিলিয়ে দিতে চাই।'

'দস্যুদের সংখ্যা কত?' হুসামুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'পাঁচশ'রও বেশি হবে।' লোকটি উত্তর দেয়।

'পাঁচশত লোক যথেষ্ট হবে?'– হুসামুদ্দীন স্থল বাহিনীর কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করেন– 'আমারও সঙ্গে থাকা প্রয়োজন।'

'হবে'– কমান্ডার উত্তর দেয়– 'তন্মধ্যে অন্তত একশত অশ্বারোহী এবং অবশিষ্টরা পদাতিক হবে। আমাদেরকে কমান্ডো অভিযান চালাতে হবে। সে জন্য গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত নীরবতা বজায় রাখতে হবে। ঘোড়া যতো বেশি হবে, শোরগোলের আশঙ্কা ততো বেশি হবে। আমি এর থেকে জায়গাটার অবস্থান ভালোভাবে বুঝে নিয়ে এখনই রওনা হয়ে যাবো। এমনিতেই এর এসে পৌঁছতে বিলম্ব হয়ে গেছে। আমাদের যতো দ্রুত সম্ভব পৌঁছে যাওয়া দরকার। আমি দিকটা অনুমান করে নিয়েছি। আশা করি সন্ধ্যায় রওনা হলে মধ্যরাত নাগাদ পৌঁছে যেতে পারবো।'

'ছোট মিনজানিক সঙ্গে নেবে'– হুসামুদ্দীন বললেন– 'তরল দাহ্য পদার্থের পাতিল এবং সলিতাওয়ালা তীরও রাখবে। আর একে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রাম করতে দাও। সকলকে বলে দেবে, মোকাবেলা দস্যুর সঙ্গে নয়– অভিজ্ঞ খৃস্টান সৈন্যদের সঙ্গে হবে।'

স্থল বাহিনীর কমান্ডার লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়।

❖ ❖ ❖

দস্যুদের ঘাঁটিটা দুর্গের মতো শক্ত ও দুর্ভেদ্য। টিলাগুলো আঁকাবাঁকা এমন দুর্গম পথ তৈরি করে রেখেছে যে, চির চেনা না হলে ঢুকলে আর বের হওয়া সম্ভব নয়। মধ্যখানে বিস্তৃত একটা মাঠ। মাঠের চতুর্পার্শ্বের টিলাগুলোর ভেতরে খৃস্টানরা অসংখ্য উঁচু ও লম্বা-চওড়া কক্ষ তৈরি করে রেখেছে। উট-ঘোড়ার থাকার জায়গা আলাদা। হুসামুদ্দীনের স্থল বাহিনীর নির্বাচিত ইউনিটটি পুরোপুরি নীরবতা বজায় রেখে মধ্যরাতের আগেই উক্ত অঞ্চলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। খৃস্টানরা ধরা পড়ার কিংবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বোধ হয় কখনো অনুভব করেনি। অন্যথায় এদিক-ওদিক প্রহরার ব্যবস্থা করে রাখতো।

হুসামুদ্দীন ঘোড়াগুলোকে পেছনে রাখেন, যাতে তাদের হ্রেষারব দুশমনের কানে না পৌঁছে। বাহিনীর কমান্ডার চারজন সৈনিক নিয়ে একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। এদিক-ওদিক মোড় ঘুরিয়ে অনেক ভেতরে চলে যায়। এবার ঘোড়ার ক্ষীণ শব্দ তার কানে আসতে শুরু করে। কমান্ডার একটা উঁচু টিলার উপর উঠে যায়। কমান্ডো আক্রমণ এবং লুকিয়ে লুকিয়ে টার্গেটে পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার ওস্তাদ কমান্ডার। টিলার উপরটা চওড়া। কমান্ডার সেখান থেকে নেমে আরেকটি টিলার উপর চড়ে। মানুষের হাঙ্গামার মতো শব্দ শুনতে পায়। সে সেখান থেকেও নেমে পড়ে। এবার অপর এক গলিতে ঢুকে হাঁটতে শুরু করে। হঠাৎ নিকট থেকে কারো কথা বলার শব্দ শুনতে পায়। কমান্ডার তার সৈনিকদের ইশারা করে। সকলে অস্ত্র তাক করে টিলার সঙ্গে গা ঘেঁষে এগুতে থাকে। সামনে মোড়।

দু'জন লোক কথা বলতে বলতে মোড়ে এসে পৌঁছে। কণ্ঠে বুঝা যাচ্ছে, লোকগুলো মদ খেয়ে এসেছে। সৈনিকদের অতিক্রম করে পা চারেক অগ্রসর হওয়া মাত্র পেছন থেকে সৈনিকরা তরবারীগুলো তাদের পার্শ্বে ঠেকিয়ে ধরে। কমান্ডার বললো– 'শব্দ করবে তো মেরে ফেলবো।'

সেখান থেকে তাদেরকে দূরে এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। তারা জীবন বাঁচাতে তাদের ঘাঁটির কথা বলে দেয় এবং সেখানে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়। মুসলিম কমান্ডার তাদের একজনকে সঙ্গে করে উপরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দস্যুদের আস্তানা দেখা যায়। উপর থেকে দেখে কমান্ডার অবাক্ হয়ে যায়। এই জাহান্নামসম অঞ্চলটাকে খৃস্টানরা

জান্নাতের দৃশ্য বানিয়ে রেখেছে। যেখানে পথিকরা পিপাসায় জীবন হারায়, সেখানে এরা মদপান করছে। মদ খেয়ে অনেকে এদিক-ওদিক বেহুঁশ পড়ে আছে। লোকগুলো প্রশস্ত মাঠটায় দলে দলে বিভক্ত হয়ে নানা কাজে ব্যস্ত। কোন দল মদপান করছে। কোন দল গল্প-গুজবে মেতে আছে। কোন দল বসে বসে গান গাইছে। এক স্থানে একটি মেয়ে নাচছে। তার চার পাশে অসংখ্য দর্শকের ভিড়। স্থানে স্থানে প্রদীপ জ্বলছে।

'যখন বড় কোন কাফেলা লুট করা হয়, এরূপ উৎসব তখনই পালন করা হয়। তিন-চার রাত চলে।' খৃস্টান বন্দি বললো।

'কতজন আছে?'

'প্রায় ছয়শত'– বন্দি জবাব দেয়– 'কমান্ডার একজন নাইট। এ সময়ে তার মেয়েদের নিয়ে পড়ে থাকার কথা।'

কমান্ডার টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঠের পরিসংখ্যানটা নিয়ে নেয়। প্রদীপের আলোতে যা কিছু দেখা যাচ্ছিলো, দেখে নেয়। যা কিছু দেখা যাচ্ছে না, বন্দি তার তথ্য দেয়। লোকগুলোকে হঠাৎ ঘিরে ফেলে কীভাবে কাবু করে ফেলা যায়, কমান্ডার সেই পরিকল্পনাই ঠিক করছে। পরে কয়েদীটাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে আসে। অপর কয়েদীও সঙ্গীদের নিয়ে হুসামুদ্দীনের নিকট চলে যায় এবং অভিযান কিরূপ হতে পারে ধারণা দেয়।

মাঠে প্রদীপের আলোতে গল্প-গুজবকারী খৃস্টান দস্যুদের সংখ্যা কমে গেছে। অনেকেই যার যার অবস্থানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে অল্প ক'জন। হুসামুদ্দীন বলে দেন যতো বেশিসংখ্যক সম্ভব দস্যুকে ধরে নিয়ে আসবে। কমান্ডার তাতে আপত্তি উত্থাপন করে বললো– 'আমি এদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই। হত্যা করে করে আমি এদের মৃতদেহগুলো শৃগাল-শকুন ও মরু শিয়ালের আহারের জন্য এখানে ফেলে রাখতে চাই। আপনি তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করে তাদের সম্রাটদের সঙ্গে কোন সওদা করতে চাচ্ছেন কি?'

'না'– হুসামুদ্দীন বললেন– 'আমারও প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা আছে। আমাদের সেই মুসলমান কয়েদীদের রক্তের বদলা নিতে হবে, যাদেরকে খৃস্টানদের এক যুদ্ধবাজ সম্রাট অর্নাথ আক্রা নিয়ে হত্যা করেছিলো। যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা আইনত অবৈধ। কিন্তু অর্নাথ প্রথমে আমাদের

সকল বন্দিকে উপোস রাখে, তাদের দ্বারা কঠিন কঠিন কাজ করায়। তারপর এক সারিতে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে। ঘটনাটা সাত বছর আগের। আমি জীবনেও এই স্মৃতি ভুলতে পারবো না। আজ প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়ে গেছি। আমি এ কথা শুনতে প্রস্তুত নই যে, খৃস্টান দস্যুরা আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে এসে মারা গেছে। তাদেরকে জীবিত ধরে নিয়ে আসো। তবে আমি তাদেরকে জীবিত রাখবো না। খৃস্টানরা আমাদের বন্দিদেরকে যেভাবে হত্যা করেছিলো, আমি তাদেরকে ঠিক সেভাবেই হত্যা করবো।'

হুসামুদ্দীনের সৈন্যরা তিনটি পথে এগিয়ে গিয়ে মাঠে ঢুকে পড়ে। তারা মাঠের স্থানে স্থানে প্রজ্বলমান প্রদীপ থেকে নিজেদের বাতিগুলো জ্বালিয়ে নেয়। যে ক'জন জাগ্রত ছিলো, তারা নেশার ঘোরে গালাগাল করতে শুরু করে। তারা যুদ্ধ করার পজিশনে নেই। আক্রমণকারী সৈন্যরা তাদেরকে জীবিত বন্দি করার পরিবর্তে তরবারীর আঘাতে হত্যা করতে শুরু করে। হট্টগোল শুনে ঘুমন্তরা জেগে ওঠে। কী ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই অধিকাংশ বর্শাবিদ্ধ হয়ে যায়। তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ পেলো না। গুহাসম কক্ষগুলো থেকে কয়েকজন বর্শা ও তরবারী নিয়ে বেরিয়ে আসে। তাদের কতিপয় মারা পড়ে এবং বাকিরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। তাদের নাইট এমনভাবে অচেতন পড়ে আছে যে, তার পরিধানে পোশাক নেই। সে গালাগাল করতে শুরু করে। মুসলিম সৈন্যদেরকে সে নিজের সৈন্য মনে করেছে। তার কক্ষ থেকে তিনটি মুসলিম মেয়ে বেরিয়ে আসে।

অন্যান্য কক্ষগুলো থেকেও আরো কয়েকটি মেয়ে বের হয়। তারা সকলে মুসলমান। অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তারা মুসলিম সৈন্যদেরকে সম্ভবত দস্যুদের অন্য কোন দল মনে করেছে। সে কারণে তারা ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলো, এরা মুসলিম সৈনিক, তখন তারা পাগলের ন্যায় আচরণ করতে শুরু করে। তারা কাঁদছে এবং দাঁত কড়মড় করে খৃস্টান দস্যুদের গালাগাল করছে। কেউ কেউ মুসলিম সৈন্যদেরকে কাপুরুষ বলে ভর্ৎসনা করছে যে, তোমরা যদি বীর মুসলমান হয়ে থাকো, তাহলে এদেরকে হত্যা করছো না কেন? তোমাদের কি বোন-কন্যা নেই? আমাদের সম্ভ্রম কি তোমাদের বোন-কন্যাদের ন্যায় মূল্যবান নয়?'

হুসামুদ্দীন ও স্থল বাহিনীর কমান্ডার কক্ষে কক্ষে তল্লাশি নিতে শুরু করেন। এখন বাইরে কোন যুদ্ধ নেই। দস্যুদেরকে আলাদা এক জায়গায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। সশস্ত্র সৈন্যরা তাদের ঘিরে রেখেছে।

সকালে যখন খৃস্টানদের নেশার ঘোর কাটে, তখন তারা সমুদ্রের কূলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উপবিষ্ট। হুসামুদ্দীন মেয়েগুলোকে জাহাজে তুলে রাখেন। বন্দিদের সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচশত। অন্যরা মারা গেছে। তারা টিলার অভ্যন্তরে যেসব মালামাল ও নগদ অর্থ জমা করে রেখেছিলো, সেগুলো খৃস্টান বন্দীদের দ্বারা বহন করিয়ে সমুদ্রকূলে নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কমান্ডার থেকে যেসব তথ্য বেরিয়ে আসে, তাতে জানা গেলো, এটি বিখ্যাত খৃস্টান সম্রাট রেনাল্ড ডি শাইতুনের বাহিনী। মুসলিম কাফেলাগুলো লুণ্ঠন করার জন্য এদেরকে এখানে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। কিছুদিন পর সেনা বদল হয়। নতুন একদল আসে তো আগের দল চলে যায়। লুণ্ঠিত অর্থ-সম্পদের একটা অংশ সৈন্যদেরকে দেয়া হয়। অবশিষ্টগুলো সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। উট-ঘোড়াগুলো সব রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে যায়।

মেয়েদের ব্যাপারে নির্দেশ ছিলো, অল্পবয়স্ক অসাধারণ রূপসী মেয়েদেরকে খৃস্টানদের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে হবে। সেখানে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর গুপ্তচরবৃত্তি এবং নাশকতার জন্য মুসলমানদের অঞ্চলে প্রেরণ করা হতো। কোন যুবতী মেয়ে যদি অতিশয় সুন্দরী হতো, তাহলে তাকেও হেডকোয়ার্টারের হাতে তুলে দেয়া হতো। অন্যান্য মেয়েদেরকে এই খৃস্টান সৈন্যরা নিজেদের কাছে রেখে দিতো।

'এই কাফেলায়ও কিশোরী মেয়ে ছিলো নিশ্চয়ই। ক'টা ছিলো?' হুসামুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'বারো-চৌদ্দটা'– খৃস্টান কমান্ডার বললো– 'মাত্র একটাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'আর অন্যরা?'

'সব ক'টা খুন হয়েছে।'

'কাফেলার যে ক'জন পুরুষকে নিয়ে এসেছিলো তাদেরকে মালপত্র বহন করার জন্য আনা হয়েছিলো। পরে তাদেরকেও হত্যা করা হয়েছে।'

খৃস্টান কমান্ডার যুবতী মেয়েদের সম্পর্কে জানায়- 'তাদের মধ্যে একজন নর্তকী ছিলো। অতিশয় রূপসী মেয়ে। তার দেহ-রূপ ও নাচ ঠিক সেই মানের ছিলো, যার জন্য আমরা মেয়ে সংগ্রহ করে থাকি। মেয়েটাকে সেদিন সন্ধ্যায়ই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেয়ার কারণ হচ্ছে, এমন মূল্যবান ও আকর্ষণীয় একটি মেয়ের সৈনিকদের মাঝে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোন সৈনিক তাকে মুক্ত করার টোপ দিয়ে ভাগিয়ে নিতে পারতো।'

'মুসলমানদের হজ্বযাত্রী কাফেলাকে তারা হত্যা করে ফেলেছে'- হুসামুদ্দীন কমান্ডারকে বললেন- 'কাফেলা হেজাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলো না। সেই হতভাগাদের পরিবর্তে আমি তাদের ঘাতকদেরকে হেজাজ প্রেরণ করবো এবং সেখানেই তাদেরকে হত্যা করাবো।'

দস্যুরা কাফেলাটা যেখানে লুণ্ঠন ও গণহত্যা করেছিলো, হুসামুদ্দীন বন্দিদেরকে সেখানে নিয়ে যান। ঘটনাস্থলে শিয়াল, নেকড়ে ও শকুনের খাওয়া লাশগুলো ছড়িয়ে আছে। হুসামুদ্দীন বন্দিদের দ্বারা কবর খনন করান। জানাযা পড়িয়ে সবক'টি লাশ দাফন করে ফেলেন। তিনি কায়রোর নির্দেশ ছাড়াই বন্দিদেরকে একটি জাহাজে করে জেদ্দার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। জেদ্দায় নামিয়ে তাদের এই বার্তাসহ হেজাজের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেয়া হয়, এদেরকে যেনো মিনার মাঠে হত্যা করা হয়। বার্তায় তিনি এদের অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এই খৃস্টান দস্যু সৈনিক এবং তাদের কমান্ডারের হত্যাকাণ্ডে বেশ মাতামাতি করেছেন এবং ইতিহাসের পাতায় অনেক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাদেরকে তারা যুদ্ধবন্দি আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কোন্ যুদ্ধে বন্দী হয়েছে, সে কথা উল্লেখ করেননি। তারা কোন দুর্গ কিংবা রণাঙ্গন থেকে বন্দি হয়নি- বন্দী হয়েছিলো কাফেলা লুণ্ঠণকারী ডাকাতদের ঘাঁটি থেকে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের লেখনী থেকে প্রমাণিত হয়, এই সিদ্ধান্তটা ছিলো নৌ-বাহিনী প্রধান হুসামুদ্দীন লুলুর একান্তই নিজস্ব, যার সম্পর্কে সুলতান আইউবী সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন।

❖ ❖ ❖

খৃস্টান দস্যু কমান্ডার যে নর্তকী সম্পর্কে বলেছিলো, তাকে সেদিন সন্ধ্যায়ই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সে হলো রাদী। কমান্ডারের জবানবন্দী

মোতাবেক মেয়েটাকে এতো দ্রুত পাঠিয়ে দেয়ার একটি কারণ হলো, মেয়েটি ঘোড়ার নীচে পড়ে আহত হয়েছিলো। যেহেতু তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাই তার চিকিৎসারও প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া কমান্ডার তাকে কাছে রেখে কোন প্রকার দুর্নাম মাথায় নিতে চাচ্ছিলো না।

যে সময়ে কমান্ডার হুসামুদ্দীনকে এসব জবানবন্দী দিচ্ছিলো, ততোক্ষণে রাদী চারজন খৃস্টান সৈন্যের সঙ্গে সেখান থেকে বহুদূর পৌঁছে গিয়েছিলো। সে ঘোড়ায় চড়া। এতোক্ষণে তার শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। পথে সে সৈন্যদের কয়েকবারই বলেছিলো, তোমরা আমাকে কায়রো দিয়ে আসো, আমি তোমাদেরকে বিপুল পুরস্কার দেবো। কিন্তু সৈন্যরা তাতে সম্মত হয়নি। অবশেষে এক সৈনিক বললো– 'তুমি দেখতে পাচ্ছো আমরা তোমাকে রাজকন্যার ন্যায় নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এতো রূপসী এবং তোমার শরীরে এমন যাদু আছে যে, যাকেই ইঙ্গিত করবে, সে-ই তোমার পায়ে এসে জীবন দেবে। তথাপি আমরা তোমর দেহ থেকে চার পা দূরে থাকছি। কারণ, তুমি আমাদের কাছে আমানত। আর এই আমানত আমাদের সম্রাটদের, যারা কিনা ক্রুশের রাজা। আমরা যদি তোমার প্রস্তাব মেনে নেই কিংবা তোমাকে আমাদের সম্পদ মনে করি, তাহলে আমাদেরকে না সম্রাটগণ ক্ষমা করবেন, না ক্রুশ।'

'আমাদের গন্তব্য কোথায়? রাদী জিজ্ঞেস করে।

'অনেক দূর'– একজন উত্তর দেয়– 'সফর অনেক কঠিন ও দীর্ঘ। আমাদেরকে এমন সব অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, যেগুলো মুসলমানদের দখলে।'

চার খৃস্টান সৈনিক রাদীকে আসলেই রাজকন্যার ন্যায় নিয়ে যাচ্ছিলো। এক সৈনিক জিজ্ঞেস করে– 'তোমাকে কোন শাসনকর্তা কিংবা বড় কোন ব্যবসায়ীর মেয়ে মনে হচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে হজ্বে যাচ্ছিলে, না?'

'কেউ কি তোমাদেরকে বলেনি, আমি নর্তকী?'– রাদী উত্তর দেয়– 'আমার পিতা নেই। কোন ভাই নেই। আমার মা ইসমাঈলার বিখ্যাত নর্তকী ও গায়িকা। আমি তার কোন্ খদ্দেরের কন্যা আমার জানা নেই। মা শৈশবেই আমাকে নাচের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। নাচ-গান আমার ভালো লাগতো। ষোল-সতের বছর বয়সে মা আমাকে বড় এক ধনী

লোকের ঘরে পাঠিয়ে দেন। লোকটা বৃদ্ধ ছিলো। মদে মাতাল ছিলো। আমাকে বললো, আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে যাচ্ছি। বৃদ্ধের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে যায়। আমার হৃদয়ে অনুভূতি জাগে, আমার পিতা নেই। বৃদ্ধকে দেখে আমার মনে পিতার কল্পনা এসে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ আমার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করতে শুরু করে। তাতে আমি বুঝে ফেলালাম, এই লোক আমার পিতা নয়- খদ্দের। আমি বৃদ্ধের কবল থেকে পালিয়ে গেলাম। মাকে বললাম। মা বুঝালেন, এটা তোমার পেশা। আমি মানলাম না। মা আমাকে মারধর করলেন। আমি বললাম, আমি নাচবো, গাইবো, কিন্তু কারো ঘরে যাবো না। মা আমার শর্ত মেনে নেন।

এবার বিত্তশালীরা আমাদের ঘরে আসতে শুরু করে। কারো ঘরে যাচ্ছি না বলে আমার দাম বেড়ে যায়। তিন বছর কেটে গেছে। এ সময় আমার মনে বাসনা জাগে, যদি এমন একজন সচ্চরিত্রবান পুরুষ পেয়ে যেতাম, যে আমার রূপ উপভোগ এবং নাচানোর পরিবর্তে আমাকে ভালোবাসবে, যার মধ্যে কোন বিলাসিতা ও বদমায়েশী থাকবে না। অবশেষে আমি একজন পুরুষ পেয়ে গেলাম। লোকটা দু'বার আমার ঘরে এসেছিলো। আমার তাকে ভালো লাগতো। বয়সে আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। আমরা ঘরের বাইরে মিলিত হতে শুরু করলাম। দু'জনের মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠলো। লোকটা রাজপুত্র ছিলো। মদপান করতো।

একদিন সন্ধ্যায় আমি তাকে বললাম, তুমি মদ ছেড়ে দাও। সে শপথ করে বললো, ভবিষ্যতে আমি আর কখনো মদপান করবো না। আর খায়নি। একদিন সে আমাকে বললো, তুমি নাচ ছেড়ে দাও। আমি কসম খেয়ে বললাম, এই পেশার প্রতি আমি অভিসম্পাত করবো। কিন্তু মায়ের ঘরে বাস করে তো এই পেশা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। সে বললো, আমি বিলাসী পিতার বিলাসী পুত্র। আমার পিতার হেরেমে তোমার চেয়েও অল্পবয়সী মেয়েরা আছে। সেই ঘরে বাস করে আমিও পুণ্যবান হতে পারবো না। আমি বললাম, আমি নর্তকী মায়ের নর্তকী মেয়ে আর তুমি বিলাসী পিতার বিলাসী পুত্র। তোমার পিতার চরিত্র তোমাকে নষ্ট করছে আর আমার মায়ের পেশা আমাকে নষ্ট করছে। চলো আমরা দূরে কোথাও পালিয়ে যাই এবং স্বামী-স্ত্রী হয়ে পবিত্র জীবন-যাপন করি। সে আমার প্রস্তাবটা মেনে নেয়।

ছেলেটা মুসলমান ছিলো। আমার কোন ধর্ম নেই। আমার জনক মুসলমান ছিলো নাকি ইহুদী-খৃষ্টান তাও আমি জানি না। আমি তাকে বললাম, আমাকে মুসলমানই মনে করো এবং বুঝাও ধর্ম কী। তুমি আমাকে ভালোবাসা দাও, পবিত্র জীবন দাও। সে অনেক চিন্তা করে বললো, পবিত্র যদি হতে চাও, তাহলে হেজাজ চলে যাও। আমি হেজাজের অনেক গান শুনেছি। যে গানে হেজাজ এবং হেজাজের কাফেলার কথা থাকে, সেই গান আমার খুব ভালো লাগে। একটা গান আমি একাকী গুন গুন করে থাকি– 'চলে কাফেলে হেজাজ কে'। ছেলেটা হেজাজের নাম উচ্চারণ করে আমার কামনাকে উত্তেজিত করে তোলে। বললাম, আমি প্রস্তুত। তুমি সাহস করো, আমার আকাঙ্খা পূর্ণ করো। সে জিজ্ঞেস করে, জানো, হেজাজ কেন যাবো? আমি বললাম, শুনেছি জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর। সে বললো, শুধু সুন্দরই নয়– পবিত্রও। ওখানেই কাবা ঘর। ওখানেই যমযমের কূপ। ওখানে যে যায়, তার আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। সেখানে গিয়ে আমরা হজ্ব করবো এবং পবিত্র হয়ে বিয়ে করবো। তারপর সেখানেই বসবাস করবো।

আমি সে সময়টার কথা ভুলতে পারবো না, যখন ছেলেটা আমার সঙ্গে শিশুর ন্যায় কথা বলছিলো আর আমি যেনো চোখের পথে তার আত্মায় ঢুকে গিয়েছিলাম। আমার ব্যক্তিসত্ত্বা তার সত্ত্বায় মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। আমি তাকে বললাম, যাবোই যখন সময় নষ্ট না করে আজই চলো– এখনই। সে বললো, কোন কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে হবে। দেখি কাফেলা কবে পাই। একাকী যাওয়া যাবে না।

একদিন সন্ধ্যায় সে আমাকে বললো, আজ রাতেই এখানে চলে আসবে। একটা কাফেলা রওনা হয়েছে। আমরা তার সঙ্গে মিশে যাবো। আমি বললাম, এখন ঘরে গেলে রাতে আর বেরুতে পারবো না। এখনই রওনা হও। সে বললো, ঠিক আছে, আসো। সন্ধ্যা গভীর হয়ে গেলে সে আমাকে এক স্থানে লুকিয়ে রেখে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর দু'টি ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসে। একটির উপর নিজে চড়ে বসেছে, অপরটি শূন্য। উভয়টির সঙ্গেই পানি ও খাবার বাঁধা আছে। আমরা পরদিন সন্ধ্যায় কাফেলার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হই এবং রাতে সেখানে গিয়ে পৌঁছাই, যেখানে তোমরা আমার স্বপ্নটাকে আমার ভালোবাসার লহুতে ডুবিয়ে দিয়েছো। লোকটা মারা গেছে। আমি ধরা পড়ে গেলাম। হেজাজের কাফেলাটা লুণ্ঠিত হলো

আর মনের মানুষটি স্বপ্নের পুরুষটি কাবা গৃহে না পৌঁছেই আল্লাহর নিকট চলে গেলো। আল্লাহ্ আমার পাপ ক্ষমা করেননি। আমার কপালের ভাগ্যে কাবা ঘরে সেজদা লিপিবদ্ধ হয়নি। আমার অস্তিত্ব নাপাক ছিলো। সে কারণেই আল্লাহ্ আমাকে কবুল করেননি।'

'তোমার যদি কোন ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় নিতেই হয়, তাহলে আমাদের ধর্মকে কাছে থেকে দেখে নিও।' এক সৈনিক বললো।

'তোমরা আমার একটা পবিত্র স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছো'– রাদী বললো– 'এটা কি তোমাদের ধর্মের আদেশ, যা তোমরা তামিল করেছো? এ ধরনের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আমার রওনা হওয়ার সময়ও ছিলো। কিন্তু শঙ্কাটা এতো ভয়ানক ছিলো না।'

'এটা আমাদের ধর্ম নয়'– সৈনিক বললো– 'এটা সেই মানুষদের নির্দেশ, আমরা যাদের চাকরি করি।'

'তোমাদের চেয়ে আমি অনেক ভালো'– রাদী বললো– 'রাজা-রাজপুতরা হিরা-জহরত নিয়ে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে থাকে। আর তোমরা তাদের দাসত্ব করছো। যে আদেশটা আত্মা থেকে আসে, সেটা মান্য করো। আমি সেই ব্যক্তির ধর্মের ভক্ত, যে আমাকে পবিত্র ভালোবাসা দান করেছে এবং পবিত্র চিন্তার অধিকারী করেছে। এর থেকেই ধরে নিয়েছি, তার ধর্মই মহান হবে। লোকটা আমাকে আমার স্বপ্নের ভূমি হেজাজ নিয়ে যাচ্ছিলো। তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

'আমরা মানুষের আদেশের কাছে দায়বদ্ধ।' সৈনিক বললো।

'আমি আল্লাহর হুকুমের পাবন্দ।' রাদী বললো।

'তোমার আল্লাহ্ তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন'– অপর এক সৈনিক বললো– 'এখন তুমি আমাদের কাছে দায়বদ্ধ। গন্তব্যে পৌঁছে ভেবো খোদাকে কীভাবে খুশি করবে। প্রয়োজন হলে কোন নেক কাজ করবে। হয়তো খোদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

'আমি জানি, তোমরা আমাকে কোথায় এবং কেন নিয়ে যাচ্ছো'– রাদী বললো– 'আমার অস্তিত্বটা আপাদমস্তক পাপ হয়ে যাবে এবং আমি কোন নেক কর্ম করতে পারবো না।'

'কোন পুণ্যের কল্পনাও তুমি করতে পারবে না'– এক সৈনিক বললো– 'তুমি পাপের সৃষ্টি। পাপের মাঝে লালিত-পালিত। একজন পাপিষ্টের সঙ্গে ঘর পালিয়েছো। কী পুণ্য করবে তুমি?'

'সেই নিরপরাধ মানুষগুলোর রক্তের প্রতিশোধ নেবো, তোমরা যাদেরকে হত্যা করেছো।' রাদী দাঁত কড়মড় করে বললো।

চার সৈনিক উচ্চকণ্ঠে একটা অট্টহাসি দেয়। একজন বললো– 'তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। আমরা এমনই আদেশ পেয়েছি। অন্যথায় এ ধরনের উক্তি তোমার মুখ থেকে দ্বিতীয়বার বের হতে পারতো না।'

রাদী লোকগুলোর প্রতি তাকিয়ে থাকে। তার হৃদয়ে এই অমানুষগুলোর প্রতি ঘৃণা বাড়তে থাকে।

মসুলে একজন দরবেশ এসেছেন। এক মুখ দু'মুখ করে সংবাদটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে মুহূর্ত মধ্যে। অশীতীপর এক বৃদ্ধ। মানুষ বলাবলি করছে, তিনি যে কোন ভাগ্যবান লোকেরই সঙ্গে কথা বলেন। আর যার সঙ্গে কথা বলেন, তার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যায়। নগরীর প্রাচীরের বাইরে একটি ঝুপড়িতে থাকেন। তার কারামতের কাহিনী নগরীর মানুষের মুখে মুখে।

জনতা দরবেশের আস্তানার চারদিকে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। তিনি সামান্য সময়ের জন্য বাইর এসে হাতের ইশারায় অপেক্ষমান জনতাকে নীরব থাকতে বলছেন। জনতা নিশ্চুপ হয়ে গেলে তিনি মুখে কিছু না বলে ইঙ্গিতে তাদের সান্ত্বনা প্রদান করে ঝুপড়িতে ঢুকে পড়ছেন। তার সঙ্গে সাদা-গোলাপী বর্ণেল চার-পাঁচজন সুশ্রী লোকও রয়েছে। দরবেশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবুজ চাদরে আবৃত।

এবার আরেক খবর। দরবেশ মসুলবাসীর জন্য কী একটা সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন। নগরীতে অপরিচিত লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। তারা জনতাকে দরবেশের কল্প-কাহিনী শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। শুনে মানুষ আপ্লুত হয়ে পড়ছে। সকলে এই দরবেশের দ্বারা নিজে সকল সমস্যা দূর করাতে এবং সকল কামনা পূরণ করাতে উদগ্রীব হয়ে উঠছে। অল্প ক'দিন পর খবর ছড়িয়ে পড়ে দরবেশ আসলে ইমাম মাহদী। কেউ কেউ বলছে ঈসা। ঐ যে আসমান থেকে দুনিয়াতে নেমে আসার কথা ছিলো, এসে পড়েছেন।

একদিন জনতা দেখলো, দরবেশ মসুলের গবর্নর ইয্যুদ্দীনের ঘোড়াগাড়িতে করে তার প্রাসাদ অভিমুখে যাচ্ছেন। ইয্যুদ্দীনের রক্ষী

সেনারা তাকে স্বাগত জানায় এবং তিনি মহলে ঢুকে পড়েন। ঘণ্টা কয়েক পর বেরিয়ে রাষ্ট্রীয় গাড়িতে করে চলে যান। জনতা তার আস্তানায় গিয়ে দেখে, আস্তানা উধাও। সেই গাড়িটিই দরবেশকে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। সন্ধ্যায় গাড়ি ফিরে আসে। ভেতরে গাড়োয়ান আর দু'জন রক্ষী। জনতা গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, দরবেশ কোথায়?

'আমরা বলতে পারবো না তিনি কোথায় গেছেন'– এক রক্ষী বললো– 'একটা পাহাড়ের নিকট গিয়ে গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি থেমে গেলে আমাদেরকে বললেন, তোমরা চলে যাও। আমরা তার এক সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর কোথায় যাচ্ছেন? তারা বললো, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় ধ্যানে বসবেন। দিগন্তে একটি নিদর্শন দেখতে পাবেন। তারপর পর্বতচূড়া থেকে নেমে এসে মসুলের গবর্নরকে বলবেন তার করণীয় কী। তারপর মসুলের বাহিনী যেদিকেই যাবে, পাহাড় তাদেরকে পথ করে দেবে। মরুভূমি শ্যামলিমায় ভরে ওঠবে। দুশমনের ফৌজ অন্ধ হয়ে যাবে এবং মসুলের গবর্নর যে পর্যন্ত পৌঁছবেন, সে পর্যন্ত তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সালাহুদ্দীন আইউবী ইয্‌যুদ্দীনের সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করবে। খৃস্টানরা তার গোলাম হয়ে যাবে এবং মসুলের অধিবাসীরা অর্ধ পৃথিবীর রাজা হয়ে যাবে। তারা সোনা-রূপার মধ্যে খেলা করবে। তবে আমরা বলতে পারবো না, তিনি কোন্ পাহাড়ে ধ্যানে বসবেন।'

মসুল থেকে খানিক দূরে একটি পার্বত্য অঞ্চল। সেখানে কোন বসতি নেই। একস্থানে একটা মাঠ আছে। মাঠটা পাহাড়বেষ্টিত। সেখানে দু'চারটি কুঁড়েঘর চোখে পড়ে। অঞ্চলটা সবুজ-শ্যামল। রাখালরা পশু চড়াতে নিয়ে যায়।

একদিন রাখালদেরকে সেদিকে পশু নিয়ে যেতে বারণ করা হলো। মসুলের সেনারা টহল দিয়ে ফিরছে। তাদের সঙ্গে বহিরাগত অচেনা লোকও আছে। পার্বত্য অঞ্চলটার বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষের যাতায়াত নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে অঞ্চলটার প্রতি মানুষের কৌতূহল জন্মে গেছে। সকলের মনে প্রশ্ন– ব্যাপারটা কী? মানুষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করে দেয়। নানা রকম বিস্ময়কর ও অভিনব কাহিনী ছড়াতে শুরু করে। একদিনের মধ্যেই সকলের কানে কানে পৌঁছে যায়, দরবেশ আকাশ থেকে একটি নিদর্শন লাভ করবেন। তারপর আধা পৃথিবীর উপর মসুলবাসীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

❖ ❖ ❖

ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। তাতে বসে ভিন্ন ধরনের কথা বলছে চার ব্যক্তি। তাদের একজন হাসান আল-ইদরীস। হাসান আল-ইদরীস সুলতান আইউবীর গুপ্তচর, যে কিনা বৈরুত থেকে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য নিয়ে এসেছিলো এবং সঙ্গে এনেছিলো মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীনের দূত এহতেশামুদ্দীন ও তার নর্তকী কন্যা সায়েরাকে। সে নজিরবিহীন সাফল্য ছিলো হাসানের। এহতেশামুদ্দীন সুলতান আইউবীকে তথ্য দিয়েছিলো, খৃস্টানরা মসুলের সন্নিকটে কোন এক পার্বত্য অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, দাহ্য পদার্থ এবং রসদ জমা করবে। তার থেকে প্রমাণিত হয়, তারা এ পার্বত্য অঞ্চলটাকে তাদের সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করবে। মসুলকে তো গেরিলাদের ঘাঁটি আগেই বানিয়ে নিয়েছে। সুলতান আইউবী ও তাঁর সালারগণ জানেন, যে বাহিনীর ঘাঁটি ও রসদ নিকটে থাকে, তারা অর্ধেক যুদ্ধ আগেই জিতে নেয়। খৃস্টান বাহিনীর একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যখনই তারা কোন অগ্রযাত্রা কিংবা আক্রমণ করেছে, আইউবীর কমান্ডো সৈন্যরা পেছনে গিয়ে তাদের রসদ ধ্বংস করে দিয়েছে কিংবা রসদ ও বাহিনীর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ফেলেছে। তাছাড়া যুদ্ধের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে সুলতান আইউবী আগে-ভাগে ঘাস-পানির জায়গাটা দখল করে নিতেন এবং পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তীরন্দাজদের বসিয়ে রাখতেন।

যা হোক, এহতেশামুদ্দীন থেকে তথ্য পাওয়ার পর সুলতান আইউবী গোয়েন্দা উপপ্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে আদেশ করেন, খুঁজে বের করো খৃস্টানরা কোন্ পাহাড়ে ঘাঁটি গেড়েছে। গেরিলা বাহিনীর প্রধান সারেম মিসরীকে বললেন, জায়গাটা চিহ্নিত হয়ে গেলে সব ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করবে। সুলতান আইউবীর দূরদর্শী চোখ দেখতে পেয়েছে, খৃস্টানরা এখন পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

সুলতান এহতেশামুদ্দীনের মুখে খৃস্টানদের প্রত্যয়-পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর পরিকল্পনা ঠিক করেন, খৃস্টানদের কোথাও দাঁড়াতে দেবেন না। তিনি এক আদেশ তো এই প্রদান করেন যে, খৃস্টানরা কোথায় ঘাঁটি গাড়ছে খোঁজ নাও। আরেকটি আদেশ জারি করেন, সানজার অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করো এবং দুর্গটা অবরোধ করে ফেলো।

সানজার মসুল থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ।

তার অধিপতি শরফুদ্দীন ইবনে কুতুবদ্দীন। সানজার দুর্গ দখল করার অভিযান সুলতান আইউবীর সেই পরিকল্পনারই ধারাবাহিকতা, তিনি বলেছেন– 'এখন আর আমি কারো নিকট সাহায্য ভিক্ষা করবো না, বরং তরবারীর আগা দ্বারা সাহায্য আদায় করবো।' তাঁর জানা ছিলো, ছোট ছোট মুসলিম আমীরগণ স্বাধীন শাসক থাকতে চাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে তারা তলে তলে খৃস্টানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। সানজারের অধিপতি শরফুদ্দীন সম্পর্কে সুলতানের নিকট নিশ্চিত তথ্য ছিলো, তিনিও ইয্যুদ্দীনের সুহৃদ। আর সেই হৃদ্যতার সূত্রে তিনিও সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

মসুলে মুসলিম গোয়েন্দা উপস্থিত ছিলো। তবু হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ভাবলেন, এ কাজের জন্য আরো বিচক্ষণ ও সাহসী গোয়েন্দা প্রেরণ করা আবশ্যক। খৃস্টানদের গোপন ঘাঁটি ও অস্ত্রের ডিপো আবিষ্কার করা সহজ হবে না। এরূপ গোয়েন্দা কে আছে? হ্যাঁ, হাসান আল-ইদরীস। তার কৃতিত্ব চোখের সামনে বিদ্যমান। কিন্তু হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাকে প্রেরণ করতে চাচ্ছেন না। কারণ, হাসান দীর্ঘ সময় বৈরুত অবস্থান করে এসেছে। শত্রুরা তাকে চিনে ফেলতে পারে। হাসান বেশ-ভূষা, কণ্ঠ ও বলার ভঙ্গিমা পরিবর্তন করার ওস্তাদ। সে হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে বললো, অসুবিধা নেই। আপনি আমাকে প্রেরণ করুন। আমি এমন এক রূপ ধারন করবো, চির পরিচিতরাও আমাকে চিনতে পারবে না। হাসানকে মসুলের কেউ চিনে না। অবশেষে তাকেই প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সুলতান আইউবী স্বয়ং দিক-নির্দেশনা প্রদান করে হাসান আল-ইদরীসকে প্রেরণ করেন।

'প্রিয় বন্ধু আমার!'– সুলতান আইউবী হাসান আল-ইদরীসের মাথায় হাত রেখে বললেন– 'ইতিহাসে নাম সালাহুদ্দীন আইউবীর আসবে। পরাজয়বরণ করবো তো ইতিহাস আমাকে লজ্জা দেবে। জয়লাভ করে মৃত্যুবরণ করবো তো মানুষ আমার কবরের উপর ফুল ছিটাবে। আর অনাগত প্রজন্ম আমার ভূয়সী প্রশংসা করবে। এটা খুবই অবিচার হবে। আমি বিজয়ের কৃতিত্ব তোমাকে এবং তোমার সেই সঙ্গীদের দিতে চাই, যারা দুশমনের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে আনছে এবং আমার বিজয়ের পথ সুগম করছে। আল্লাহ সাক্ষী, এটাই বাস্তব। আল্লাহ নিজ হাতে তোমাদের বিজয় মাল্য পরাবেন। তবে যদি পরাজিত হই,

তাহলে তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। তখন ধরে নেবো, আমি তোমাদের এনে দেয়া তথ্য অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছি। তোমরা আমার চোখ। তোমরা আমার কান। আমার আত্মা তোমাদের কবরের উপর ফুল ছিটাতে থাকবে। অতি মহান তুমি ও তোমার সঙ্গীরা। আমার কোন মর্যাদা নেই। আমি সমগ্র বাহিনী নিয়ে সানজার যাচ্ছি। আর তুমি যাচ্ছো একা। গোটা বাহিনীকে ব্যবহার করে আমি যে বিজয় অর্জন করবো, তুমি একাই তা করে ফেলবে। যাও বন্ধু, যাও। আল্লাহ হাফেজ।'

হাসান আল-ইদরীস একজন গরীব মুসাফিরের বেশে একটি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে নাসীবার তাঁবু থেকে বের হয়। সূর্য ডুবে গেছে। বেশ পথ অতিক্রম করার পর সে অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পায়। হাসান দাঁড়িয়ে যায়। তার জানা আছে এসব ঘোড়া কার। সুলতান আইউবী সানজার অভিযানে রওনা হয়েছেন। এটি তাঁরই বাহিনী। তিনি নাসীবা থেকে ক্যাম্প প্রত্যাহার করেননি। হেডকোয়ার্টার ও কতিপয় আমলাকে সেখানে রেখে এসেছেন। রিজার্ভ বাহিনীটিকেও প্রস্তুত অবস্থায় রেখে এসেছেন।

'তুমি জানতে এসেছো, খৃস্টানরা পার্বত্য অঞ্চলের কোন্ জায়গাটায় অস্ত্রের সমাবেশ ঘটাচ্ছে'— মসুলে কর্মরত মুসলিম গোয়েন্দাদের কমান্ডার বললো— 'আর আমরা এখানে জানবার চেষ্টা করছি, এই দরবেশটা কে, যিনি সেই পাহাড়গুলোরই কোন একটির চূড়ায় গিয়ে বসেছেন। কেউ তাকে ইমাম মাহদী বলছে। কেউ বলছে ঈসা।'

কমান্ডার হাসান আল-ইদরীসকে দরবেশের পূর্ণ কাহিনী শুনিয়ে বললো— 'ঐ পাহাড়গুলোর ধারে-কাছে ঘেঁষবারও অনুমতি নেই। ফৌজের কিছু সান্ত্রী এবং কতিপয় অপরিচিত লোক পাহারা দিচ্ছে। তারা কাউকে ওদিকে যেতে দিচ্ছে না। দরবেশ কোন একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছেন। খোদা আকাশ থেকে তাকে কোন একটা ইঙ্গিত দেবেন। রাতে মানুষ ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষ আল্লাহ-রাসূলকে ভুলে যাচ্ছে।'

এরা চারজন। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। তারা জানে, কুরআন-হাদীসে ভিত্তি নেই এমন বিশ্বাস-ধারণা সম্পূর্ণ হারাম। দরবেশকে কেন্দ্র করে এখন মানুষ যে বিশ্বাস পোষণ করছে, সবই কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন

কল্পনা মাত্র। ইসলামে এগুলো হারাম। চার গোয়েন্দা বসে বসে ভাবছে, কিভাবে দরবেশের রহস্য উদঘাটন করা যায়।

'বন্ধুগণ! যদি হেসে উড়িয়ে না দাও, তাহলে বলবো'– হাসান আল-ইদরীস বললো– 'দরবেশ যেখানে গিয়ে ধ্যানে বসেছেন, খৃস্টানদের অস্ত্রের ডিপো সেখানে। আর দরবেশ নাটক মঞ্চস্থ করা এবং উক্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা প্রমাণ করছে এই ডিপো বিপুল এবং এর পেছনে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বিদ্যমান। তোমরা জানো, এতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চার পার্শ্বে একটা পুরো বাহিনীর প্রহরা বসালেও কোন না কোন দিক থেকে মানুষ ভেতরে ঢুকে যেতে পারতো। সেই জন্য তারা দরবেশ নাটক মঞ্চস্থ করে প্রচার করেছে, পাহাড়ের চূড়ায় একজন দরবেশ বসে আছেন। তিনি চাচ্ছেন না কেউ উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করুক। ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এখন আর সেদিকে পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না।'

'ঘোষণা করা হয়েছে, কেউ যদি উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করার এবং দরবেশকে দেখার চেষ্টা করে, তাহলে সে নিজে অন্ধ হয়ে যাবে এবং তার সন্তানরাও অন্ধ হয়ে যাবে'– হাসান আল-ইদরীসের এক সঙ্গী বললো– 'খৃস্টানরা ওখানে কিছু রেখে থাকতে পারে তথ্য দিয়ে তোমরা আমাদের অর্ধেক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছো। রহস্য উদঘাটনে এখন আমাদেরকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।'

'দরবেশকেসহ অস্ত্রের ডিপোটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হবে।' হাসান আল-ইদরীস বললো।

'আর জনগণকে তাদের এই অলীক বিশ্বাস থেকে রক্ষা করতে হবে'– কমান্ডার বললো– 'খৃস্টানদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হবে। বেটারা অস্ত্রের ডিপোটা মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখার জন্য এক ব্যক্তিকে দরবেশ বানিয়ে পাহাড়ে নিয়ে বসিয়ে রেখেছে! সেই সঙ্গে মসুলের ফৌজ ও জনগণকে খোদার ইশারার টোপ দিয়ে সামরিক প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখার কৌশল অবলম্বন করেছে। অবস্থাটা দেখো, তাদের কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে ফৌজ এবং সাধারণ মানুষ সকলে সব বাদ দিয়ে খোদার ইশারার অপেক্ষায় বসে আছে।'

'দরবেশ সম্পর্কে মসুলের গবর্নরের দৃষ্টিভঙ্গী কী?' হাসান জিজ্ঞেস করে।

'দরবেশ তার মহলে তারই ঘোড়াগাড়িতে করে গিয়েছিলেন'–

কমান্ডার উত্তর দেয়– 'আবার সেই গাড়িতে করেই পার্বত্য এলাকায় চলে গেছেন। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীনও এই চক্রান্তে জড়িত কিংবা তিনিও এই ষড়যন্ত্রের শিকার। বাদ বাকি তথ্যও আমরা জেনে যাবো। রোজি খাতুন মহলে আছেন। তার থেকেই জানা যাবে, মহলে দরবেশের অবস্থান কী?'

সুলতান আইউবীর চার গোয়েন্দা উক্ত পার্বত্য অঞ্চল ও মহলে দরবেশের অবস্থান জানতে তৎপরতা শুরু করে দেয়।

সানজার দুর্গের প্রধান ফটকের প্রহরীরা ঘুম ঘুম চোখে শুয়ে আছে। যুগটা যুদ্ধ-বিগ্রহের হলেও সানজারের অধিপতি শরফুদ্দীন ইবনে কুতুবুদ্দীন কোন শঙ্কা অনুভব করছেন না। খৃস্টানদের আনুগত্য বরণ করে নিরাপত্তা বোধ করছেন তিনি। মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীন এবং হালবের গবর্নর ইমাদুদ্দীন তাকে বলে রেখেছেন, চিন্তা করবেন না, প্রয়োজন হলে আমরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবো। তিনি এই আত্মপ্রবঞ্চনায়ও লিপ্ত, সুলতান আইউবী তার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত নন। তিনি মদ-নারীতে মাতাল হয়ে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। খৃস্টানরা তাকে দু'টি অতিশয় সুন্দরী মেয়ে উপহার দিয়েছিলো। এই মেয়ে দুটো তাকে সবসময় স্বপ্নে বিভোর করে রাখছে।

দুর্গের প্রাচীরের উপর দিয়ে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় একটা বস্তু উড়ে যায়। পরক্ষণেই আরো একটা। তারপর আরো। প্রহরীরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এই স্ফুলিঙ্গগুলো দুর্গের ভেতরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ভয়ানক শিখায় পরিণত হয়ে যায়। নিকটেই মালপত্র পড়া আছে। কাছাকাছি একটি গৃহ। দুটোতেই আগুন ধরে যায়। বস্তুগুলো তরল দাহ্য পদার্থের পাতিল। সুলতান আইউবীর সৈন্যরা মিনজানিকের সাহায্যে সেগুলো নিক্ষেপ করেছে। সঙ্গে বাঁধা ছিলো প্রজ্জ্বল্যমান সলিতা। পাতিলগুলো ছিলো মাটির তৈরি। পড়েই ভেঙ্গে গেলো। আর অমনি ভেতরের তরল দাহ্য পদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়লো এবং সঙ্গে থাকা সলিতা থেকে আগুন ধরে গেলো।

দুর্গে প্রলয় ঘটে গেছে। যে যেখানে ছিলো জেগে ওঠেছে। দুর্গপতি শরফুদ্দীনকে জানানো হলো। তিনি কক্ষের জানালার ফাঁক দিয়ে আগুনের শিখা দেখে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন। শরফুদ্দীন এক সময় ময়দানের পুরুষ ছিলেন। কিন্তু খৃস্টানরা মদ-নারী দিয়ে তাকে এখানে

এনে পৌঁছিয়েছে। আজ রাতে তার পা চলছে না। রাতের পর রাত মরুভূমি ও দুর্গম পাহাড়ে ছুটে বেড়ানো যুদ্ধবাজ লোকটা এখন দুর্গের সমতল পথেও হাঁটতে পারছেন না।

খানিক পর উপর থেকে কমান্ডার দৌড়ে এসে শরফুদ্দীনকে জানালো, দুর্গ অবরোধ হয়েছে।

'কোন্ হতভাগা অবরোধ করলো?' শরফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'সালাহুদ্দীন আইউবী'– কমান্ডার উত্তর দেয়– 'তিনি বাইরে থেকে হুঙ্কার দিচ্ছেন, ফটক খুলে দাও। অন্যথায় দুর্গ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবো।'

শরফুদ্দীনের নেশা কেটে গেছে। তিনি ভাবনায় পড়ে যান। অনেকক্ষণ পরে বললেন– 'ফটক খুলে দাও। আমি নিজে বাইরে যাবো।'

দুর্গের ফটক খুলে গেছে। শরফুদ্দীন বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। ওদিক থেকে সুলতান আইউবী এক সালারকে বললেন, এগিয়ে গিয়ে শরফুদ্দীনকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সুলতান নিজে এক পা-ও অগ্রসর হলেন না। শরফুদ্দীন সুলতান আইউবীর সম্মুখে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দু'বাহু প্রসারিত করে সুলতানের দিকে ছুটে আসেন। সুলতান এমন একটা ভাব ধারণ করেন, যেনো তিনি শরফুদ্দীনের সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজি নন।

'শরফুদ্দীন!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'ফৌজ আর সামরিক সরঞ্জাম ব্যতীত যা কিছু নিতে চাও, রাত পোহাবার আগেই নিয়ে বেরিয়ে যাও। তারপর আর এদিকে মুখ ফেরাবে না।' সুলতান তার এক সালারকে বললেন– 'কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো এবং দেখো এরা নিষিদ্ধ কোন বস্তু নেয় কিনা। কতজন সৈন্য আছে গণনা করো এবং তাদেরকে আমাদের ফৌজে অন্তর্ভুক্ত করে নাও।'

'আমি আপনার গোলাম মহামান্য সুলতান'– শরফুদ্দীন বললেন– 'দুর্গ ও ফৌজ আপনারই থাকবে। আমাকে দুর্গে থাকতে দিন।'

'দুর্গের প্রয়োজন থাকলে মোকাবেলা করতে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমার ন্যায় এমন কাপুরুষ ও ঈমান নিলামকারীর এতো বড় দুর্গের অধিপতি হওয়ার অধিকার নেই।'

'আমি কীভাবে আপনার মোকাবেলা করবো!'– শরফুদ্দীন বললেন– 'শুনলাম আপনি এসেছেন আর অমনি বেরিয়ে এলাম। মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়ে কি করে!'

'যেমনটা আগে লড়েছো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'শরফুদ্দীন! তুমি খৃস্টানদের বন্ধু এবং নামের মুসলমান। নিজের চরিত্রটা একটু দেখে নাও। তুমি সৈনিক থেকে কী হয়েছো। ঈমান বিক্রি করে বিলাসিতা ক্রয়কারীদের এ দশাই হয়। মদ আর নারী তোমার সব শক্তি-সাহস নিঃশেষ করে দিয়েছে। তুমি মিথ্যাও বলছো। তোমার মধ্যে যদি এতোটুকু আত্মমর্যাদাবোধও থাকতো, তাহলে নিজের দুর্গটা এভাবে বিনা যুদ্ধে আমার হাতে তুলে দিতে না।'

'মহামান্য সুলতান!'– শরফুদ্দীন অনুনয়-বিনয় করেন– 'আমাকে দুর্গে থাকতে দিন।'

সুলতান আইউবী এক সালারকে বললেন– 'একে দুর্গে নিয়ে যাও এবং বন্দি করে ফেলো। এর বাসনা পূর্ণ করো।'

তিন-চারজন লোক সম্মুখে এগিয়ে আসলে শরফুদ্দীন সুলতান আইউবীর আরো নিকটে এসে মিনতির স্বরে বললেন– 'আমি মসুল যেতে চাই।'

'হ্যাঁ, ইয্‌যুদ্দীন তোমার বন্ধু'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তার কাছে চলে যাও।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সানজার দুর্গের দখল বুঝে নিয়ে তকিউদ্দীনকে অধিপতি নিযুক্ত করেন।

সম্মুখে আরেকটি দুর্গ আছে। তার নাম আমিদ। সুলতান অবশিষ্ট রাত সানজার দুর্গে অতিবাহিত করে সকালে আমিদ অভিমুখে রওনা হন। দুর্গটার বর্তমান নাম উমিদা। দজলার তীরে বিখ্যাত এক পল্লী ছিলো। তার আমীরও ছিলেন মুসলমান। এই পল্লীটাই একটা দুর্গ। সুলতান আইউবী সেটি অবরোধ করে ফেলেন। সেখানকার সেনা ও জনসাধারণ মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু অবরোধের অষ্টম দিন আমীর অস্ত্র সমর্পণ করেন। সুলতান আইউবী নূরুদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে এই দুর্গের অধিপতি নিযুক্ত করেন।

চার খৃস্টান সৈনিকের সঙ্গে রাদী এখনো সফরে আছে। তার শরীরিক অবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। খৃস্টান সৈনিকরা পথে তার বিশ্রাম ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি বেশ লক্ষ্য রেখে চলছে। কিন্তু যে রাতে সে তাদেরকে নিজের জীবন-কাহিনী শুনিয়েছিলো, তারপর আর তাদের সঙ্গে কথা বলেনি। খৃস্টান সৈনিকের 'খোদা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তুমি পুণ্য

করো, খোদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন' উক্তিটি তার হৃদয়ে তোলপাড় করে চলেছে। মেয়েটার শারীরিক অবস্থা ভালো থাকলেও মানসিক অবস্থা ভালো নয়। যে লোকটির সঙ্গে হজ্বে যাচ্ছিলো, তার স্মরণে সে ছটফট করছে। মনটা বেশি অস্থির হয়ে গেলে ভাবে– আল্লাহ আমাকে আমার পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। তার জানা ছিলো না, আল্লাহর সমীপে কীভাবে পাপের ক্ষমা চাইতে হয়।

চার রক্ষীর সঙ্গে রাদী গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। এখন তারা মসুলের সীমানার ভেতরে। একদিন তারা এক উষ্ট্রারোহীকে দেখতে পায়। আরোহী তাদের দেখে উট থামিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। লোকটার মাথা ও মুখমণ্ডল কালো পাগড়িতে পেঁচানো। শুধু চোখ দুটো খোলা। রাদীর উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। খৃস্টান সৈনিকরা সামরিক পোশাক পরিহিত ছিলো না। তাই তারা যে খৃস্টান সৈনিক বুঝবার উপায় নেই।

'উষ্ট্রারোহীর চোখ দুটো দেখেছো?' এক খৃস্টান তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে।

'অনেক গভীরভাবে দেখেছি'– একজন জবাব দেয়– 'এসব দৃষ্টির অর্থ আমি বুঝি। এখন আমাদেরকে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। মেয়েটা এতোই রূপসী যে, কোন দস্যুর চোখে পড়ে গেলে বিপদ হয়ে যাবে। সামনের অঞ্চলটা পাহাড়ী।'

তারা দিনভর চলতে থাকে। সন্ধ্যার পর দু'টি টিলার মধ্যখানে উপযুক্ত একটা জায়গা দেখে অবতরণ করে এবং খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে শুরু করে। খাওয়ার পর সকলে ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু প্রতিদিনকার ন্যায় একজন জেগে পাহারা দিতে থাকে। খানিক পর সে কিছু একটার শব্দ শুনতে পায়। শিয়াল কিংবা অন্য কোন প্রাণীর হাঁটার সময় ধাক্কা খেয়ে একটা পাথর খণ্ড ঢালু বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়েছে হয়তো। তথাপি সৈনিক সর্তক হয়ে যায়। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। শব্দটা আবারো শোনা গেলো। সৈনিক তার এক সঙ্গীকে জাগিয়ে তোলে এবং কানে কানে তাকে বিষয়টা অবহিত করে। সেও উঠে দাঁড়ায়। উভয়ে ধনুকে তীর সংযোজন করে একজন একদিকে অপরজন আরেক দিকে দাঁড়িয়ে যায়।

রাতটা অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু পরক্ষণেই পরপর দু'বার দুটো শব্দ ভেসে এলো। শব্দটা কোন দিক থেকে এলো বুঝে ওঠার আগেই একটি করে তীর

ধেয়ে এসে দু'জনের পাজরে গেঁথে যায়। তাদের অন্য সঙ্গীরা সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছিলো। জাগ্রত দু'জন তীর খেয়ে তাদের হাঁক দিলে তারা ধড়মড় করে উঠে বসে। তারা পলায়নপর পায়ের শব্দ শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রদীপ জ্বলে ওঠে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। পরক্ষণেই তারা সাত-আটজন লোকের অবরোধে চলে আসে। তাদের একজনের মাথা ও মুখমণ্ডলে কালো পাগড়ী পেঁচানো। দিনের বেলা যে উষ্ট্রারোহীকে দেখা গিয়েছিলো এবং রাদীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো, এই লোকটা সে-ই বলে মনে হলো।

দু'জনই সৈনিক। তারা তরবারী দ্বারা মোকাবেলা করে। কিন্তু সাত-আটটা বর্শা তাদের দেহ দুটোকে ঝাঝরা করে দেয়। রাদী আক্রমণকারীদের কব্জায় চলে আসে। মেয়েটি আলাদা এক স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার চেহারায় ভয়ের সামান্যতম ছাপও নেই। প্রদীপের কম্পমান আলোয় তার রূপটা এমন রহস্যময় মনে হচ্ছে, যেনো সে এ জগতের প্রাণী নয়।

রাদীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয়া হলো। কালো পাগড়িওয়ালাও ঘোড়ায় চড়ে বসে। দু'জন পাশাপাশি চলতে শুরু করে। লোকটা রাদীকে জিজ্ঞেস করে– 'নিজের সম্পর্কে কিছু বলবে কি?' রাদী সব কিছু বলে দেয়।

রাদীকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো, সেটি কোন প্রাসাদ কিংবা ঘর নয়– একটি তাঁবু। তাঁবুর অর্ধেকটা মাটির উপরে, অবশিষ্টটুকু নীচে। পার্টিশন ও শামিয়ানা ফুলদার রেশমি কাপড়ের। ভেতরে সুপরিসর একটি পালঙ্কের উপর জাজিম বিছানো। ঝাড়বাতির উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে ভেতরটা। মনেই হচ্ছে না এটি তাঁবু। থরে থরে সাজানো মদের পিপা-পেয়ালা। ভেতরে তিনজন লোক উপবিষ্ট। রাদী তৎক্ষণাৎই বুঝে ফেলে, লোকগুলো খৃস্টান। তারা রাদীকে দেখে অপলক চোখে তার প্রতি তাকিয়ে থাকে। কালো নেকাব পরিহিত লোকটা তার সঙ্গে। ভেতরে প্রবেশ করে মুখোশটা খুলে ফেলে দিয়েই বলে ওঠে– 'এমন উপহার আগে কখনো দেখেছো? তাছাড়া মেয়েটা নর্তকীও।'

রাদী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ঝাড়বাতির আলোতে তার রূপ অধিক যাদুময় মনে হচ্ছে। মেয়েটার মুখে ভয়-ভীতির কোন ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

রাদীকে পালঙ্কের উপর বসিয়ে দেয়া হলো। জিজ্ঞেস করা হলো–

'তুমি কে এবং কোথায় যাচ্ছিলে?'

রাদী তার জীবনের সকল বৃত্তান্ত শোনায়। তবে তাতে কারো মনে কোন প্রতিক্রিয়া জাগলো না। একজন নির্যাতিতা নারীর করুণ কাহিনীতে প্রভাবিত হওয়ার জন্য যে চেতনার প্রয়োজন, তা তাদের কাছে নেই। কোথায় যাচ্ছিলে? প্রশ্নের উত্তরে রাদী বললো- 'আমাকে এক খৃস্টান সম্রাটের নিকট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো।'

'তার মানে তুমি চারজন খৃস্টানকে হত্যা করেছো?' যে লোকটি রাদীকে নিয়ে এসেছে, একজন ক্ষুব্ধকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করে।

'তাদেরকে খৃস্টান মনে হচ্ছিলো না'- লোকটি উত্তর দেয়- 'তোমরা আমাকে বলেছিলে, দু'তিনটি মেয়ে নিয়ে আসো, যাদের নিয়ে আমরা এই বিজন ভূমিতে ফূর্তি করবো। আমি বেরিয়ে পড়লাম। ঘটনাক্রমে একে পেয়ে গেলাম। লোকগুলোকে সন্দেহভাজন মুসলমান মনে হলো। আমি তাদের পিছু নিলাম। লোকগুলোকে হত্যা করে মেয়েটাকে নিয়ে এলাম।'

'তোমার সঙ্গে কে কে ছিলো?'

'আমাদের মাত্র দু'জন ছিলো'- লোকটি উত্তর দেয়- 'অবশিষ্ট পাঁচজন মসুলের মুসলমান, যারা এখানে প্রহরার দায়িত্ব পালন করে থাকে।'

'চারজন খৃস্টানকে হত্যা করে তোমাদেরই এক সম্রাটের একটি উপহার ছিনিয়ে এনেছো, এই তথ্য যদি ফাঁস হয়ে যায় তাহলে জানো তার পরিণতি কী হবে?'

লোকটি কথা বলছে না। হঠাৎ এক ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ করে বললো- 'এই তথ্য ফাঁস হবে না। আপনি ভয় করছেন, আমরা যে মুসলমানরা সঙ্গে আছি এ তথ্য ফাঁস করে দেবো। না এমনটা হবে না।'

'এ লোকটি কে?'

'আমার ঘনিষ্ঠ সহচর'- আগের লোকটি বললো এবং মসুলের বড় এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বললো- 'তিনি দিয়েছেন। বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান।'

'আমি আপনাদেরই লোক'- নবাগত লোকটি বললো- 'মসুলের যেসব তথ্য আপনারা লাভ করছেন, সব আমার ও আমার সঙ্গীদেরই সংগ্রহ করা তথ্য।'

লোকটাকে আরো অনেক প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে সে এমন ধারায় কথা বলে যে, সবাই তাকে বিশ্বস্ত বলে নিশ্চিত হয়ে যায়। কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগলো না, লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর

ভয়ঙ্কর একজন গুপ্তচর, যার নাম হাসান আল-ইদরীস। আল্লাহ লোকটার মুখাবয়ব ও দৈনিক গঠনে এমন এক আকর্ষণ দান করেছেন, যে কেউ এক নজর দেখার পর তার ভক্ত হয়ে যায়। লোকটার মুখের ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিতে এমন এক যাদু যে, তার বক্তব্যে শ্রোতারা মুগ্ধ হতে বাধ্য। তাছাড়া যেকোন সময় যেকোন রূপ ও যেকোন ভাব ধারণ করায় বড় পারঙ্গম। মসুলে সুলতান আইউবীর যে ক'জন গোয়েন্দা ছিলো, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত তাদের যাতায়াত ও যোগাযোগ ছিলো। তারা তথ্য সংগ্রহ করেছে, মসুলের গবর্নর ইয্যুদ্দীনও উক্ত দরবেশ দ্বারা প্রভাবিত। মসুলের জনসাধারণের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করে নিয়েছেন, দরবেশ আসমান থেকে ইশারা লাভ করবেন এবং পরে যখনই তার বাহিনী অভিযানে অবতীর্ণ হবে, তখন জয়ের পর জয়লাভ করতে থাকবে।

গোয়েন্দাদের এ তথ্য সরবরাহ করেছেন নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রোজি খাতুন। তিনি আইউবীর গোয়েন্দাদের তথ্য সরবরাহ করেছেন, ইয্যুদ্দীন অত্যন্ত কঠোরভাবে খৃস্টানদের জালে আটকে গেছেন। খৃস্টানরা যেনো তাকে যাদু করে ফেলেছে। দরবেশটা যদি খৃস্টানদের সাজানো নাটক না হয়ে দরবেশই হয়ে থাকে, তাহলে লোকটা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত। আল্লাহ তাকে জয়ের ইঙ্গিত দান করবেন, তার এই আগাম ঘোষণা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পরিপন্থী।

এসব তথ্য সরবরাহ করে রোজি খাতুন গোয়েন্দাদের পরামর্শ প্রদান করেন, তোমরা দরবেশটার মুখোশ উন্মোচন করো এবং সম্ভব হলে তাকে হত্যা করে ফেলো। রোজি খাতুন এই সন্দেহও ব্যক্ত করেন যে, খৃস্টানরা উক্ত পাহাড়ের অভ্যন্তরে কিছু একটা করছে। তোমরা তথ্য নাও কী করছে এবং সুলতান আইউবীকে অবহিত করো।

হাসান আল-ইদরীস দরবেশের রহস্যময় জগতে ঢুকে পড়েছে। এই পার্বত্য অঞ্চলে কর্তব্যরত খৃস্টানদের বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে হাসান। কিন্তু একটা সীমানার পরে আর অগ্রসর হওয়ার এখনো অনুমতি পাচ্ছে না সে। রহস্য এই সীমানারও পরে। পাহাড়গুলো বেশ উঁচু। স্থানে স্থানে উঁচু উঁচু অনেক টিলা। হাসান আল-ইদরীস দরবেশের দর্শন লাভে উদগ্রীব। কিন্তু তার দেখা মিলছে না। সন্দেহ জাগতে পারে ভয়ে কাউকে জিজ্ঞেসও করছে না। লোকটা খৃস্টানদের এতোই

আস্থাভাজন হয়ে গেছে যে, তারা তাকে রাদীর অপহরণে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো।

রাদী তাঁবুতে অবস্থানকারী দু'তিনজন খৃস্টানের বিনোদনের উপকরণে পরিণত হয়েছে। মেয়েটার প্রতি দলনেতার লোভ ও আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। তাই মেয়েটাকে সে যে কারো খেলনা হয়ে থাকতে দিতে চাচ্ছে না। এক রাতে দলনেতা রাদীকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি আমাদের সন্তুষ্টির জন্য নাচছো? আমার সঙ্গে রাত যাপন করে কি তুমি আনন্দ অনুভব করছো?'

'না আপনাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, না আমি আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট'– রাদী গম্ভীর কণ্ঠে বললো– 'নিরুপায় হয়েই আমি আপনাদের খেলনা হয়ে আছি। মনের কথা বলতে আমি ভয় করবো না। আপনাদেরকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। আপনাদের আদেশ আমি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পালন করি।'

'তুমি কি জানো, এই অপমানজনক বক্তব্যের জন্য আমি তোমার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারি'– দলনেতা বললো– 'ইচ্ছে করলে আমি তোমার এই সুন্দর চেহারাটা শৃগাল-শকুনের সম্মুখে নিক্ষেপ করতে পারি?'

'যদি করেন, তাহলে এটা হবে আমার জন্য বিরাট এক পুরস্কার'– রাদী বললো– 'আমার মাথাটা দেহে থাকা আমার জন্য কঠিন এক শাস্তি। আপনার ন্যায় শেয়ালটা তো আমার আত্মাটাকে খাবলে খাবলে খাচ্ছেনই। আপনি নিজেকে যুদ্ধবাজ ও বীর মনে করে থাকেন। একটা অসহায় মেয়েকে বন্দি করে গর্ব করছেন। পৌরুষ আর তরবারীর জোরে আপনি আমাকে দাসীতে পরিণত করতে চাচ্ছেন। পারেন যদি আমার হৃদয়ের উপর এমনভাবে শাসন করেন, যেনো জিজ্ঞেস করতে না হয়, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য আপনার আদেশ মান্য করছি কিনা। বরং আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, আমার নাচ ও অস্তিত্বে আপনি আনন্দ লাভ করছেন কিনা?'

'আচ্ছা, আমি যদি তোমার সম্মুখে সোনার স্তূপ রেখে দেই, তাহলে কি তুমি আমাকে হৃদয় থেকে মনিব বলে মেনে নেবে?'

'না'– রাদী উত্তর দেয়– 'আমার যে পুরস্কারের প্রয়োজন, তা তোমাদের কাছে নেই। যার কাছে ছিলো, সে মারা গেছে। লোকটা

মানুষ ছিলো, দেহের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিলো না। আর তোমরা! তোমরা শিয়াল-শকুন-নেকড়ে।'

'লোকটা তোমাকে ভালোবাসা দিয়েছিলো'– দলনেতা বললো– 'আমি যদি তোমাকে সেই ভালোবাসা দেই, তাহলে?'

'আমি নই– আমার আত্মা ভালোবাসার পিয়াসী।' রাদী উত্তর দেয়। দলনেতা মদের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মুখের সঙ্গে লাগাতে উদ্যত হয়। রাদী খপ করে পেয়ালাটা ধরে ফেলে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে বললো–'কথা বলতে যখন বাধ্য করেছো, শুনে নাও। মদপান করবে তো তোমার বিবেক ও চেতনার উপর পর্দা পড়ে যাবে। তুমি জিজ্ঞেস করেছো, তুমি যদি আমাকে সেই ভালোবাসা প্রদান করো, তাহলে আমি বরণ করবো কিনা? আগে আমাকে ভালোবাসা দেখাও। যদি পারো, তাহলে যদি তুমি আমাকে উত্তপ্ত মরুভূমিতেও নিয়ে যাও, আমি খুশিমনে তোমার সঙ্গে যাবো এবং জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবো।'

দলনেতা মেয়েটির প্রতি তাকায়। লোকটা মেয়েটির সর্বাঙ্গ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকে। দেখে আসছে তো কয়েকদিন ধরেই। মেয়েটার বিক্ষিপ্ত রেশম কোমল চুলের পরশও উপভোগ করেছিলো। উন্মুক্ত বক্ষ তার উন্মুক্ত পিঠের উপর ছড়িয়ে থাকা অবস্থায়ও এই চুলের যাদু প্রত্যক্ষ করেছে লোকটা। মেয়েটার দেহ সম্পর্কে এতোটাই অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেছে যে, অতোটা অভিজ্ঞতা তার নিজ দেহ সম্পর্কেও ছিলো না। কিন্তু রাদী যখন লোকটার প্রতি নির্লিপ্তভাবে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলো এবং হাত থেকে মদের পেয়ালাটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলো, তখন তার পৌরুষ যেনো হারিয়ে গেলো। লোকটা নিজের মধ্যে এমন অসহায়ত্ব অনুভব করলো, যেনো মেয়েটা তাকে যাদু করে ফেলেছে। একজন পুরুষ দশজন পুরুষের মোকাবেলা করতে পারে। লড়তে পারে হিংস্র প্রাণীর সঙ্গেও। কিন্তু ভালোবাসার নারীটা যখন বলে বসে, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তখন সে বালির স্তূপে পরিণত হয়ে যায়। এই খৃস্টান লোকটির অবস্থাও হয়েছে তা-ই।

'আমি তোমাকে আমার কোন সঙ্গীর খেলনায় পরিণত হতে দেবো না।'

'আমি হুকুমের গোলাম'– রাদী বললো– 'আমি আত্মহত্যা করবো না। আত্মহত্যা করা কাপুরুষতা। পালাবারও চেষ্টা করবো না। এটা প্রতারণা। আমি আত্মহত্যা করে ফেলেছি। নিজের আত্মাটাকে আমি মেরে ফেলেছি।'

লোকটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে এমনভাবে পা ফেলে রাদীর দিকে এগিয়ে যায়, যেনো রাদী তাকে যাদু করেছে। কাছে এসে ধীরে ধীরে ডান হাতটা উপরে তুলে রাদীর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো– 'তুমি আমার কল্পনার চেয়েও বেশি রূপসী।' বলেই হাতটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে বললো– 'আজ আমি প্রথমবার অনুভব করেছি, তোমার কণ্ঠে জ্বলন আছে। তুমি নর্তকী– গায়িকা নও তো?'

'আমি গানও গাই'– রাদী বললো– 'কিন্তু গান সেটি শোনাবো, যেটি আমার ভালো লাগে, যার মধ্যে আমার ব্যথা আছে।'

রাদী গুন গুন করতে শুরু করে– 'চলে কাফেলে হেজাজ কে।'

তাঁবুর ভেতরের পরিবেশটা এখন আবেগময়। রাদীর প্রতিটি শব্দ হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে আসছে। এই গানটায় তার ভালোবাসার স্বাক্ষর আছে। হৃদয়ের কান্না আছে। কামনার জ্বলন আছে। আছে তার সেই স্বপ্নমালার সৌন্দর্য, যা হেজাজের পথে শহীদ হয়ে গেছে।

রাদীর চোখে অশ্রু সাঁতার কাটতে শুরু করে। তার গানের লয়-তাল আরো জ্বালাময়ী হয়ে ওঠে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এই গানেও খৃস্টান দলনেতার এমন ঝিমুনি আসতে শুরু করে, যা তার জীবনে কখনো আসেনি। প্রতি রাতেই মদপান করে অচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়া ছিলো তার স্বভাব।

রাদীর গানের তালে তালে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে খৃস্টান দলনেতা।

পালঙ্কের সন্নিকটে তেপাইর উপর পড়ে থাকা লোকটার উপর চোখ পড়ে রাদীর। রাদী ধীরে ধীরে খঞ্জরটা খাপ থেকে বের করে। খঞ্জরের আগায় আঙ্গুল রাখে এবং অস্ত্রটা শক্ত করে ধরে ঘুমিয়ে থাকা খৃস্টানের নিকট চলে যায়। খঞ্জরের আগাটা লোকটার ধমনীর কাছে নিয়ে যায়। তারপর হৃদপিণ্ডটা কোথায় থাকতে পারে ঠিক করে হাতটা উপরে তোলে। অমনি একটা শব্দ ভেসে আসে কানে– 'শী'। হঠাৎ চমকে ওঠে হাতটা সরিয়ে নিয়ে রাদী ওদিকে তাকায়। তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে সেই সুদর্শন যুবকটা দাঁড়িয়ে, যে বলেছিলো আমি খৃস্টানদের গুপ্তচর মুসলমান হাসান আল-ইদরীস।

হাসান আল-ইদরীস হাতের ইশারায় রাদীকে ডাক দেয়। রাদী খঞ্জরটা খাপে ঢুকিয়ে উঠে এগিয়ে যায়। হাসান রাদীকে বাহুতে ধরে

বাইরে নিয়ে যায়। বললো– 'আজ রাত লোকটা একা। অন্যরা অনেক দিনের জন্য চলে গেছে। এই লোকটা আমার দায়িত্ব ও নিরাপত্তায় রয়েছে। কিন্তু আমি একজন ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করবো না। আমার দায়িত্ববোধ আছে। কেউ তাকে খুন করতে এলে সে আমার হাতে মারা যাবে। তুমি তাকে বলেছিলে আমি আত্মহত্যা করবো না। কারণ, এটা কাপুরুষতা। আর আমি পালাবোও না, কারণ এটা প্রতারণা। কিন্তু তুমি একজন ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করতে চেয়েছিলে, এটা কি প্রতারণা নয়?'

'তুমি কি তাকে বলে দেবে, আমি তার ধমনি ও হৃদপিণ্ডের উপর খঞ্জর রেখেছিলাম'– রাদী জিজ্ঞেস করে এবং দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো– 'যদি বলে দাও, তাহলে লোকটা আমাকে মেরে ফেলবে। তাতে আমার ভালো হবে। তোমারও উপকার হবে। তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন।'

'এই লোকটার প্রতি আমার ততোখানি ঘৃণা, যতোখানি তোমার অন্তরে রয়েছে'– হাসান আল-ইদরীস বললো– 'আমি তাকে কিছুই বলবো না।'

'বিনিময়ে আমার থেকে তার পুরস্কার দাবি করবে?'– রাদী জিজ্ঞেস করে– 'বরং পুরস্কার হিসেবে আমাকেই চেয়ে বসবে, না।'

'না'– হাসান আল-ইদরীস বললো– 'আমার কোন পুরস্কারের প্রয়োজন নেই।'

হাসান মেয়েটাকে খানিক আড়ালে নিয়ে গিয়ে মমতার সুরে বললো– 'আমি তোমার ন্যায় হেজাজেরই যাত্রী। যে রাতে আমরা তোমাকে অপহরণ করে এনেছিলাম, সে রাতে তুমি আমাদেরকে তোমার বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলে। তুমি তোমার হৃদয়ের আবেগ এবং একটি বাসনার কথা ব্যক্ত করেছিলে। তখন থেকেই আমি ভাবছি, তোমাকে কোন্ পুণ্যের কথা বলবো, যার মাধ্যমে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।'

হাসান আল-ইদরীসের মুখের যাদু রাদীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। হাসান বলতে থাকে আর রাদী শুনতে থাকে। সুলতান আইউবীর এই গোয়েন্দা এই রূপসী মেয়েটার হৃদয়টা জয় করে ফেলেছে। এখন আর রাদী সেখান থেকে উঠতে চাচ্ছে না। হাসান আল-ইদরীস তাকে চলে যেতে বাধ্য করে।

এভাবে তিন-চার রাত দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটে। হাসান আল-ইদরীস মেয়েটাকে তার আবেগময় বক্তব্য ও সৎ উদ্দেশ্যের যাদুতে আটকে ফেলে। রাদী তার কাছে হেজাজের কথা জিজ্ঞেস করতে থাকে আর সে অত্যন্ত

আবেগময় ভঙ্গিতে তাকে হেজাজের চিত্তাকর্ষক কথা-বার্তা শোনাতে থাকে। দিনের বেলা হাসান জানার চেষ্টা করছে, যে স্থানটায় তাকে যেতে দেয়া হচ্ছে না, সেখানে কী আছে। কিন্তু সে কিছুই জানতে পারছে না।

এক রাতে হাসান মেয়েটাকে বললো– 'আচ্ছা, লোকগুলো ঐ পাহাড়টায় কী লুকিয়ে রেখেছে বলতে পারো?' রাদী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়– 'যুদ্ধের সরঞ্জাম। ঐ লোকটা (দলনেতা) আমাকে বলতো, তার মধ্যে দাহ্য প্রদার্থ এতো পরিমাণে আছে যে, মুসলমানদের সমগ্র নগরীকে পুড়িয়েও শেষ হবে না। আমি লোকটার দাসী কিংবা গনিকা ঠিক, কিন্তু সে আমার সম্মুখে দাসের ন্যায়ই আচরণ করে থাকে।'

'তুমি কি আনন্দিত যে, তুমি উচ্চপদস্থ একজন খৃস্টানের গনিকা আর তিনি তোমার গোলাম?'

'না'– রাদী উত্তর দেয়– 'আমি দেহের কথা বলছি। আমার আত্মা কখনো আনন্দিত হবে না। যারা আমাকে হেজাজের পথ থেকে অপহরণ করে এনেছিলো, তারা বলতো, খোদা তোমার উপর অসন্তুষ্ট। এমন একটি পুণ্য করো, যার উসিলায় খোদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে লোকটি আমাকে হেজাজ নিয়ে যাচ্ছিলো, আমি যাকে কামনা করছিলাম, সে বলতো, আমরা হজ্ব করে পবিত্র হয়ে যাবো। তারপর সেখানেই বিয়ে করবো। আমি পাপের সাগরে ডুবে যাচ্ছি। খোদা আমাকে শাস্তি দিয়ে চলেছেন।'

'শুধু যমযমের পানিই নয়– আগুনও তোমাকে পবিত্র করতে পারে'– হাসান আল-ইদরীস হেসে বললো– 'তুমি হেজাজ যেতে পারোনি। এখন হেজাজের প্রহরীকে সন্তুষ্ট করো, খোদা তোমার আত্মাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবেন। তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে।'

'হেজাজের প্রহরী কে?'– রাদী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে– 'আর সে কোন্ আগুন, যে আমাকে পবিত্র করতে পারবে?'

'হেজাজের প্রহরী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী'– হাসান আল-ইদরীস বললো– 'আর আগুন হচ্ছে, এই পাহাড়ী অঞ্চলে মটকা ও পাতিলে ভর্তি যে বিপুল তেল আছে, সেগুলো, যে তেলের মাধ্যমে হেজাজ পর্যন্ত পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া সম্ভব। পাহাড়ী অঞ্চলের যে জায়গাটায় আগুন ও যুদ্ধ সরঞ্জাম আছে, তুমি আমাকে সেই পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।

রাদী কিছুই বুঝতে পারলো না। হাসান আল-ইদরীস তাকে দীর্ঘ কাহিনী শোনায়। সুলতান আইউবীর প্রত্যয়-পরিকল্পনা ও চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করে। খৃস্টানদের পরিকল্পনার কথাও জানায় এবং এমন এমন কথা শোনায়, যার ফলে তার হৃদয়ে খৃস্টানদের প্রতি ঘৃণা জন্মে যায় এবং হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব তার বুঝে এসে যায়।

❖ ❖ ❖

পরদিন আল-ইদরীস দেখে রাদী ঘোড়ায় চড়ে তার মনিব খৃস্টান দলনেতার সঙ্গে পাহাড়ের সেই অংশটায় ঢুকে পড়েছে, যেখানে হাসান ও খৃস্টান প্রহরীদের যাওয়ার অনুমতি নেই। রাতে দলনেতা রাদীকে নিয়ে মনোরঞ্জন করে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। হাসান আল-ইদরীস তাকে কিছু পাউডার দিয়েছিলো। রাদী সেগুলো মদের সঙ্গে মিশিয়ে লোকটাকে খাইয়ে অচেতনের ন্যায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। গোয়েন্দারা চেতনানাশক পাউডার সঙ্গে রাখে। প্রয়োজন হলে ব্যবহার করে। রাদী ফিরে এসে নির্ধারিত স্থানে হাসান আল-ইদরীসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

'ওখানে বিশাল এক গুহা'– রাদী বললো– 'এরা খনন করে করে গুহাটাকে আরো প্রশস্ত করে নিয়েছে। এতো চওড়া ও দীর্ঘ যে, একদিক দাঁড়ালে অপরদিক দেখা যায় না। বিশাল এক গুদাম। ভেতরে দাহ্য পদার্থ ভর্তি হাজার হাজার মটকা। বর্শা, তীর-ধনুক, খাদ্যদ্রব্য, তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জামের কোন হিসেব নেই। আমি খৃস্টান লোকটাকে শিশুর ন্যায় বললাম, আমি ঐ পাহাড়ী এলাকাটায় একটু বেড়াতে যেতে চাই। তিনি বললেন, কাল দিনে নিয়ে যাবো। তুমি আমার রাণী। তবে কাউকে বলবে না ওদিকে গিয়েছিলে। তিনি আমাকে নিয়ে যান।'

রাদী জানালো– গুহার সম্মুখে দু'জন লোক প্রহরায় দাঁড়িয়ে থাকে। মুখটা খোলা থাকে। শ' দেড়েক গজ দূরে প্রহরীদের তাঁবু। গুহা থেকে সামান্য দূরে অপর একটি তাঁবু, যার বাইরে দুর্বল এক বৃদ্ধ বসে ঝিমুচ্ছিলো। দলনেতা তাকে পা দ্বারা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে বললো– 'ঐ দরবেশ! কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? ভাত-পানি পাচ্ছো ঠিক মতো?' বৃদ্ধ দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'জনাব! আমাকে কবে মুক্তি দেবেন? এবার আমাকে যেতে দিন।' নেতা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো– অপেক্ষা করো, অনেক পুরস্কার পাবে। এই লোকটাই বোধ হয় সেই দরবেশ, তুমি যার কথা বলেছিলে।'

'হ্যাঁ'– হাসান আল-ইদরীস বললো– 'এ খৃস্টানদের সেই নাটক, যেটি মসুলের জনসাধারণ ও তাদের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীনকে পর্যন্ত মাতাল বানিয়ে রেখেছে। আসো রাদী। দু'জনে মিলে আল্লাহর নিকট তোমার জীবনের সব পাপের ক্ষমা আদায় করে নিই।'

দু'জন রওনা হয়ে যায়। তবে চুপিসারে। রাতের আঁধার তাদের সহায়তা করছে। দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী সরুপথে কান খাড়া রেখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলে। যে স্থানটায় দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, সে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। প্রহরীদের নিকট একটি প্রদীপ জ্বলছে, যার লাঠিটা মাটিতে গাড়া। হাসান আল-ইদরীস ও রাদী তাদের থেকে পনের-বিশ পা দূরে লুকিয়ে থাকে। দু'জনই জীবন বাজি রাখতে এসেছে। আল্লাহ দেখছেন। হাসান আল-ইদরীস রাদীকে এক ধারে সরিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়ে। এক সান্ত্রী 'কে?' হাঁক দিয়ে এদিকে এগিয়ে আসে। অন্ধকারে লোকটা কিছুই দেখলো না। হাসান আল-ইদরীস পেছন থেকে তার ঘাড়টা এক বাহুতে জড়িয়ে ধরে অপর হাতে তার হৃদপিণ্ডের উপর খঞ্জর দ্বারা তিন-চারটা আঘাত হানে। সান্ত্রী লুটিয়ে পড়ে যায়।

হাসান আল-ইদরীস অপেক্ষা করতে থাকে। অপর সান্ত্রী তার সঙ্গীকে ডাক দেয়। কোন সাড়া না পেয়ে সে ধীর পায়ে এদিকে এগিয়ে আসে। মৃত সঙ্গীর লাশের নিকট এসেই অন্ধকারে মাটিতে কিছু একটা পড়ে আছে অনুভব করে। নত হয়ে দেখে। অমনি সেও হাসান আল-ইদরীসের পাঞ্জায় এসে পড়ে।

রাদী অপেক্ষা না করে গুহার দিকে ছুটে যায়। মাটি থেকে প্রদীপটা তুলে হাতে নিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ে। হাসান আল-ইদরীস অপর সান্ত্রীকেও শেষ করে দেয়।

অন্যান্য প্রহরীরা তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছে। হাসান আল-ইদরীস রাদীকে ডাক দেয়। কিন্তু রাদী ওখানে নেই। হাসান গুহার দিকে ছুটে যায়। সেখানেও প্রদীপ জ্বলছে না।

ইতিমধ্যে গুহায় একটা শিখা জ্বলে ওঠে। রাদী দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তার পরিধানের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। গুহায় ঢুকে মেয়েটা তরল দাহ্য পদার্থের একটা মটকা উপড় করে ফেলে দিয়ে প্রদীপ থেকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তার জানা ছিলো না, এই পদার্থ কিভাবে খপ

করে জ্বলে ওঠে। শিখা ছড়িয়ে গিয়ে তাকেও জড়িয়ে ফেলে। হাসান আল-ইদরীস যখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছে, ততোক্ষণে তার রূপময় মুখমণ্ডলটা ঝলছে গেছে। রেশমের ন্যায় চুলও পুড়ে গেছে রাদীর। তার কাপড়ের আগুন নেভাতে গিয়ে হাসান আল-ইদরীস নিজের হাতও পুড়ে ফেলে। রাদীর কাপড়ের আগুন নিভে গেছে ঠিক; কিন্তু তার চৈতন্য হারাবার উপক্রম হয়ে পড়েছে।

হাসান আল-ইদরীস রাদীকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করে। নিষিদ্ধ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে। সামনের অঞ্চলটা তার পুরোপুরি চেনা। গুহায় লাগানো আগুনের তাপে মুখবদ্ধ তেলের মটকাগুলো এমন ভয়ানক শব্দে বিস্ফোরিত হতে শুরু করে যে, জমিন ভূমিকম্পের ন্যায় কেঁপে ওঠে। হাজার হাজার মটকা একসঙ্গে ফেটে যায়। তাতে খৃস্টানদের সংগৃহীত বিধ্বংসী সকল যুদ্ধ সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে যায়।

বিস্ফোরণ মসুল নগরীকে জাগিয়ে তোলে। মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কী ঘটেছে কেউ বলতে পারছে না।

হাসান আল-ইদরীস নগরীতে ঢুকতে পারছে না। কারণ, নগরীর ফটক বন্ধ। সে মসুলের পরিবর্তে নাসীবা অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ে।

হাসান এখন বিপদমুক্ত। রাদী তার কাঁধে। অনেক দূর যাওয়ার পর হাসান ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দাঁড়ায়। রাদীকে মাটিতে শুইয়ে দেয়। রাদী ফিসফিসিয়ে বলে– 'আগুন আমাকে পবিত্র করে দিয়েছে।' মেয়েটা বিড় বিড় করতে শুরু করে– 'কাফেলা হেজাজ যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে আমরা বিয়ে করবো।'

'রাদী! রাদী!' হাসান আল-ইদরীস রাদীকে ডাকে।

'আল্লাহ আমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, না?' রাদী জিজ্ঞেস করে। মেয়েটা উঠে বসে বাহু দুটো সম্মুখে এগিয়ে ধরে বললো– 'আমি যাচ্ছি। কাফেলা হেজাজ যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি।'

রাদী একদিকে পড়ে যায়। হাসান আল-ইদরীস তাকে ডাকে। ধরে নাড়ায়। শেষে শিরায় হাত রাখে। রাদীর আত্মা হেজাজের কাফেলার সঙ্গে চলে গেছে।

হাসান আল-ইদরীস খঞ্জর দ্বারা কবর খনন করে। দু'আড়াই ফুট গভীর আর রাদীর সমান লম্বা একটা কবর খুঁড়তে তার ভোর হয়ে যায়। রাদীকে সেই কবরে শুইয়ে রেখে উপরে মাটি চাপা দেয়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন খৃস্টানদের অস্ত্র ও দাহ্য পদার্থের ডিপো ধ্বংস হওয়ার সংবাদ পান, তখন তিনি তালখালেদ অভিমুখে অগ্রযাত্রা করছিলেন। তালখালেদ বিশাল একটি সাম্রাজ্য, যার শানসকর্তা সুকমান আল-কিবতী শাহ আরমান। সে সময় তিনি মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য হারযাম নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শাহ আরমানের ইয্‌যুদ্দীনকে সাহায্য দেয়ার কথা। সে বিষয়ে আলোচনার জন্যই তাদের এই সাক্ষাৎ। সুলতান আইউবী সময়ের আগেই এক বৈঠকের সংবাদ পেয়ে গেছেন। তিনি শাহ আরমানের রাজধানী তালখালেদ অবরোধ করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন।

[সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত]

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে ফেলে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ISBN. 984-8925-08-0